অদম্য

স্মরণজিৎ চক্রবর্তী



থ্রিলার

পাঁচটি গল্প
একটি
উপন্যাস

অদম্য

থ্রিলার: পাঁচটি গল্প একটি উপন্যাস

অদম্য

থ্রিলার: পাঁচটি গল্প একটি উপন্যাস

স্মরণজিৎ চক্রবর্তী



আনন্দ

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০১৩

ISBN 978-93-5040-277-1

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
নবমুদ্রণ বাবাজিপ্রাইভেট লিমিটেড
সিপি ৪, সেক্টর ৫, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা ৭০০ ০৯১
থেকে মুদ্রিত।

ADAMYA
Thriller: Panchti Galpa Ekti Upanyas
[Thriller]
by
Smaranjit Chakraborty

Published by Ananda Publishers Private Limited
45, Beniatola Lane, Calcutta 700009

কিছু না পেয়েও যারা সৎ, একনিষ্ঠ ও পরিশ্রমী,
তাদের

সূচি

গল্প

উপন্যাস

"...for there is nothing either good or
bad, but thinking makes it so."

—Hamlet, William Shakespeare

বিস্ফোরণের একটু আগে

ছাত্রছাত্রীদের ভিড় আর চিৎকার, হুল্লোড়-ভরা করিডর থেকে সে পাশের একটা নির্জন করিডরে ঢুকে গেল। এই করিডরটা অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ। আজ তার পরনে একটা বিখ্যাত কুরিয়ার কোম্পানির পোশাক। কাঁধে তাদেরই ব্যাগ। আর ওই ব্যাগের মধ্যেই রাখা আছে সেই জিনিসটা। এই নির্জন করিডরের শেষ প্রান্তেই বায়োসেরামিক ল্যাব। আর ব্যাগের মধ্যের জিনিসটা প্রোফেসর সোমের জন্য। প্রোফেসর হৃদয়নাথ সোম। ডক্টরেট ইন বায়োসেরামিক রেডিয়েশন। দীর্ঘদিন গবেষণা করছেন বায়োসেরামিক রেডিয়েশন দিয়ে কারসিনোজেনিক বা ক্যান্সারের গ্রোথ কীভাবে বন্ধ করা যায়। প্রোফেসর সোম এখন ক্লাস নিচ্ছেন তিনতলায়। দোতলায় তাঁর ল্যাব এখন ফাঁকা। চাবি দেওয়া। ক্লাসের পর তিনি এখানে আসবেন। সে জানে। তাই সে এইসময়েই এসেছে। কারণ, সে জানে এই সময় তাকে দেখে ফেলার এখানে কেউ থাকবে না।

সে গিয়ে দাঁড়াল ল্যাবের বন্ধ দরজার সামনে। পকেট থেকে বের করল ইঞ্চি ছয়েক লম্বা একটা খাঁজকাটা রড। রডটা সে তালার গর্তে ঢুকিয়ে আলতো করে চাপ দিল। খুট। তালা খুলে গেল। সহজ, ভীষণ সহজ এইসব কাজ। সে একবার নির্জন করিডরের দিকে তাকাল। না, কেউ নেই। সে ঢুকে পড়ল ল্যাবে। এই ল্যাব তার ভীষণ চেনা। বিভিন্ন সময় সে কখনও সাংবাদিক, কখনও ছাত্র সেজে প্রোফেসর সোমের থেকে জানার চেষ্টা করেছে বায়োসেরামিক অক্সাইড থেকে নির্গত

ইফ্রারেড দিয়ে কীভাবে ক্যান্সার ঠেকানো যায়। না, সে পারেনি। পরে লুকিয়ে সে তন্নতন্ন করে খুঁজেছে প্রোফেসরের ফর্মুলা। তাও সে পায়নি। তাই গেব্রিয়েল ফার্মাসিউটিক্যালের নির্দেশে আজ সে এসেছে এর শেষ দেখতে। প্রোফেসর সোমের টেবিলে গিয়ে সে ব্যাগ থেকে বের করল তার প্যাকেট। চৌকো, সুন্দরভাবে প্যাক করা একটা বাক্স। তার উপর রাখা একটা নতুন মোবাইল ফোন। বাক্স ও তার উপরে রাখা মোবাইল ফোনটা সে টেবিলে রাখল। ফোনটা বাক্সের উপর সেলোটেপ দিয়ে আটকানো ছিল। সে সাবধানে খুলে নিল সেলোটেপটা। তারপর বাক্সের নীচে এক জায়গায় ছোট্ট একটা বোতামে চাপ দিল। খুট শব্দ শুনে বুঝল গোটা সিস্টেমটা সক্রিয় হয়ে গিয়েছে। একে বলে সিস্টেম আর্মড। গোটা সিস্টেম এমনভাবে তৈরি, যাতে একবার আর্ম হয়ে গেলে একে ডিজ়আর্ম করা যাবে না অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় করা যাবে না।

সে একবার ঘড়ির দিকে তাকাল। প্রোফেসরের ক্লাসের সময় দেখে নিল একবার। তারপর দ্রুত বেরিয়ে এল ল্যাব থেকে। খানিকটা হেঁটে সে পার করল কলেজ ক্যাম্পাস। একটু দূরেই স্ট্যান্ড করা আছে তার মোটরবাইক। আর মিনিটখানেক বাকি আছে প্রোফেসরের ক্লাস শেষ হতে। উপরের ক্লাস থেকে ল্যাবে আসতে তাঁর সময় লাগবে আরও মিনিট চারেক। তারপর বাক্সটার সামনে দাঁড়াতে তাঁর সময় লাগবে এক-দু'মিনিট। অর্থাৎ মোটামুটি সাত-আট মিনিট সময় আছে। সে তার বাইক স্টার্ট করল। পৌনে এক কিলোমিটার দূরত্বে গিয়ে সে পকেট থেকে নিজের মোবাইল বের করল। তারপর ডায়াল করল একটা নম্বর। সে মনে মনে দেখতে পেল একটা মোবাইল বাজছে বায়োসেরামিক ল্যাবে। আর অবাক হয়ে তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন প্রোফেসর সোম। সে জানে, গিফ্‌ট প্যাক আর তার উপর রাখা মোবাইল ফোন দেখে প্রোফেসর অবাক হবেন। তার ফলে তিনি ফোনটা ধরবেনই। আর তিনি বাক্সের উপর রাখা ফোন তুললেই...

সে বিস্ফোরণটা শুনল এত দূর থেকেও। সে জানে, এই ল্যাব সমেত ক্যাম্পাসের নর্থ ব্লক এখন 'আছে' নয়, 'ছিল' হয়ে গেছে। সে অজান্তেই হেসে ফেলল। বুল্‌স আই। টার্গেট অ্যাচিভ্‌ড। বাক্সের ভিতরে ছিল দুটো ব্যাটারির সঙ্গে জোড়া একটা ডেটোনেটর, যা লাগানো থাকবে আর ডি এক্স-এর সঙ্গে। মোবাইল ফোনটা ছিল ট্রিগার। ফোন তুলতেই বাক্সের উপর চাপ কমে যাবে। এবং একটা বোতাম উঠে আসবে। ফলে ব্যাটারির পজিটিভ ও নেগেটিভ সংযুক্ত হবে, সার্কিট কমপ্লিট। বৈদ্যুতিক তরঙ্গ পৌঁছোবে ডেটোনেটরে। একটি মৃদু বিস্ফোরণ আর তার তাপে ও চাপে প্রবলভাবে বার্স্ট করবে আর ডি এক্স। ভেঙে পড়বে নর্থ ব্লক। আবিষ্কার নিয়ে নিশ্চিন্তে পরপারে চলে যাবেন প্রোফেসর সোম। গেব্রিয়েল ফার্মাসিউটিক্যাল সেই স্বত্ব না পেলে আর কেউ পাবে না। সে ভাবল, প্রোফেসর সোম ফালতু সেন্টিমেন্ট বজায় রাখতে গিয়ে প্রাণটা খোয়ালেন!

কিন্তু আর কিছু করার নেই। সে অদ্ভুত এক তৃপ্তি বোধ করল। মিশন অ্যাকমপ্লিশড। হয়তো তার বয়স বাইশ বছর কিন্তু নৈপুণ্যে সে অসাধারণ। সে জানে, প্রোফেসর সোমের সঙ্গে অনেক নিরীহ মানুষ মারা গেছে। কিন্তু সে নিরুপায়। তার কাজ তাকে করতেই হবে। এর প্রাপ্য হিসেবে সে জানে, কাল সন্ধের মধ্যে বিদেশি এক ব্যাঙ্কে তার অ্যাকাউন্টে জমা পড়বে পঁয়ত্রিশ হাজার মার্কিন ডলার। সে সবসময় ডলারে পেমেন্ট নেয়। কারণ ডলার অনেক অনেক ভারী টাকার চেয়ে।

২

"মাইক্রোবায়োলজির ক্লাস শুরু হওয়ার সাতদিন পর যে জয়েন করলাম। এতে পড়াশোনায় পিছিয়ে পড়ার কোনও আশঙ্কা নেই তো? মানে এমনিতেই মাস্টার ডিগ্রি, তার উপর সাতদিন লেট হয়ে গেল..."

আমাকে আর কথা শেষ করতে দিল না শুভ। নিজেই হ্যা হ্যা করে হেসে আমাকে থামিয়ে দিল। এই ইউনিভার্সিটিতে ভরতি হওয়ার পর যে ক'জনের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, শুভব্রত দে, মানে শুভ তাদের একজন। শুভ বেশ হাসিখুশি, প্রাণখোলা টাইপ।

হাসি থামিয়ে শুভ বলল "শোন অমিত, অদম্য কী বলছে।"

অমিত দেবরায় গম্ভীর প্রকৃতির। একটু চুপচাপ থাকে। আর মেজাজটাও তার ট্যারাবাঁ্যাকা। স্বভাবতই ও কোনও উত্তর দিল না। মুখ দিয়ে হুঃ টাইপের একটা শব্দ বের করল শুধু।

শুভ বলল, "দূর, মাস্টার ডিগ্রিতে কোনও কিছুই কঠিন নয়। মন দিয়ে একটু ল্যাবে প্র্যাকটিক্যালটা করবি, ব্যস।"

আমি একটা কথা বলতে যাচ্ছিলাম কিন্তু বলতে পারলাম না। একটা মেয়ে দৌড়ে এল আমাদের সামনে। মেয়েটা বেশ, ফরসা চোখে চশমা কিন্তু দারুণ সুন্দরী। আর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ফিগার। একদম বালি ঘড়ির মতো। ক্লাসে ক'দিন ওকে দেখেছি, মানে না দেখে উপায় ছিল না আর কী, কিন্তু আলাপ করার সাহস হয়নি। দমবন্ধ করা সুন্দরীর সামনে কথা বলা খুব মুশকিল।

মেয়েটা এসেই বলল, "তোদের মধ্যে কার ব্লাডগ্রুপ ও-নেগেটিভ বল। আমাদের ক্লাসের রেশমির অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। প্রচুর রক্ত বেরিয়ে গেছে। রক্ত চাই।"

শুভ বলল, "অমিত, তোর তো ও-নেগেটিভ। চল, রক্ত দিবি চল।"

অমিত সামান্য মুখ বাঁকাল, "কে না কে, রক্ত দিচ্ছে! আমার রক্ত অত সস্তা নয়, ভাগ।"

মেয়েটা আবার বলল, "প্লিজ অমিত। লাইফ অ্যান্ড ডেথ ব্যাপার। ও-নেগেটিভ এমনিতেই খুব রেয়ার গ্রুপ। প্লিজ চল।"

অমিত গোঁজ হয়ে বসে রইল। হঠাৎ লাফিয়ে উঠল ঋতম চট্টরাজ। শুনেছি একজন ভাল ফুটবলার। কিন্তু ইউনিভার্সিটিতে এই ক'দিনেই যথেষ্ট নাম

করেছে নিজের রগচটা মেজাজের জন্য। ঋতম যেখানে সেখানে ঝামেলা বাধিয়ে দেয়। অমিত চুপ করে আছে দেখে ও লাফিয়ে উঠে অমিতের কলার চেপে ধরল, "এই জানোয়ার, তিন চড় খাবি, চল।"

অমিত আরও তেরিয়া হয়ে উঠল। একটা ঝামেলা যখন পাকিয়ে উঠেছে ঠিক তখনই আমি বললাম, "আমারও ও-নেগেটিভ রক্ত। চল।"

ঋতম অমিতকে ছেড়ে আমার দিকে ঘুরে বলল, "এতক্ষণ ঘাপটি মেরে বসেছিলি কেন? চল।"

রক্ত দিয়ে ফেরার পথে মেয়েটা আমার সঙ্গে এল। মেয়েটার নাম লিরিল রায়। ও আমাকে বলল, "যদিও তোর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ, কিন্তু ওইসব তুমিফুমির ন্যাকামো আমি করতে পারব না। বাই দ্য ওয়ে, তোর নামটা অদ্ভুত! অদম্য সেন! তবে উচ্চারণ করা মুশকিল। আজ থেকে তুই অ্যাডাম। কেমন?"

আমি আর কী বলব? বশ্যতা স্বীকার করে নিলাম। তবে ভাবলাম, বলি যে, লিরিল নামটাও খুব কমন কিছু নয়। কিন্তু বলতে পারলাম না। জিভ কেমন বিট্রে করতে শুরু করল।

সেইদিনের পর থেকে আমাদের, মানে আমি, লিরিল, শুভ আর ঋতম একটা গ্রুপ হয়ে গেলাম যেন। অমিত আমাদের মধ্যে থাকে না। থাকলেও লিরিলের দিকেই একটু ট্যান খাওয়া যেন। আর কথায় কথায় আমাকেও একটু খোঁচা দেয়। বুঝি লিরিলের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব যেন সহ্য করতে পারছে না। একদিন লিরিলের একটা জ্যাকেট দেখে বলেছি, ভাল। ব্যস, অমিত খচে লাল। সঙ্গে সঙ্গে বলল, "জ্যাকেটটা ভাল, না তার নীচের জিনিসগুলো?"

আমি থতমত খেয়ে চুপ করে গেলাম। এই অমিতটুকু বাদ দিলে আর সব ভাল। আর সব ভাল চলছিলও। হঠাৎ সপ্তাহ তিনেকের মাথায় একটা ছোট্ট গন্ডগোল হয়ে গেল। সন্ধেবেলা হস্টেলে ফিরছিলাম আমরা। হঠাৎ একটা চাপা হল্লা শুনে ফুটবল মাঠের পাশে দেবদারু গাছের তলায় একটা

জটলার দিকে আমরা এগিয়ে গেলাম। দুটো ছেলে। সম্পূর্ণ নগ্ন। আর তাদের কান ধরে ওঠবোস করাচ্ছে ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের সুস্মিত, প্রকাশরা। বুঝলাম, ছেলে দুটো ফার্স্ট ইয়ার ফিজিক্স অনার্সের। সিনিয়ার হওয়ার জন্য প্রকাশরা ওদের র‍্যাগিং করছে। রেসিডেন্সিয়াল কমপ্লেক্সগুলোতে এই এক সমস্যা।

আমরা কিছু বোঝার আগেই ঋতম চিৎকার করে উঠল, "প্রকাশ, ওদের ছেড়ে দে।"

প্রকাশ তাচ্ছিল্য করে বলল, "যা ভাগ। নিজের গোয়ালে ধোঁয়া দে।"

ঋতম আর কথা বলল না। ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের উপর। আধো অন্ধকারে দক্ষযজ্ঞ শুরু হয়ে গেল। আমরা গিয়ে ঋতমকে ছাড়িয়ে আনতে আনতে দেখলাম, প্রকাশ আর সুস্মিত ঘাসে শুয়ে। ঋতমের নাক দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। ফার্স্ট ইয়ারের ছেলে দুটো এই সুযোগে ভেগেছে। ফেরার সময় শুনলাম সুস্মিত চিৎকার করছে, "এই মাইক্রোবের বাচ্চাগুলোকে একদিন এমন ঝাড় দেব..."

ঋতম কিছু বলতে যাচ্ছিল। আমরা ওকে টেনে নিয়ে গেলাম। মাইক্রোবায়োলজির ব্লকের পাশ দিয়ে যেতে যেতে দেখলাম, এই সন্ধের সময়ও দোতলার ল্যাবে আলো জ্বলছে। আমি লিরিলকে জিজ্ঞেস করলাম, "কে আছে রে ওখানে এখন?"

লিরিল বলল, "স্যার আছেন। মানে প্রোফেসর রমানাথ দে। কীসব রিসার্চের কাজ করছেন।"

"কীসব রিসার্চ নয়, অত্যন্ত মূল্যবান রিসার্চ।" মুখ ফিরিয়ে দেখলাম একদম অন্যরকম গলায় শুভ আমাদের কথাগুলো বলছে। আর একদৃষ্টে ও তাকিয়ে আছে ল্যাবের দিকে। আধো আলোয় ওর চোখ দুটো অন্যরকম লাগল। এই শুভকে আমরা চিনি না।

“হিউম্যান ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস। সংক্ষেপে এইচ আই ভি। অর্থাৎ যে ভাইরাস এড্‌স রোগের কারক। এড্‌স-এর পুরো নাম হল অ্যাকোয়ার্ড ইমিউন ডেফিসিয়েন্সি সিনড্রোম। এই এইচ আই ভি ভাইরাসটা মানুষের শরীরে ঢুকে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে ধ্বংস করে। ফলে মানুষ খুবই সামান্য রোগে মারা যেতে পারে। সারা পৃথিবীতে এই রোগটার মতো বিভীষিকা আর কোনও রোগ নয়। যদিও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এর ওষুধ বা ভ্যাকসিন তৈরি করার চেষ্টা চলছে, কিন্তু কেউই বিশেষ সাফল্য লাভ করেননি।”

সামনের সারি থেকে একজন উঠে জিজ্ঞেস করল, “স্যার, কীরকম ওষুধ বা ভ্যাকসিন তৈরির কথা ভাবা হচ্ছে?”

প্রোফেসর রমানাথ দে বিরাট হলঘরের ডান দিকে তাকালেন। একটা মেয়ে প্রশ্নটা রেখেছে। তিনি ভাবলেন, কীভাবে এদের বলবেন কী কী ওষুধের বা ভ্যাকসিনের কথা ভাবা হচ্ছে। কোন কোন গ্রুপের উপর কাজ চলছে। সবই যে অত্যন্ত জটিল প্রক্রিয়া। এই দশ-এগারো ক্লাসের ছেলেমেয়েদের কীভাবে বোঝাবেন সব? এই স্কুলে তাঁকে আসতে হয়েছে নেহাত ভদ্রতাবশত। এড্‌স সচেতনতার উপর বক্তৃতা করতে। তাঁর ইউনিভার্সিটির এক প্রাক্তন ছাত্র এই স্কুলের টিচার। তাকে না বলতে পারেননি তিনি। তাই বাধ্য হয়ে এসেছেন। যদিও তাঁর হাতে সময় কম। অত্যন্ত কম। তাঁর গবেষণা প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে পড়েছে। আর কয়েকটা দিন মাত্র, কয়েকটা দিন।

হলের মৃদু গুঞ্জনে তাঁর সংবিৎ ফিরল। তিনি আবার শুরু করলেন, “দ্যাখো, অনেকভাবে ওষুধ বের করার চেষ্টা চলছে। তবে সব তো আলোচনা করা সম্ভব নয়। আমি দু’-একটা সংক্ষেপে, সহজ করে বলার চেষ্টা করছি। এইচ আই ভি প্রথমে শরীরে ঢুকে আক্রমণ করে ‘হেল্পার টি

সেল’-কে। একে CD4+T সেলও বলা হয়। CD4+T সেল হল রক্তের এক ধরনের শ্বেত কণিকা, যা অন্যান্য শ্বেত কণিকাকে বিশেষ কেমিকাল সিগনাল পাঠায় তাদের নিজের নিজের কাজ করার জন্য। এখন এইচ আই ভি এই CD4+T সেলকে আক্রমণ করে তার গায়ে, অর্থাৎ কোষপ্রাচীরে আটকে যায়। তারপর এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় CD4+T এর কোষপ্রাচীর ভেদ করে এইচ আই ভি ঢুকে যায় কোষের ভিতরে। এর পর শুরু হয় ধ্বংসের পালা। এখন যদি এই কোষপ্রাচীর ভেদ করাটা আটকানো যায়, তবে একটা সমাধান বেরোতে পারে।”

প্রফেসর দে একটু থামলেন। দেখলেন, সারা হল চুপ করে আছে। তিনি বুঝলেন, সবাই ক্রমশ ইন্টারেস্ট পাচ্ছে। তিনি আবার শুরু করলেন, “কোষে ঢোকার পর সময়মতো ভাইরাসটা সক্রিয় হয়। এইচ আই ভি একটা রেট্রোভাইরাস অর্থাৎ আর এন এ ভাইরাস। আর এন এ হল রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড। কিন্তু নিজের প্রতিলিপি তৈরি করতে দরকার ডি এন এ বা ডি অক্সিরাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড। এখন এইচ আই ভি রিভার্স ট্রান্সক্রিপটেজ এনজাইমের সাহায্যে নিজের আর এন এ-কে ডি এন এ-তে পরিণত করে। এই সময়েই অর্থাৎ এই পরিবর্তনের সময়েই বিভিন্ন স্ট্রেন বা বিভিন্ন জিন কম্বিনেশনের এইচ আই ভি তৈরি হয়। যার সব ক’টিকে ধ্বংস করা শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতার দ্বারা সম্ভব হয় না। এখন আর এন এ থেকে ডি এন এ-তে পরিণত হওয়া আটকানো গেলেও এই রোগের প্রতিরোধ সম্ভব।”

প্রোফেসর দে থামলেন। পাশ থেকে গ্লাস তুললেন জল খাওয়ার জন্য। ঠিক এই সময়ই ছাত্রছাত্রীদের গার্ডিয়ানদের মাঝখান থেকে উঠে গেলেন বছর পঞ্চাশেকের এক মানুষ। তিনি লম্বা, মাথায় কাঁচাপাকা চুল। পরনে ছাই রঙের সুট। তিনি আর প্রোফেসর দে-র কথা শুনলেন না। কারণ, আর দরকার নেই। তিনি জানেন প্রোফেসর দে বড়জোর মিনিটপাঁচেক বলবেন আর। তিনি হলের বাইরে এসে হেঁটে গেলেন তাঁর কালো মার্সিডিজ় বেঞ্জ

গাড়িটার দিকে। বারো মিনিটের মাথায় তিনি দেখলেন প্রোফেসর দে হল থেকে বেরিয়ে তাঁর স্যান্ট্রো গাড়িটার দিকে যাচ্ছেন। তিনি দ্রুতপায়ে তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন।

"হ্যালো স্যার।" তিনি মৃদু হেসে হাত বাড়ালেন প্রোফেসর দে-র দিকে। বললেন, "আমি রাজীব আহুজা। ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, গেব্রিয়েল ফার্মাসিউটিক্যাল।"

প্রোফেসর দে থমকালেন। একটু বিভ্রান্তও হলেন যেন। তারপর সামান্য রুক্ষভাবে বললেন, "আপনাদের তো বলেই দিয়েছি আপনাদের সঙ্গে আমি কাজ করব না।"

রাজীব আহুজা এবারও মৃদু হাসলেন। বললেন, "আমি জানি রোসিক্রুশিয়ান হেল্‌থকেয়ার আপনাকে মাসিক আট হাজার ডলার আর আপনার ড্রাগ রয়্যালটি হিসেবে টুয়েল্‌ভ পারসেন্ট দেবে। দেখুন প্রোফেসর দে, আমরা আপনাকে দেব ফিফ্‌টিন থাউজ্যান্ড ডলার আর টুয়েন্টি পারসেন্ট যা ওষুধ বিক্রি হবে তার উপর।"

প্রোফেসর দে হাত তুলে বললেন, "স্টপ ইট মিস্টার আহুজা। টাকাটা ব্যাপার নয়। আপনাদের সঙ্গে কাজ করব না, কারণ আপনারা আমার এইচ আই ভি প্রোটেক্টেড ওষুধটা ঠিকমতো পরীক্ষার আগেই বাজারে ছাড়তে চান। জানি না কীভাবে আপনারা এফ ডি এ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক ড্রাগ রিভিউ বোর্ডকে ম্যানেজ করবেন। কিন্তু না, এটা ছোট প্রাণীদের উপর পরীক্ষা না করে আমি মানুষের উপর পরীক্ষা করব না। সম্ভব নয়।"

"কিন্তু ততক্ষণে প্রচুর দেরি হয়ে যাবে। এই রোগে কত মানুষ মারা যাবে ভাবুন তো।" রাজীব আহুজা এবার একটু উত্তেজিত হলেন।

"আর ওষুধটা যদি ফেল করে তবে তার চেয়েও বেশি মানুষ মারা যাবে। প্লিজ, আপনারা মানুষের প্রাণ নিয়ে ব্যাবসা করবেন না। আমার ওষুধটা প্রথমে সাব-হিউম্যান অ্যানিম্যালের উপর পরীক্ষা হবে। তারপর হিউম্যান মডেলদের উপর প্রয়োগ করা হবে। আই অ্যাম সরি, আপনারা

তা করতে যেহেতু রাজি নন, সেহেতু আমায় ক্ষমা করুন। পরীক্ষা করার আগে ওষুধ আমি বাজারে ছাড়তে পারব না। আমি আসি, আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।”

রাজীব আহুজা একটু দম ধরলেন। তারপর হিসহিসে গলায় বললেন, “আপনি তো ব্রাউন চামড়ায় মোড়া ডায়েরিতেই সব লিখে রাখেন না? আপনার টেবিলের ডানদিকের ড্রয়ারেই তো ওটা থাকে।”

গাড়ি স্টার্ট করতে গিয়ে থমকালেন প্রোফেসর দে। তারপর হাসলেন, বললেন, “বাঃ, আপনাদের হোমওয়ার্ক তো খুব ভাল। কিন্তু আমার ওষুধের ফর্মুলা হাত করবেন তো? পারবেন না। চ্যালেঞ্জ। সবার চোখের সামনেই আছে, তবুও পাবেন না। বেস্ট অব লাক।”

রাজীব আহুজা দাঁড়িয়ে দেখলেন স্কুল ক্যাম্পাস থেকে সাদা স্যান্ট্রোটা বেরিয়ে গেল। তিনি খানিকক্ষণ চিন্তা করলেন, তারপর পকেট থেকে বের করলেন ডিম্বাকৃতি মোবাইল ফোন। ডায়াল করার পর চারটে রিং হল। ওপাশ থেকে একটা কণ্ঠস্বর উত্তর দিল। রাজীব আহুজা কথা বলতে শুরু করলেন।

৪

মোবাইল ফোনটা পকেটে ঢুকিয়ে অমিত বলল, “তোরা যা, আমি একটু আসছি।”

আমরা নিজেদের হস্টেলের দিকে ফিরতে লাগলাম। হঠাৎ লিরিল, শুভ আর ঋতমকে বলল, “তোরা একটু এগো। আমার অ্যাডামের সঙ্গে কিছু কথা আছে।”

ঋতম যাওয়ার আগে ফিক করে হেসে বলে গেল, “অ্যাডাম কিছু কথা বলিস, বেশি কিছু কথা বলিস না যেন!”

ওরা চলে যেতেই লিরিল বলল, “এই জ্যাকেটটা তোর, নে।”

দেখি সাইড ব্যাগ থেকে একটা প্লাসটিকের প্যাকেট বের করেছে লিরিল। জ্যাকেটটা দু'হাতে মেলে ধরে বলল, “সেদিন বলেছিলি, এটা ভাল লাগছে, তাই তোকে এনে দিলাম।”

দেখলাম হালকা নীল রঙের হাতকাটা একটা জ্যাকেট। তার বুকের কাছে চে গুয়েভারার ছবি। আসলে এই জ্যাকেটটা সুন্দর বলেই অমিতের কাছ থেকে গালাগাল খেয়েছিলাম। কী আশ্চর্য, একেবারে এনেই দিয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, “দাম কত?”

“ডোন্ট বি আ বোর। বেশি টাকা দেখাবি না। এটা গিফ্‌ট।” লিরিল এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে থামল।

“বা রে, দাম নিবি না? গিফ্‌ট? তোকে কী দিই তবে বল?” আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললাম। লিরিল ফিক করে হেসে বলল, “ঠিক সময়ে আমি চেয়ে নেব।” ওর চোখ থেকে যে সংকেতটা পৌঁছোল তা হাজার হাজার বছর ধরে একই রকম আছে। স্বভাবতই সংকেতটা আমায় একটু লাল করল, আবার আনন্দও দিল।

কিন্তু আনন্দটা দু'-চারদিন পরে কিছুটা ফিকে হয়ে এল। বিকেলে আমরা সবাই বসে গল্প করছিলাম কাফেটেরিয়াতে। এমনিই এদিক-সেদিক কথা হচ্ছিল। হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই কোত্থেকে অমিত এসে উদয় হল। এসেই সটান লিরিলের দিকে তাকিয়ে বলল, “তুই আমার সেদিনের কথার উত্তর দিলি না তো!”

লিরিলের মুখ-চোখ দেখে বুঝলাম ব্যাপারটা সহজ নয়। তবু লিরিল স্মার্টলি বলল, “অমিত, দ্যাখ, ওসব প্রেম ট্রেম মাথা থেকে বের করে দে। তোর আমাকে ভাল লাগতেই পারে। কিন্তু আমারও তোকে ভাল লাগতে হবে তার তো কোনও মানে নেই। আর এসব প্রেম ট্রেম ফালতু। মানুষকে বেঁধে রাখে, সেন্টিমেন্টাল করে তোলে, এগোতে দেয় না। ওসব মাথা থেকে বাদ দে।”

অমিত ফোঁস করে উঠল, "এখন তো ওসব বলবিই। আমি জানি না ভেবেছিস কার দিকে তুই ট্যান খাচ্ছিস।" বলেই আমার দিকে কড়া চোখে তাকিয়ে যেভাবে হঠাৎ এসেছিল, সেভাবেই হঠাৎ কাফে থেকে বেরিয়ে গেল। ঋতম বলল, "পাগল নাম্বার টু।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "নাম্বার ওয়ান কে? তুই?"

ঋতম পালটা উত্তর দিল, "কেন, প্রেফেসর দে। মাইরি লোকটা সারাদিন ল্যাবে কী করে বল তো? মাথার তার কাটা না হলে একগাদা যন্ত্রের মধ্যে সবসময় মাথা গুঁজে থাকে। এ ছাড়াও একটা ঘটনা ঘটেছে। সেদিন ল্যাবে দরকার ছিল। লিখতে গিয়ে দেখি আমার পেনে কালি নেই। দেখলাম, স্যারের টেবিলে একটা শেফার্স পেন আর একটা মোটা কালো পেন। শেফার্সটা দামি, তাই ওই কালো পেনটা নিয়ে লিখতে গেছি। ওমা, স্যার কী বকলেন। আমি কেন ওই পেনটা নিয়েছি, কেন শেফার্স দিয়ে লিখিনি। বোঝো! পরে লুকিয়ে দেখি কী, ওই কালো পেনটা দিয়ে কী সব জল জল বেরোয়। ওতে কালিটালি কিচ্ছু নেই। বোঝো তবে। ওই পেনের জন্য কী ঝামেলা! সত্যিই প্রোফেসর দে'র মাথার স্ক্রুগুলো না সব খুলে পড়ে গেছে।"

এতক্ষণ চুপ করে থাকা শুভ হঠাৎ ফোঁস করে বলল, "তুই পেন ধরেছিস কেন? পেন না নিয়ে তুই ল্যাব করতে গিয়েছিস কেন? আর কালো পেনটা হয়তো রিসার্চের দরকারি কোনও পেন। রিসার্চের তুই কিছু বুঝিস, গাধা?"

"কালি ছাড়া পেন দিয়ে রিসার্চ? তুই বোকা না লিভার দিয়ে চিন্তা করিস? আর তোর গায়ে ফোসকা পড়ছে কেন? শুভ, আমি লক্ষ করেছি, সময় পেলেই তুই ল্যাবের কাছে ঘুরঘুর করিস। কেন বল তো?" ঋতম চোখ পাকিয়ে শুভর দিকে তাকিয়ে থাকল। শুভও হঠাৎ গুটিয়ে গেল যেন।

সেদিনের ঝামেলাটা এড়ানো গেলেও পরের দিনের ঝামেলাটা আর এড়ানো গেল না। আর সেটা এল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে।

সন্ধেবেলায় তিন তলার কমনরুম থেকে আমি আর ঋতম ফিরছিলাম। দোতলায় মাইক্রোবায়োলজি ল্যাবের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় পাশের করিডরে একটা ঝাপটা-ঝাপটি শুনতে পেলাম। আমি আর ঋতম দৌড়ে সেখানে গিয়ে দেখি, ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের সুস্মিত লিরিলের হাত দুটো দেওয়ালে চেপে ধরে বলছে, "আজ তোমায় মেখে দেখব তুমি কেমন সাবান।" অন্যদিকে প্রকাশ মুখ চেপে ধরেছে লিরিলের। আর লিরিল দু'জনের থেকে নিজেকে ছাড়াবার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে।

আমি কিছু বোঝার আগেই ঋতম প্রায় উড়ে গিয়ে লাথি মারল প্রকাশকে। আমিও দৌড়ে গেলাম সুস্মিতের দিকে। বেগতিক দেখে সুস্মিত সাবান মাখার ইচ্ছে ত্যাগ করে লিরিলকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দৌড় মারল। আমিও পা চালিয়েছিলাম, কিন্তু সুস্মিত ঠিক কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। মাটিতে পড়ে থাকা প্রকাশকে আরও দু'-চারটে লাথি মেরে ঋতম ওর কলার ধরে নিয়ে গেল। যাওয়ার সময় বলল, "অ্যাডাম, টেক কেয়ার অব লিরিল। আমি এই জানোয়ারটাকে নিউটনের থার্ড ল-টা বুঝিয়ে আসছি।"

লিরিল মাটিতে বসে হাঁপাচ্ছিল। আমি কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কোথায় লেগেছে?"

লিরিল হাত দিয়ে কোমর দেখাল। আমি হাত ধরে ওকে তুললাম। দাঁড়িয়ে অদ্ভুতভাবে ও আমার দিকে তাকাল। করিডরের হলুদ আলোয় সব কেমন আরও বেশি করে নির্জন লাগছিল। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, "কোমরে খুব লেগেছে?"

লিরিল এখন আর হাঁপাচ্ছে না। হঠাৎ ও আমার দিকে পিছন ফিরে কোমর থেকে গেঞ্জিটা তুলে বলল, "অ্যাডাম, দ্যাখ তো, কোমরটা ঠিক আছে কিনা।"

এই ঘোলাটে আলোতেও বালিঘড়ির মতো কোমরের খাঁজ দেখা গেল। ফরসা আর মসৃণ। আর আমি অবাক হয়ে দেখলাম, এই ফরসা কোমরে সবুজ লতাপাতার মধ্যে একটা লাল আপেল আঁকা, ট্যাটু। আজকাল

মেয়েরা অনেকেই কোমরের ঠিক উপরে বিভিন্ন রকমের ছবি আঁকায়। লিরিলের কোমরেও ওরকম ছবি আঁকা।

লিরিল ফিসফিস করে বলল, "অ্যাডাম, টাচ ইট। এটা তোর। শুধুমাত্র তোর।"

আমার সব কেমন গুলিয়ে গেল। বুঝলাম, এটা ঠিক নয়। কিন্তু আমার হাত যেন আমার কথা শুনছে না। আমার কাঁপা আঙুল যখন নিষিদ্ধ ফলটা প্রায় ছুঁয়ে ফেলেছে, তখনই কে জানি চিৎকার করে উঠল, "অ্যাডাম, ইউ স্কাউন্ড্রেল।" দেখি করিডরের যেদিকে মাইক্রোবায়োলজি ল্যাব, সেখানে অমিত দাঁড়িয়ে। আমি অবাক হয়ে গেলাম। আজ প্রোফেসর দে নেই, তা হলে অমিত এই সন্ধ্যায় ল্যাবের সামনে কী করছে।"

৫

স্টাইলাস ফেল্ট মার্কার পেন। অ্যালকোহল বেস্‌ড এই কালি হল ফ্লুরোসেন্ট কালি। খালি চোখে দেখা যায় না। গভীর নীলচে আলো বা যাকে ব্ল্যাক লাইট বলে, তার তলায় একমাত্র এই কালি দৃশ্যমান হয়। সাধারণত মিউজিয়ামে, ম্যাজিক শো-তে বা গুপ্তচর বৃত্তির কাজে এই ধরনের পেন ব্যবহার করা হয়।

সে জানে প্রোফেসর এই কালি ব্যবহার করেছেন। প্রোফেসর সবসময় কালো মোটা এই মার্কার পেন ব্যবহার করেন। সাধারণ লোক কিচ্ছু বুঝতে পারে না। সে এও জানে যে, কোনও ডায়েরি বা কাগজপত্রে নয়, প্রোফেসর ফর্মুলাটা লিখে রেখেছেন ল্যাবেরই জিনিসের গায়ে। কিন্তু কোথায় লিখে রেখেছেন তিনি? সে সহজেই ল্যাবের তালা খুলে ফেলল। আজই তার সুযোগ। আজ প্রোফেসর দে রাত্রে তাঁর ল্যাবে কাজ করছেন না।

সে তার ছোট ব্যাগ থেকে ব্ল্যাক লাইটটা বের করল। চারিদিকে খাতাপত্র,

বিকার, বার্নার, বকযন্ত্র, ইকিউবিটার, আরও হাজারও রকম যন্ত্রপাতি। সে প্রথমেই মাটিতে লিখে রাখার সম্ভাবনা বাদ দিল। কারণ, সারাদিন এর উপর দিয়ে ছাত্রছাত্রীরা হাঁটাহাঁটি করে। টেবিল চেয়ারগুলোও একই কারণে বাদ। এগুলোও ব্যবহার করা হয় রোজ। তবে কোথায়? সে ব্ল্যাক লাইট ঘুরিয়ে খুঁজতে লাগল তন্নতন্ন করে। না কোনও কাচের বিকার, না কোনও কাগজপত্র কোথাও কিচ্ছু নেই, যাতে গোপন লেখা ফুটে ওঠে। তবে কি তিনি নিজের বাড়িতে লিখে রেখেছেন কোথাও। না, তাও সম্ভব নয়। সে সব দেখে এসেছে। সেখানেও নেই।

ল্যাবের পাশেই আছে প্যান্ট্রিরুম বা খাবারদাবার রাখার ঘর। ল্যাব থেকে সেই ঘরে যাওয়ার একটা দরজা আছে। যদিও সেটা তালা দেওয়া। এই দরজার পাশে একটা অব্যবহৃত বেসিন আর তার উপরে ঝোলানো অর্ধেক পারা উঠে যাওয়া আয়না। সে গিয়ে দাঁড়াল সেখানে। ভাবল, তবে কি প্যান্ট্রির মধ্যেই প্রোফেসর কোথাও লুকিয়ে রেখেছেন? কিন্তু তালাটা দেখে তো মনে হয় যে, ওটা বহুদিন খোলা হয়নি। আর প্যান্ট্রির আসল দরজা করিডরের অন্য প্রান্তে। তাই মনে হয় না তিনি প্যান্ট্রিতে কিছু লুকোবেন। অর্থাৎ এখানেই আছে। এই ল্যাবেই আছে। প্রোফেসর এখানে সারাদিন কাটান, ফলে চোখের সামনেই তিনি তাঁর দরকারি জিনিস রাখবেন। কিন্তু কোথায় সেটা?

হাতের ব্ল্যাক লাইটটা বেসিনে রেখে সে এগিয়ে গেল ঘরের আরেক কোনায়। আরে ওটা কী? সে থমকাল। ফিরে এল বেসিনের সামনে। ব্ল্যাক লাইটের আলো বেসিনের উপর ঝোলানো আয়নার নীচে অবধি পৌঁছোচ্ছে। আর সেখানেই ফুটে উঠেছে প্রচুর সংকেত। সে ধীরে ধীরে ব্ল্যাক লাইটটা তুলে ধরল আয়নার সামনে। পুরনো আয়না ভরতি ছোট ছোট হরফে অনেক সংকেত লেখা, যার মধ্যে বেশ কয়েকবার এইচ আই ভি শব্দটা সে দেখতে পেল। পাওয়া গেছে। সত্যিই সকলের চোখের সামনে ছিল। সে মুচকি হাসল। প্রোফেসর ভেবেছেন এটা সুরক্ষিত, কিন্তু

ঘটনা হচ্ছে, এ পৃথিবীতে কোনও কিছুই সুরক্ষিত নয়। সে দ্রুত পকেট থেকে মাইক্রোফিল্ম লোডেড ক্যামেরা বের করে ওই সমস্ত সংকেতের ছবি তুলতে শুরু করল।

রাজীব আহুজা সদ্য হাতে পাওয়া ছবির প্রিন্টগুলো কিছুক্ষণ আগে পাঠিয়েছেন তাঁদের চিফ কেমিস্টের কাছে। দেখে নেওয়া তো দরকার সব ঠিক আছে কিনা। তবে তিনি নিশ্চিত যে, তাঁর হাতেই আগামী পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান আবিষ্কারের মশলা। তিনি ভাবলেন একটু মজা করা যাক। তিনি মোবাইলে ধরলেন প্রোফেসর দে-কে।

"গুডমর্নিং প্রোফেসর, ভাল আছেন তো?" আজ রাজীব আহুজার গলা দিয়ে প্রচুর আনন্দ ঝরে পড়ছে।

"হঠাৎ কী মনে করে?" প্রোফেসর দে জিজ্ঞেস করলেন।

রাজীব আহুজা কেটে কেটে বললেন, "আপনার ফর্মুলা আমার হাতের মুঠোয় প্রোফেসর। আমাদের আর আপনাকে দরকার হবে না।"

"ওই আয়নায় লেখা ফর্মুলা তো?" হো হো করে হেসে উঠলেন প্রোফেসর দে। তারপর বলেন, "ওটা দেখে কিচ্ছু বুঝবেন না। ওতে প্রচুর স্টেপ জাম্প আছে। অর্ধেক কেমিক্যাল রি-অ্যাকশন ওতে লেখা নেই। ওটা বিষ ছাড়া সাপ বা বলতে পারেন অনেকটা আপনার মতো মগজহীন মানুষ। আসল ফর্মুলা সব আমার মাথায়, ওটা কিছুটা হিন্ট বলতে পারেন। যা একমাত্র আমিই বুঝব। আর কেউ নয়।" প্রোফেসর দে খিকখিক করে হাসতে লাগলেন।

রাজীব আহুজাকে একটু বিভ্রান্ত দেখাল। আর ঠিক সময় বেজে উঠল তাঁর টেবিলে রাখা ফোন। তিনি প্রোফেসরকে হোল্ড করতে বলে টেবিলের ফোনে সাড়া দিলেন। চিফ কেমিস্টের ফোন, কথাবার্তার শেষে তিনি আবার মোবাইল ধরলেন, "ইউ উইল পে দ্য প্রাইস ফর দিস।"

প্রোফেসর দে বললেন, "খবর পেয়েছেন তবে যে ফর্মুলাটা অসম্পূর্ণ। আর মূল্য দিতে হবে বলছেন? আপনাদের মতো লোকদের হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্য আমি যে-কোনও মূল্য দিতে পারি।"

ফোনটা কেটে দিয়ে প্রোফেসর দে গম্ভীর মুখে বসে রইলেন। এমন সময় দরজার কাছে এক যুবককে দেখতে পেলেন তিনি। এই যুবককে দেখলেই তাঁর মন ভাল হয়ে যায়। বহু বছর পর এই যুবককে তিনি দেখলেন। শেষ যখন তাকে তিনি দেখেছিলেন, তখন এই যুবক নেহাতই বালক। এখন এই সংকটের মধ্যেও তিনি যুবককে দেখে হাসলেন এবং তাঁর চারদিকে ঘন হয়ে আসা অন্ধকারের মধ্যেও তিনি যেন আলো দেখতে পেলেন। এই একজন আছে, যাকে তিনি সব বলতে পারেন। তিনি মনস্থির করে নিলেন। যুবককে তিনি বসতে বললেন সামনের চেয়ারে।

চিফ কেমিস্টের কথাগুলো এখনও কানে বাজছে রাজীব আহুজার। এই ফর্মুলাগুলো দিয়ে কিচ্ছু হবে না। কারণ, মূল কনভারশনগুলোই নেই। এখন কী করবেন তিনি? বোর্ড অব ডাইরেক্টরসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গেব্রিয়েলে না এলে প্রোফেসর দে রোশিক্রুশিয়ান হেল্‌থ কেয়ারেও জয়েন করতে পারবেন না। মানে, তাঁকে করতে দেওয়া হবে না।

রাজীব আহুজা কয়েক মুহূর্ত ভাবলেন। তারপর তাঁর মোবাইলে একটা নম্বর ডায়াল করলেন। ওপাশ থেকে সে ফোন তুলল। এবার তাকে দেওয়া হবে পঁচাত্তর হাজার মার্কিন ডলার। সে জানে এবারের কাজটা একটু বেশিই কঠিন। কারণ, যে সময়ে তাকে কাজটা করতে হবে তার আর মাত্র দু'দিন বাকি। অর্থাৎ সময় কম, খুবই কম।

৬

কাল আমাদের এখানে ফাংশন আর আজ ফুটবল ম্যাচ। কাল অবশ্য আর-একটা অনুষ্ঠানও আছে। প্রোফেসর দে চলে যাচ্ছেন কোনও এক বিদেশি কোম্পানিতে চাকরি নিয়ে। কাল ফাংশনের সঙ্গে তাঁর ফেয়ারওয়েল পার্টিও। ফাংশনের চিফগেস্ট হয়ে আসছেন এক মন্ত্রী। ফলে চারদিকে

সাজ সাজ রব। আজ ফুটবল ম্যাচটা অবশ্য ইন্টার ডিপার্টমেন্ট খেলা। আমাদের সঙ্গে ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের। টেন্টে আমি যখন ড্রেস করছি তখন দেখি ঋতম ঢুকছে। বেশ দেরি হয়ে গেছে। তাই ঋতমকে বললাম, "কী রে, কোথায় ছিলি? তাড়াতাড়ি ড্রেস কর।"

ঋতম ঘাড় নেড়ে ড্রেস করতে শুরু করল। ঋতম আমাদের স্ট্রাইকার। আর শুভ হল লেফ্ট ব্যাক। কিন্তু ও কোথায় কে জানে! আজকাল ক্লাসও তেমন অ্যাটেন্ড করছে না। আর গতকাল থেকে তো একদম বেপাত্তা। অমিতটারও সেম কেস। অবশ্য সেদিন আমাকে আর লিরিলকে করিডরে দেখে তো আমাকে এই মারে কি সেই মারে। শেষে লিরিল এসে যখন বলে যে, অমিত আমাদের মধ্যে কোনওভাবেই নেই, তখন মুখ গোঁজ করে চলে গিয়েছিল। অবশ্য তারপর আমার আর লিরিলের নামে যা তা রটিয়েছে। বলেছে, আমাদের মধ্যে নাকি খারাপ সম্পর্ক আছে। লিরিলকে সে কথা বলাতে ও বলেছে, "ভালই তো। আমাদের মধ্যে যে একটা সম্পর্ক আছে সেটা ভাল নয়?" কাকে কী বলব?

মাঠে নামার মুখে লিরিলের সঙ্গে দেখা। বলল, "আজ তোরা যে ক'টা গোল দিবি আমি তোকে সে ক'টা চুমু খাব। আর যে ক'টা গোল খাবি, তুই সে ক'টা চুমু আমায় খাবি।"

আমি হেসে বললাম, "যদি গোল-লেস ড্র হয়?"

"তবে তো আরও ভাল। দু'জনে দু'জনকে প্রচুর চুমু খাব।" লিরিল হেসে বলল। হাসলে মেয়েটার মুখে দুর্গাপুজোর মতো রোদ ওঠে যেন!

আর কী আশ্চর্য, ফার্স্ট হাফটা সত্যি শূন্য শূন্য রইল। মাঠ থেকে বেরোবার সময় ঋতম বলল, "মনে হচ্ছে লিরিলের ইচ্ছেই পূর্ণ হবে।"

আমি ঋতমকে ধাতানি দিলাম, "ফালতু কথা ছাড়, আমাদের জিততেই হবে।"

আর সেকেন্ড হাফটাও শুরু হল অন্যভাবে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে একটা কর্নার থেকে হেডে গোল করে আমাদের এগিয়ে দিল ঋতম। আর তার

পরেই লাগল ঝামেলা। আমাদের একটা আক্রমণ আটকাতে ফিজিক্সের প্রকাশ লাথি মারল ঋতমকে। আর ঋতম পড়ে যেতেই প্রকাশ বুট দিয়ে মাড়িয়ে দিল ওর থাই। যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল ঋতম। আমরা সবাই ছুটে গেলাম। আমার পাশ দিয়ে যেতে যেতে প্রকাশ বলল, "মাইক্রোবের বাচ্চা, পা ভেঙে দেব।" আমি শুধু ওর দিকে ঘুরলাম, তারপর নিখুঁতভাবে লাথি মারলাম ওর পেটে। আঁক শব্দ করে প্রকাশ শুয়ে পড়ল মাটিতে। আর তারপরেই শুরু হল মারামারি। মিনিট পাঁচেক পর স্যারেরা, ছাত্ররা মিলে কোনওক্রমে মারামারি থামাল। রেফারি প্রকাশকে হলুদ কার্ড আর আমাকে লাল কার্ড দেখালেন। ফলে আমাকে বেরিয়ে আসতে হল মাঠ থেকে। সবাই এসে আমাকে রিজার্ভ বেঞ্চে বসতে বলল। কিন্তু আমি বসলাম না, কিট গুছিয়ে মাঠ থেকে বেরিয়ে এলাম। লিরিল আমার সঙ্গে আসতে চাইছিল। কিন্তু আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, "এখন আমায় একদম ডিস্টার্ব করবি না।" লিরিল কী বুঝল কে জানে, আবার চলে গেল মাঠের ধারে।

৭

সে জানে আজ আর প্রোফেসর দে ল্যাবে আসবেন না। কাল তাঁর ফেয়ারওয়েল। ল্যাবের নীচেই হল বা বাঙ্কোয়েট রুম। সেখানেই কালকের অনুষ্ঠান। তা ছাড়া কাল মন্ত্রীর সিকিউরিটিরা সমস্ত কিছু খুঁটিয়ে দেখবে নিরাপত্তার জন্য। মানে কাজের জন্য আজটুকুই শুধু আছে হাতের মধ্যে।

যদিও সে ইচ্ছে করলেই প্রোফেসর দে-কে অন্যভাবে সরিয়ে দিতে পারে, কিন্তু সেটা হবে খুব ম্যাড়মেড়ে। তার চেয়ে ল্যাবসমেত, গোটা মাইক্রোবায়োলজি বিল্ডিং সমেত মন্ত্রীসহ প্রোফেসর দে-কে উড়িয়ে দিতে পারলে সেটা মজার ব্যাপার হবে।

এখানে তাই সে বোমা ব্যবহার করবে। আর বোমাটা সে প্ল্যান্ট করবে আজই। কারণ, কাল আর সময় নেই। কাল শুধু ঠিক সময়ে বোমাটা ফাটার অপেক্ষা।

এবারের বোমাটা একটু অন্য ধরনের। বোমাটা টেম্পারেচার কন্ট্রোলড বা তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত। একমুখ বন্ধ একটা কাচের নল দশ ইঞ্চির মতো লম্বা। তার নীচের বন্ধ মুখের ইঞ্চি দেড়েক উপরে একটা ছোট্ট ফুটো, তার মধ্যে একটা সরু ধাতব তার ঢোকানো। নলের মধ্যে মাপমতো পারদ ঢালা থাকবে। কম তাপমাত্রায় নীচের তার পারদের মধ্যে ডোবানো থাকবে আর উপরের তারের থেকে তখন পারদের উপরিতলের দূরত্ব থাকবে ইঞ্চিখানেক। দুটো তারের সঙ্গে যোগ থাকবে ব্যাটারি ও ডেটনেটরের। আর ডেটনেটর লাগানো থাকবে আর ডি এক্স-এর সঙ্গে। এখন তাপমাত্রা বাড়লে পারদ প্রসারিত হয়ে উপরের তারে গিয়ে ঠেকবে। যেহেতু পারদ তরল ধাতু তাই সে বিদ্যুৎ পরিবাহী। ফলে গোটা সার্কিট কমপ্লিট হবে। ব্যাটারির পজিটিভ ও নেগেটিভ সংযুক্ত হবে এবং বিদ্যুৎ তার পারদ হয়ে ডেটনেটরে গিয়ে পৌঁছোবে। এরপর ডেটনেটরে মৃদু বিস্ফোরণ আর তার চাপে ও তাপে প্রবলভাবে ফেটে যাবে আর ডি এক্স। ধসে যাবে ল্যাব, বাঙ্কোয়েট, মায় গোটা মাইক্রোবায়োলজি উইং। আর আবিষ্কারসমেত পরপারে চলে যাবেন প্রোফেসর দে।

এখন তাপমাত্রা বাড়াবার জন্য ব্যবহার করা হবে ফ্রিজ, বোমার গোটা সিস্টেমটা একটা বড় জগের মধ্যে লুকিয়ে সাবধানে রাখতে হবে ফ্রিজের মধ্যে। আর ফ্রিজ খুললেই তাপমাত্রা বাড়বে, পারদ প্রসারিত হয়ে এগিয়ে যাবে উপরের তারের দিকে।

অবশ্য এখানে একটা ব্যাপার আছে। গোটা সিস্টেমে একটা সার্কিট কমপ্লিট সুইচ থাকবে। কারণ, ফ্রিজে ঢোকাবার আগে সাধারণ তাপমাত্রায় পারদ প্রসারিত হয়ে উপরের তার ছুঁয়ে থাকবে। ফলে তখন যাতে বিস্ফোরণ না ঘটে তার জন্য থাকবে একটা সুইচ। পুরো সিস্টেমটাকে

ফ্রিজে রেখে পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করতে হবে, যাতে পারদ সংকুচিত হয়ে নেমে যাওয়ার সময় পায়। তারপর ফ্রিজ খুলে পঞ্চাশ সেকেন্ডের মধ্যে সুইচ অন করে ফ্রিজ বন্ধ করে দিতে হবে। এই সুইচ অন করার পরই সিস্টেম কার্যকর হবে। অর্থাৎ এরপরই তাপমাত্রা বাড়লে বোমা ফাটবে।

সে হিসেব করে দেখেছে যে, তাপমাত্রা বাড়লে পঞ্চাশ সেকেন্ড সময় লাগবে পারদের উপরের তার ছুঁতে। অর্থাৎ ফ্রিজ পঞ্চাশ সেকেন্ড বা তার বেশি খোলা রাখলে বোমাটা ফাটবে। আর বোমাটা এমনভাবে তৈরি যে, এটা ইর্‌রিভারসিবল অর্থাৎ একবার বোমা আর্মড হয়ে গেলে তাকে আর বন্ধ করা যাবে না। কারণ, বন্ধ করতে গেলে ফ্রিজ পঞ্চাশ সেকেন্ডের বেশি খোলা রাখতে হবে অর্থাৎ বোমা ফাটবেই।

এখন ফ্রিজ রাখা আছে প্যান্ট্রিতে। বিশাল বড় ফ্রিজ। তাতে কালকের ফাংশন ও ফেয়ারওয়েল পার্টির কোল্ড ড্রিঙ্কস ও মিনারেল ওয়াটার রাখা আছে। তার মধ্যেই লুকিয়ে রাখতে হবে বোমা। আর সেই লুকিয়ে রাখার জন্য শেষ সুযোগ আজ রাতে। সে জানে, এই ফ্রিজ কাল পার্টির সময়ই একমাত্র খোলা হবে, তার আগে নয়।

রাত দেড়টা নাগাদ সে বেরিয়ে এল প্যান্ট্রি থেকে। বোমাটা সে ফ্রিজের মাঝের তাকের সামনের দিকে রেখেছে একটা জগের মধ্যে। তার পিছনে রাখা আছে মিনারেল ওয়াটারের বেশ কিছু বড় বোতল। এখন মিনারেল ওয়াটারের বোতলগুলো বের করতে হলে জগটাকে টপকে বের করতে হবে এবং এতে প্রায় মিনিট চারেক সময় ফ্রিজটা খুলে রাখা দরকার। অর্থাৎ বোমা ফাটবেই।

ল্যাব থেকে বেরিয়ে সে দ্রুত ক্যাম্পাসের মাঠ পেরিয়ে যেতে লাগল। মাথার উপর কচ্ছপের পিঠের মতো রাতের আকাশ। দূরে আলো নেভা হস্টেল। শরতের নিঝুম রাত। সে জানে, কাল রাত আর এরকম থাকবে না। জীবন দ্রুত পরিবর্তনশীল। কোনও কিছুই স্থির নয়। নিরাপদ নয়। সে আর সময় নষ্ট করল না, দ্রুত মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

এই রাতেই অন্য এক জায়গায় নিজের বাড়িতে বসে আছেন প্রোফেসর রমানাথ দে। তাঁর চোখে ঘুম নেই। তিনি জানেন কালকের দিনটাই শুধু। তারপরই তিনি রোসিক্রুশিয়ান হেল্‌থ কেয়ারের সুরক্ষিত আশ্রয়ে। তিনি জানেন গেব্রিয়েল ফার্মাসিউটিক্যাল অনেক কিছু করতে পারে। সেই যুবকটা একজন স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের অফিসারকে নিয়ে এসেছিল তাঁর কাছে। তিনি বলেছেন শুধু কথার ভিত্তিতে গেব্রিয়েলের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না। তবে প্রোফেসর দে-কে ওঁরা কাল যথাসাধ্য প্রোটেকশন দেবেন।

অফিসার চলে গেলেও যুবকটা আজ এখানে থেকে গেছে। আর এখন সে ঘুমিয়ে আছে পাশের ঘরে। প্রোফেসর দে ধীরে ধীরে সেই ঘরের দরজাটা ফাঁক করলেন। বিছানায় অঘোরে ঘুমোচ্ছে যুবকটা। প্রোফেসর দে নিজের যুবক বয়সকেই যেন দেখলেন। স্ত্রীর সঙ্গে ডিভোর্স হয়ে যাওয়ার দশ বছর পর তিনি নিজের ছেলেকে দেখলেন। এই ইউনিভার্সিটিতে যুবকটা ভরতি হয়েছে। তাঁকে খুঁজতেই কি? কে জানে? প্রোফেসর দে দেখলেন, তাঁর ছেলে ঘুমোচ্ছে অঘোরে। তিনি ভাবলেন, কালকের দিনটা শুধু কেটে যাক। তবেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

৮

"অমিতকে দেখছি না, কী ব্যাপার বল তো?" ঋতম গম্ভীর মুখে প্রশ্ন করল আমাকে। আমি কিছু বলার আগেই লিরিল বলল, "কী জানি কোথায়। কেন রে?"

এবার প্রশ্নটা এল ঋতমের পিছনে দাঁড়ানো মাঝারি উচ্চতার ভদ্রলোকের কাছ থেকে, "কারণ, সবাইকে দেখছি, তাকে দেখছি না।"

আমি বললাম, "তাতে কী হয়েছে?"

ঋতম গম্ভীর হয়ে বলল, "অ্যাডাম, ইনি স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চ থেকে এসেছেন। প্রোফেসর দে-র প্রোটেকশনের জন্য।"

"প্রোটেকশনের জন্য?" লিরিল আর আমি একসঙ্গে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম। ভদ্রলোক হালকা কেশে শুরু করলেন, "হ্যাঁ, প্রোটেকশন। কারণ, প্রোফেসর দে ইজ ইন গ্রেভ ডেঞ্জার। এর চেয়ে বেশি আমি বলতে পারব না। বাই দ্য ওয়ে মিট মি, আই অ্যাম জয় ঘোষ। স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চ। আপনাদের নাম?"

আমরা আমাদের নাম বললাম। তারপর জিজ্ঞেস করলাম উনি অমিতকে খুঁজছেন কেন?

জয় ঘোষ খানিক চিন্তা করে বললেন, "দ্যাখো, আমি এক্ষুনি কিছু বলছি না। কিন্তু অমিতের না থাকাটা ভাল লাগছে না আমার। যাক গে, ওকে দেখলে আমাকে জানিয়ো।" জয় ঘোষ দ্রুত অনুষ্ঠান হলের দিকে চলে গেলেন।

"যাচ্চলে! কী কেস বল তো? শুভ গায়েব। অমিত গায়েব। কোত্থেকে জয় ঘোষ না কে একজন এলেন! আশ্চর্য, আজ অনুষ্ঠান না ধাঁধা প্রতিযোগিতা?" আমি লিরিলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

লিরিল কিছু বলার আগেই ঋতম বলল, "আমি একটু আসছি বাথরুম থেকে।"

ও চলে যেতেই লিরিল ঘেঁষে এল আমার গায়ে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "খাবারদাবারের অ্যারেঞ্জমেন্ট ঋতম করছে, না রে?"

লিরিল ফিসফিস করে বলল, "সব তো মনে আছে দেখছি। আমাদের খাবারদাবারটা মনে নেই?"

"আমাদের খাবারদাবার?" আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম।

লিরিল মুচকি হেসে বলল, "সেই যে ফুটবল ম্যাচে এক গোলে জিতলি। একটা গোল একটা চুমু। মনে নেই? আজ ফাংশনের শেষে কিন্তু কিস্‌টা হবে, কেমন?"

ঘণ্টাখানেক বাদে মন্ত্রী এবং তাঁর লোকজন এসে পৌঁছোলেন কলেজে। মন্ত্রীমশাইকে নিয়ে যাওয়া হল স্টেজে। সেখানে তখন বিভিন্ন মাননীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে প্রোফেসর দে-ও বসে। ভিড়ের মধ্যে কেমন একটা হুড়োহুড়ি ভাব মন্ত্রীকে দেখে। এর মধ্যে আমি হঠাৎ দেখলাম অমিতকে!

"কী রে, কোথায় ছিলি তুই?" আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম।

অমিত ভুরু কুঁচকে খেঁকিয়ে উঠল, "তোকে বলব কেন? তুই কে?"

"ঠিক আছে, আমাকে বলবি তো?" দেখি কখন জানি ঋতম এসে দাঁড়িয়েছে।

অমিত বলল, "একটু বাড়ি গিয়েছিলাম, দরকার ছিল। কেন কী হয়েছে?"

ঋতম বলল, "তোকে স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের একজন অফিসার খুঁজছেন।"

নিমেষে অমিতের তেজ উবে গেল। ধরা গলায় বলল, "কেন রে? আমি তো কিছু করিনি।"

আমি এর মধ্যে বললাম, "ওসব বাদ দে। শোন, আমি হস্টেলে যাচ্ছি ফেয়ারওয়েলে দেওয়ার মালাগুলো আনতে। তোরা অন্য বন্দোবস্ত কর।"

ঋতম আমাকে বলল, "তার চেয়ে তুই প্যান্ট্রি থেকে মিনারেল ওয়াটারের বোতলগুলো নিয়ে আয়।"

আমি বললাম, "ভাগ।"

ঋতম অমিতের দিকে ঘুরে বলল, "অমিত, এই নে প্যান্ট্রির চাবি। তুই তবে নিয়ে আয়।"

অমিত চাবিটা হাতে নিয়ে বলল, "আমি কেন? লিরিলকে নয় শুভকে পাঠা। আমার একটা দরকার আছে একটু দোকানে যাব।" বলে অমিত হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গেল।

"কিন্তু আমি তো একটু আগেই লিরিলকে বাজারে পাঠিয়েছি পেস্ট্রি আনার জন্য।" আমি ঋতমকে বললাম।

ঋতম আশ্চর্য হল, "দূর, পেস্ট্রি তো ভরতি আছে।"

আমি বললাম, "শুভকে তবে বল।"

ঋতম মুচকি হাসল, "শুভ? সে এখন স্টেজ ছেড়ে নড়বে না।"

"মানে?" আমি প্রশ্ন করলাম।

ঋতম খানিকক্ষণ দম ধরে বলল, "তুই জানিস না? স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চকে শুভই ডেকে এনেছে। হি ইজ প্রোফেসর দে'জ সন।"

আমার দম বন্ধ হয়ে গেল যেন। এক নিশ্বাসে মনে পড়ে গেল কেন ও প্রোফেসরের ল্যাবের কাছে ঘুরঘুর করত। কেন প্রোফেসরের নামে কেউ কিছু বললে ও রেগে যেত। আমার অবাক মুখের দিকে তাকিয়ে ঋতম অনুষ্ঠানের হল থেকে বেরোতে বেরোতে বলল, "তবে আমিই যাই প্যান্ট্রিতে।"

৯

সে বেরিয়ে এল মাঠে। তারপর দৌড় শুরু করল। ক্যাম্পাসের একপাশে পান্থপাদপের একটা ঝোপমতো আছে। তার পাশেই দাঁড় করানো তার মোটরবাইক। বাইকের পাশে স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা তার রুকস্যাক। সে প্রস্তুত হয়েই ছিল।

ঘড়ি দেখল সে। এতক্ষণে কেউ না কেউ প্যান্ট্রির দিকে গেছেই। আর দেরি নয়। মিনিট দশেকের মধ্যে বিস্ফোরণ হবে। বাইকে স্টার্ট দিয়ে সে বেরিয়ে এল ক্যাম্পাস থেকে। কিন্তু কেন জানি তার মনে হচ্ছে, তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে সে কিছু ফেলে এসেছে। যাক গে, যা হওয়ার হয়েছে। সে স্পিড বাড়াল। আর ঠিক সেই সময়েই তার মোবাইল বেজে উঠল। বাইক থামিয়ে সে ফোনটা কানের কাছে তুলল, "হ্যালো।"

"কোথায় তুই? আমরা তোকে খুঁজছি। লিরিলও খুঁজছিল। কিন্তু এইমাত্র ও প্যান্ট্রিতে গেল মিনারেল ওয়াটার আনতে।"

ফোনের মধ্যে থেকে কেউ যেন তাকে গুলি করল, আর তার এইবার মনে পড়ে গেল যে, সে তার রুমে ফেলে এসেছে চে গুয়েভারার মুখ আঁকা একটা সুন্দর নীল জ্যাকেট। সে, অদম্য সেন টলে গেল। টলে গেলাম। বললাম, "ঋতম, তুই প্যান্ট্রিতে যাসনি?"

"না, লিরিলকে বাজারে যেতে হয়নি। ও খবর পেয়েছিল পেস্ট্রি আছে। আর আমাকেও জয় ঘোষ খুব আর্জেন্টলি তোকে খুঁজতে বলল। তাই লিরিলকে প্যান্ট্রিতে পাঠিয়ে আমি তোকে খুঁজছি। অমিতেরও বাজারে যাওয়া হয়নি, ও-ও তোকে খুঁজছে। তুই কোথায় অ্যাডাম? কী হচ্ছে এসব?" ঋতমের গলায় ভয় আর উদ্বেগ। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে আমার মাথায় বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন। গেব্রিয়েল তাদের প্রভাব খাটিয়ে এই ইউনিভার্সিটিতে ভরতি করে আমাকে। সত্যি পৃথিবীতে কিছুই অসম্ভব নয়। আর তাদের কথামতো সব নিখুঁতভাবে করেছি আমি। পরিকল্পনা মাফিক লাল কার্ড দেখে ফাঁকা হস্টেল ঘরে বসে বানিয়ে নিয়েছি বোমা। না হলে যে একা সময় পাওয়া যাচ্ছিল না। তারপর সময়মতো সেটা রেখে এসেছি ফ্রিজে। সব ঠিক করেও শেষে এসে গোলমাল হয়ে গেল। ফোন কানে নিয়ে আমি থমকে গেলাম। স্পষ্ট যেন দেখতে পেলাম, আমার রেখে আসা বোমার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে লিরিল। যার সঙ্গে আমার একটা চুমু বাকি আছে। যার দেওয়া জ্যাকেট আমি ভুলে ফেলে এসেছি। আর-একটু পরেই উড়ে যাবে গোটা ল্যাব, প্রোফেসর দে আর বহু স্টুডেন্ট। কিন্তু তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ এমন একটি মেয়ে মারা যাবে, যে আমাকে ভালবেসেছিল। আমি সত্যি চাইনি ও এভাবে মারা যাক। তাই তো কায়দা করে ওকে পাঠিয়েছিলাম বাজারে। কিন্তু আর কি সময় আছে? ঋতমের ফোনের লাইন কেটে আমি লিরিলের মোবাইলে রিং করলাম। শুনলাম রিং হচ্ছে। রিং হয়েই যাচ্ছে। ফোন তুলছে না কেন লিরিল? মেয়েটার বড়

দোষ, মাঝে মাঝেই লিরিল মোবাইলটা হস্টেলে রেখে আসে। আজও কি রেখে এসেছে? ও এখন কোথায়? ও কি প্যান্ট্রির খুব কাছে? ওকে কি এখনও বাঁচানো যায়? গেব্রিয়েল, পঁচাত্তর হাজার ডলার সব উড়ে গেল মাথা থেকে। লিরিল, তুই ফোন তুলছিস না কেন? আমারই বা মনে এরকম হচ্ছে কেন? এই কি প্রেম? সত্যি কি প্রেম বেঁধে রাখে মানুষকে? জীবনে এগোতে দেয় না? ওকে বাঁচানোর শেষ চেষ্টা কি করব? পারব বাঁচাতে? আর কি সময় আছে? আমি বাইক স্টার্ট দিলাম। তারপর ফুল স্পিডে বাইকের মুখ ঘুরিয়ে দিলাম কলেজের দিকে।

কিয়ারোসকিউরো

"ইজ়ি ম্যান, ইজ়ি। হাত তুলে দাঁড়াও। না, নড়বে না। নইলে গুলি চালাতে হাত কাঁপবে না আমার।" বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে কথাটা ধারালো বরফের মতো এসে আঘাত করল আমায়। পিস্তলের হ্যামার টানার ধাতব শব্দটা ক্ষীণভাবে এল আমার কানে। আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। ব্রিজের পাশের পোস্টে একটা দুর্বল বাল্‌ব আছে। তার পক্ষে এই বৃষ্টির চাদর ভেদ করা সম্ভব নয়। তবুও পিছনের মানুষটাকে দেখার জন্য হাত তোলা অবস্থাতেও ঘুরলাম আমি। প্রথমে মনে হল, শূন্যের ভিতর একটা বন্দুক ধরা হাত তাক করে রয়েছে আমার দিকে। তারপর ক্রমশ গোটা মানুষটার অবয়ব নজরে এল আমার। কালো রেনকোট পরে রয়েছে মানুষটা, মাথাটা রেনকোটের হুড দিয়ে ঢাকা থাকায় মুখ দেখা যাচ্ছে না। গলার স্বর শুনে বুঝল্যাম মানুষটা আওয়াজ বদলে কথা বলছে...

॥ আমস্টারডম, দু'মাস আগে : ১৩ মে ॥

When you walk through a storm,
Hold your head up high.
And don't be afraid of the dark
At the end of a storm
There's a golden sky.

And the sweet silver song of a lark.
Walk on through the wind.

Walk on through the rain
Though your dreams be tossed and blown...
Walk on, walk on, with hope in your heart.
And you'll never walk alone
You'll never walk alone...

আমার আশেপাশের সকলে এখনও একসঙ্গে গেয়ে চলেছে এই গান। ইউরোপের যে-কোনও ফুটবল মাঠে এই গান খুব পরিচিত। নিজেদের টিমকে সাহস জোগাতে গ্যালারি থেকে সমর্থকরা একসঙ্গে এই গান গায়। বলে, "তুমি একা নও, আমরাও আছি তোমার সঙ্গে।"

মৃত্যুশয্যায় শুয়ে বাবাও এমন বলেছিলেন আমায়। বলেছিলেন, "তুই একা হবি না কোনওদিন। জানবি, আমি আছি তোর সঙ্গে।" এখন ফাদার ফ্রান্সিসও এমন বলেন।

আমার মা মারা গিয়েছিলেন জন্মের সময়। আর বারো বছর বয়সে বাবার মৃত্যুর পর আমায় আশ্রয় দিয়েছিলেন ফাদার ফ্রান্সিস। তারপর বড় হয়ে যখন আমি জীবনে পা রাখলাম, পাহাড় ছেড়ে সমতলে নামলাম, তার আগে তিনি ছোট্ট একটা ছবি দিয়েছিলেন আমায়। বলেছিলেন, "এটা রাখ। তোর বাবার তোলা তোর পাঁচ বছর বয়সের ছবি। এটা সব সময় সঙ্গে রাখবি। জানবি তুই একা নোস। তোর বাবা আছেন তোর সঙ্গে।"

আজ এই গোধূলি আলোর নীচে দাঁড়িয়ে আমার আবার বাবার কথা মনে পড়ল। আমার ওয়ালেটে রাখা সেই ছবির কথা মনে পড়ল। চারদিকে খেলা দেখে বের হওয়া মানুষের ভিড়ে আর একা লাগল না আমার। মনে হল বাবা বলছে, "You'll never walk alone."

আমস্টারডাম এরিনার মতো দুর্দান্ত মাঠ ইউরোপে কমই আছে। এখানে খেলা দেখা হল একটা অভিজ্ঞতা। তাও যদি আবার লিভারপুল আর আয়াখ্স আমস্টারডামের হয়। কিন্তু আমি এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে আসিনি আমস্টারডামে। শুধুমাত্র সময় কাটানোর জন্য আমি ঢুকে পড়েছিলাম মাঠে। সামনে খেলা হলেও আমার মন ছিল না খেলায়। বরং মনের ভিতরে অস্বস্তি হচ্ছিল। টেনশন হচ্ছিল। রাইকার আসবে তো ঠিক সময়ে? আমি ঘড়ি দেখলাম।

পাশের বুলেভার্ডে ছোট্ট কফিশপটা রুবেনের। ওর কাছেই সাইকেল রেখেছি আমি। এই শহরে টুকটাক যাতায়াতের জন্য সাইকেলই বেশি চলে। দোকানের সামনে যেতেই রুবেন আমায় দেখে বলল, "কে জিতল?"

"ড্র হয়েছে। ১-১," বলেই সাইকেলে উঠে পড়লাম আমি।

"কে-কে গোল দিল?"

আমার আর নষ্ট করার সময় নেই। প্যাডেলে চাপ দিয়ে বললাম, "ডি স্টাস্ট্ক্রান্ট-এ দেখে নিয়ো।"

এরিনা বুলেভার্ড থেকে যওডেনব্রিস্ট্রাট যেতে সাইকেলে কুড়ি-পঁচিশ মিনিট মতো লাগে। তবে আঠেরো মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেলাম আমি। রাইকারের সঙ্গে খোলা জায়গায় বেশিক্ষণ থাকব না। কেউ আমাদের একসঙ্গে দেখে ফেলুক আমি চাই না।

রাইকার একজন ফর্জার। পুরনো মাস্টার পেন্টারদের ছবি নকল করতে তার জুড়ি মেলা ভার। তবে মাস্টার পেন্টারদের মধ্যে ওর স্পেশ্যালিটি হল, মোনে আর রেমব্রান্ট। ওর নকল করা রেমব্রান্টের ছবি দেখে কারও পক্ষে বলা সম্ভব নয় সেটা নকল না আসল। রাইকার বলে যে, জাল ছবি আঁকা হল উন্নতমানের শিল্প। এ কাজ সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। এই যে কাজটা ওকে দেওয়া হয়েছে সেটার কথাই ধরা যাক। সম্প্রতি গোয়ায় খুঁজে পাওয়া রেমব্রান্টের আঁকা তাঁর পুত্র টাইটাসের ৭৭.৬৩ সেন্টিমিটার ছবিটা নকল করতে রাইকারের প্রায় একমাস সময় লেগেছে শুধু ছবির সরঞ্জাম

জোগাড় করতে। ওর সঙ্গে ফোনে কথা বলার সময়েই জানতে পারলাম যে, ১৬৫০ সাল বা তার আশেপাশের সময়ের একটা ক্যানভাস জোগাড় করার জন্য ওকে খুব ঘুরতে হয়েছে। তারপর এগমন্ড আন ডেন হোফ নামক ছোট্ট এক শহরের এক ততধিক ছোট সরাইখানায় নাম না জানা এক শিল্পীর আঁকা সেই সময়ের ছবি ও খুঁজে পেয়েছে। এরকম পুরনো বহু অজানা শিল্পীর অনেক ছবি সারা ইউরোপে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে। দশ ইউরো দিয়ে ছবিটা কিনতে হয়েছে রাইকারকে। তারপর ক্যানভাসের রং যথাসম্ভব তুলে, ট্রিটমেন্ট করে সেটাকে উপযুক্ত বানাতে হয়েছে ছবির জন্য। রেমব্রান্টের সময়ের ব্যবহৃত রংও জোগাড় করেছে ও। জোগাড় করতে হয়েছে সেই সময়ের ব্রাশ, আর ভার্নিসও। তারপরেও অশান্তি যায়নি। প্রকৃত ছবিটাকে রেমব্রান্ট যে পদ্ধতিতে এঁকেছিলেন, সেভাবে আঁকতে হয়েছে। ছবির রং শুকোনোর জন্য অল্প আঁচে রুটি সেঁকার মতো সেঁকতে হয়েছে আর সময়ে সময়ে ছবিটাকে নানাভাবে মুড়ে ছবি জুড়ে অসংখ্য হেয়ার ক্র্যাক তৈরি করতে হয়েছে। এগুলো পুরনো ছবির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। তারপর সেই সময় রেমব্রান্ট কী ধরনের সই করতেন, তাও ছবিতে রাখতে হয়েছে। এত করেও কিন্তু আমি জানি, ল্যাব অ্যানালিসিস ও এক্স-রে করলে ছবিটা যে নকল তা ধরা পড়বে। অবশ্য নকলটা যাতে ধরা পড়ে, সেভাবে ছবি তৈরি করতেই বলা হয়েছে আমাকে।

দূর থেকে রাইকারের ডিমের মতো মাথাটা দেখলাম আমি। রাস্তার উপর চেয়ার পাতা একটা রেস্তরাঁয় বসে রয়েছে। আমি পিঠের ব্যাগটাকে হাতে নিয়ে ওর সামনে দাঁড়ালাম। হাতের চিজ় স্যান্ডউইচটা নামিয়ে হলুদ দাঁত দেখিয়ে হাসল রাইকার, "এনেছ?"

আমি ব্যাগটা টেবিলে রেখে বললাম, "ঠিক করে গুনে নাও।"

"ধুর বোকা, তুমি বললেই হবে!" রাইকার ব্যাগটার উপর হাত বোলাল। তারপর পাশের লম্বা ঝোলা থেকে একটা গোল প্লাস্টিকের কেস বের করে বলল, "এই নাও, মাস্টার পিস অব রেমব্রান্ট।"

"রেমব্রান্ট? না তোমার?"

"আমি তো কপিয়ার মাত্র। নাও, দেখো ঠিক হয়েছে কিনা!"

"ঠিক না হলে তুমি আমার হাত থেকে রেহাই পাবে?" ঠান্ডা গলায় বললাম আমি।

রাইকার থমকে এক মুহূর্ত। ও জানে 'রেহাই' দেওয়ার ব্যাপারে আমার সুনাম নেই খুব। ও জোর করে হাসল, "এবার সত্যিই তোমায় অ্যাডাম মনে হচ্ছে। এমন ছদ্মবেশ নিয়েছ যে, কারও বোঝার সাধ্যি নেই যে, তুমি আসলে কে!"

আমি কেসটা আড়াআড়ি করে পিঠে ঝুলিয়ে বললাম, "আর একটা ছোট্ট কাজ আছে, পারবে?"

রাইকার ওর স্যান্ডউইচ শেষ করে পেপার টাওয়েলে হাত মুছল। বলল, "তুমি বলো না, আই উইল ট্রাই।"

আমি ভণিতা না করে বললাম, "এই যে নকলটা আঁকলে, ঠিক এমনই আর-একটা নকল আঁকতে হবে তোমায়। তবে উইথ মর্ডান কালার্স। ছবিটা দেখতে একরকম হলেই হবে। আর বিশেষ কিছু ডিটেল দরকার নেই।"

"কেন? ওই হেয়ার লাইন ক্র্যাকগুলো বা পুরনো রং বা ক্যানভাস মেটিরিয়াল, দরকার নেই?"

"না, দরকার নেই। আর শোনো রাইকার, এই দ্বিতীয় জাল ছবিটার কথা যদি কেউ জানতে পারে, তা হলে অতলান্তিকের তলাতে লুকিয়েও পার পাবে না তুমি, বুঝেছ?"

রাইকার মাথা নাড়ল। বুঝেছে। ও বলল, "ওটা সাত দিনে পেয়ে যাবে তুমি। গিভ মি আ রিং অ্যারাউন্ড দ্যাট টাইম। ঠিক আছে, আমি আসি। ডোন্ট ওরি অ্যাডাম।" রাইকার টেবিলে স্যান্ডউইচের দাম রেখে ওর স্কুটারে চেপে বেরিয়ে গেল।

আমি আবার সাইকেলে উঠলাম। রাতের আমস্টারডাম আলোর গয়নায় সেজে উঠছে। যওডেনব্রিস্ট্রাটে ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে একটা। দূরে রেমব্রান্ট

মিউজ়িয়াম হাউজ় দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে তার পাশের রেমব্রান্ট কর্নার। বাড়ির এক পাশে বিশাল বড় সাইনবোর্ডে রেমব্রান্টের ছবি লাগানো। ছবির তলায় লেখা, তাঁর জন্মের ৪০০ বছর পূর্তি হবে এই ২০০৬ সালে। পৃথিবী বিখ্যাত এই ডাচ আর্টিস্ট এই বাড়িতে কাটিয়েছিলেন তাঁর জীবনের কিছু সেরা সময়। সেই বাড়ির সামনে তাঁরই আঁকা ছবির নকল হাতবদল হল আজ। আমি চোয়াল শক্ত করলাম। সামনে অনেক কাজ পড়ে আছে। আমার পিঠে ঝোলানো ছবিটা বদলে দেবে অনেকের ভাগ্য। আমারও কি? আচ্ছা, ভাগ্য বলে আদৌ কিছু হয়? নাম না জানা ছায়ার মতো মানুষ আমি। অন্ধকার জগতে রোজ নতুন করে ভাগ্য তৈরি করতে হয় আমায়। রাইকার আমায় অ্যাডাম বলে জানে, কেউ আমায় জানে অদম্য সেন বলে, আবার কেউ জানে... আমি সেন্ট অ্যান্টনিব্রিস্ট্রাটের রাস্তায় এগোলাম। আমার এই নতুন কাজের ফলে যে আমার ক্ষতিও হয়ে যেতে পারে, তা আমি জানি। তাই সতর্ক হতে হবে আমায়। কোনও ব্যূহ রচনার আগে তা কেটে বেরোবার পথও জানতে হবে আমায়। আর ওই দ্বিতীয় নকল ছবিটা হবে আমার ব্যূহ কেটে বেরোবার চাবিকাঠি।

আমি প্যাডেলে চাপ দিলাম। সামনের কঠিন দিনগুলোর আগে আমার এখন বিশ্রামের প্রয়োজন। প্রয়োজন ঠান্ডা মাথায় গোটা ছকটা কষে ফেলা। এই কাজে একটু ভুল হওয়া মানেই মৃত্যু। তবুও নিজের বাঁচার জন্য, আমার ফান্ডিং-এ চলা চারটে অনাথাশ্রমের বাচ্চাদের বাঁচার জন্য, এরকম মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতেই হবে আমায়।

৷৷ ২৬ জুন : প্রস্তুতির আড়ালে ৷৷

"সব প্ল্যান মতো এগোচ্ছে তো? আই ডোন্ট ওয়ান্ট এনি এরর। রিমেমবার, এর জন্য কিন্তু অনেক টাকা দেওয়া হবে তোমায়। সুতরাং, কাজ হওয়া চাই-ই," কথা শেষ করে সুধীর বেদী হাতের স্লাইড মোবাইলটা শব্দ করে

বন্ধ করল। তারপর মুখ তুলে বলল, "এবার মনীশ উপাধ্যায় বুঝবে যে, প্রেসিডেন্টের চেয়ারটা গদির নয়। ওর ভিতর দিয়ে কুড়ি হাজার ভোল্টের কারেন্ট যায়!"

অনুপ আইয়ার আধ ঘণ্টায় এই প্রথম কথা বলল, "যদি না হয় কাজটা? যদি গন্ডগোল হয়? মানে মনীশ যদি জেনে যায়?"

"সব সময় বাজে কথা বলো কেন?" সুধীর হলুদ তরল ভর্তি গ্লাসটা এক চুমুকে শেষ করে মুখটা বিকৃত করল একটু। বলল, "আমার প্ল্যান ফুলপ্রুফ। মনীশ হ্যাজ় টু পে দ্য প্রাইস। মনে নেই, গত ফেব্রুয়ারির ইলেকশনে কীভাবে হারাল আমায়? সকলের সামনে প্রমাণ করল আমি নাকি টাকা দিয়ে ভোট কিনতে চেয়েছি। সোয়াইন একটা! কিন্তু ও জানে না, আমায় কেউ মেরে বেরোতে পারে না। আর একটা ড্রিঙ্ক বানাও। টুডে আই উইল সেলিব্রেট দ্য ডাউনফল অব মনীশ উপাধ্যায়।"

অনুপ সামনের টেবিলে রাখা বোতল থেকে ড্রিঙ্ক বানাতে বানাতে দেখল, সোফার ব্যাকরেস্টে চিত করে মাথা রেখে ডান হাত দিয়ে সোফার হাতলে তাল ঠুকছে সুধীর। মানে, ফোনটা করার পর মেজাজ ঠিক আছে। সুধীরের খোশমেজাজে থাকার এটাই লক্ষণ। বহুদিন পরে ওকে এই অবস্থায় দেখল অনুপ। ফেব্রুয়ারির পর এই প্রথম। ফেব্রুয়ারির প্রথম থেকে এই জুনের শেষ, প্রায় পাঁচ মাস হল মনীশ উপাধ্যায় এই কৃষ্টি আর্ট অ্যান্ড কালচারাল সোসাইটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছে সুধীর বেদীকে হারিয়ে।

কৃষ্টি হল ভারতবর্ষের সবচেয়ে প্রেস্টিজিয়াস আর্ট ও কালচারাল সোসাইটি। হিমাচল প্রদেশের কোলে ছবির মতো এক উপত্যকায় কৃষ্টির ক্যাম্পাস। দারুণ লাইব্রেরির সঙ্গে, থিয়েটার হল, ফিল্ম কমপ্লেক্স, আর্ট গ্যালারি, রিসার্চ ল্যাব থেকে শুরু করে দেশি-বিদেশি আর্টিস্টদের জন্য হস্টেল, ডরমিটরি, সুইমিং পুল, কী নেই সেখানে! সারা পৃথিবীর নানা কোম্পানির স্পনসরশিপ পায় কৃষ্টি। ফলে এর প্রেসিডেন্ট পদটি যে লোভনীয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

বছরখানেক ধরে সুধীর সব আঁটঘাট বেঁধেছিল এই প্রেসিডেন্টশিপের জন্য। কিন্তু মনীশ উপাধ্যায় একদম ক্লিন সুইপ করে বেরিয়ে যায়। উপরন্তু বোর্ডের সকলের সামনে প্রমাণ করে দেয় যে, সুধীর টাকা দিয়ে ভোট কিনতে চেয়েছিল। তখন থেকে তক্কে তক্কে আছে সুধীর। মনীশ উপাধ্যায়কে ছাড়বে না ও। তাই এমন একটা প্ল্যান সাজিয়ে রেখেছে, যা কিনা সামনের ১৫ জুলাই শুধু প্রতিশোধই তুলবে না তার সঙ্গে লক্ষ লক্ষ ডলারও তুলবে সুধীরের ঘরে।

সুধীর বেদী তিনটে জিনিস পছন্দ করে, হুইস্কি, টাকা আর ক্ষমতা। টাকা সুধীর বেদীর প্রচুর। নানা ধরনের ব্যবসায় প্রচুর টাকা খাটে ওর। তবু পিপাসা মেটে না। এই পিপাসায় যোগ হয়েছে ক্ষমতার লোভ। অনুপ, সুধীরের মুখ চোখ দেখে বোঝে যে, এই কৃষ্টির প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য যা খুশি তাই করতে পারে লোকটা।

অনুপের টাকাও কম নেই। তবুও সুধীরের সঙ্গে মানসিকতায় পেরে ওঠে না ও। অমন অ্যাটাকিং লোকের সামনে চুপ করে থাকে তাই। আর সুধীর ওর সঙ্গে ব্যবহারও করে তেমন। তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে সবসময়। যেন বোঝাতে চায়, অনুপের মতো একজন স্পাইনলেসকে ও-ই দয়া করে এনেছে এখানে। অনুপের নিজস্ব কোনও যোগ্যতা নেই। তাই অনুপ ভিতরে ভিতরে গুমরালেও সুধীরকে এর উপযুক্ত জবাব দিতে পারেনি এখনও। তবে সুধীর মোটামুটি অনেক কিছুই বলে অনুপকে। এমনকী, ওর প্ল্যানটাও বলেছে। তবে প্ল্যানমাফিক কে কাজ করছে তা বলেনি। সুধীর নিজেও লোকটাকে দেখেনি। সে নাকি কখনও সামনে আসে না! কে জানে সুধীর সত্যি বলছে কিনা!

গ্লাসটা সুধীরের দিকে এগিয়ে দিল অনুপ। ঘড়ি দেখল। রাত সাড়ে দশটা। এবার বাড়ি ফিরতে হবে। ও উঠল। যাওয়ার আগে বলল, "সুধীরভাই, যা করবে ভেবেচিন্তে করবে। তুমি যা প্ল্যান করেছ তা ভয়ংকর। ধরা পড়লে..."

"তুম চুপহি রহো তো আচ্ছা হ্যায়। ভয় পেলে হবে? সেইজন্যই কোনওদিন কিছু হবে না তোমার। বাপ-ঠাকুরদার পয়সায় বড়লোক হয়ে লেজ নাড়বে শুধু। নেগেটিভ কথা না বলে এখন যাও। লেট মি এনজয় মাই ড্রিঙ্ক। যাও।"

'বাপ ঠাকুরদার পয়সায় বড়লোক,' কথাটা গায়ে লাগল অনুপের। সুধীর বেদী সবসময় কেন এমন করে খোঁচা মারে ওকে? অনুপকে নিচু করে কি নিজেকে বড় প্রমাণ করতে চায় ও? বাইরে পোর্টিকোর নীচে রাখা কালো গাড়িতে গিয়ে বসল অনুপ। সুধীরের শেষ কথায় মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছে। ওকে বড্ড বেশি আন্ডার এস্টিমেট করে সুধীর। এর একটা বিহিত হওয়া দরকার। আসলে অনুপ আইয়ার কে, তা বোঝানোর সময় এসেছে সুধীর বেদীকে। ও চলন্ত গাড়ির জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল। মোবাইল বের করে নম্বর ডায়াল করল একটা। কানে লাগিয়ে বলল, "সব প্ল্যানমতো এগোচ্ছে তো?"

॥ ২৮ জুন : অনিশ্চয়তা ॥

"মানব সভ্যতার ইতিহাসে শিল্পের কথা উঠলে যে ক'জন শিল্পীর নাম আমাদের আলোচনা করতেই হবে, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন রেমব্রান্ট। ১৬০৬ খ্রিস্টাব্দের ১৫ জুলাই হল্যান্ডের লেডেন শহরে রেমব্রান্টের জন্ম। ওঁর পুরো নাম রেমব্রান্ট হারমেনস্‌জুন ভন রাইন। ওঁর বাবা ছিলেন শস্য পেষাই কলের মালিক, যাকে সাধারণত মিলার বলা হয়। বাড়ির অবস্থাও ভাল ছিল রেমব্রান্টের। লেডেনের লাতিন স্কুলে গ্রিক, অঙ্ক, ক্লাসিক্যাল লিটারেচার, ভূগোল ও ইতিহাস নিয়ে পড়া শেষ করে তিনি লেডেন ইউনিভার্সিটিতে বিজ্ঞান নিয়ে ভরতি হন। কিন্তু ছবি আঁকার দিকে প্রবল ঝোঁকের ফলে পড়াশোনা বন্ধ করে দেন মাঝপথে। প্রথমে জেকব ভ্যান সোয়ানেনবার্গ ও পরে পিয়েতর লাস্টম্যানের কাছে কাজ শেখেন তিনি।

এই পিয়েতর লাস্টম্যানের প্রভাব রেমব্রান্টের আঁকার জীবনে সুদূরপ্রসারী। এর কাছে কাজ শেখার সময়েই রেমব্রান্ট রেনেসাঁ যুগের চিত্রকলা সম্বন্ধে আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং প্রভাবিতও হন।”

অধ্যাপক গোকুল মিশ্র এবার থামলেন। টেবিল থেকে গেলাস তুলে জল খেলেন একটু। তারপর ঝুলে-পড়া কাঁচা-পাকা গোঁফের ফাঁক দিয়ে হাসলেন। বললেন, “এই ২০০৬ সালে বসে ১৬০৬ সালে জন্মানো একজনের কথা শুনে তোমরা বোর হচ্ছ না তো?”

নীল দেখল সারা ক্লাস সমস্বরে জানাল যে, তারা বোর হচ্ছে না। ভাল লাগল ওর। এই তেরো-চোদ্দো বছরের ছেলেমেয়েদের দেখলে ওর আবার এই বয়সে ফিরে যাওয়ার লোভ হয়। সিমলার একটা স্কুল থেকে এরা ‘কৃষ্টি আর্ট অ্যান্ড কালচারাল সোসাইটি’ দেখতে এসেছে। এ বছর, অর্থাৎ এই ২০০৬ হল রেমব্রান্টের জন্মের চারশো বছর। সেই উপলক্ষে ১৫ জুলাই রেমব্রান্টের জন্মদিনে আর্ট এগজ়িবিশন ও মেলা হবে এখানে। কৃষ্টির এই আর্ট ডিপার্টমেন্টে তারই প্রস্তুতি চলছে। অধ্যাপক গোকুল মিশ্র খুবই ব্যস্ত সেই নিয়ে। তবুও তারই ভিতর রেমব্রান্ট নিয়ে ছোটদের সামনে দু’-চার কথা বলার সময় বের করেছেন উনি।

গোকুল মিশ্র আবার শুরু করলেন, “তারপর ১৬২৫ সালে রেমব্রান্ট লেডেনে ফিরে নিজের স্টুডিয়ো খুলে কাজ শুরু করেন। ক্রমশ তাঁর নাম লোকে পোর্ট্রেট আঁকিয়ে হিসেবে জানতে শুরু করে। তাঁর নানা ছবির মধ্যে ‘দি অ্যানাটমিক্যাল লেকচারার’, ‘দ্য জিউস ব্রাইড,’ ‘দ্য নাইট ওয়াচ’, কিছু সেল্‌ফ পোর্ট্রেট, ‘টাইটাস অ্যাট হিজ় ডেস্ক’ বিখ্যাত। সম্প্রতি গোয়া থেকেও রেমব্রান্টের আঁকা টাইটাসের আর-একটা ছবি খুঁজে পাওয়া গিয়েছে, যা এই কৃষ্টিতে রেস্টোর করার কাজ চলছে। এই টাইটাস হল রেমব্রান্ট ও তাঁর স্ত্রী সাসকিয়ার পুত্র। টাইটাসের জন্মের পরের বছর সাসকিয়ার মৃত্যু হয়। আর সাতাশ বছর বয়সে মৃত্যু হয় টাইটাসের। শেষ বয়সে কপর্দকশূন্য হয়ে অবহেলায় মৃত্যু হয় রেমব্রান্টেরও। তবে তিনি

মারা গেলেও তাঁর ছবিগুলোর মৃত্যু ঘটেনি। পিকাসোকে পর্যন্ত তাঁর ছবি প্রভাবিত করেছিল। আলো-ছায়ার খেলায় তাঁর ছবিগুলো আজও শ্রেষ্ঠ শিল্পের মর্যাদা পায়। আমি খুব সংক্ষেপে রেমব্রান্ট সম্বন্ধে তোমাদের বললাম। এবার কিছু জানার থাকলে তোমরা আমায় প্রশ্ন করতে পারো,” গোকুল মিশ্র থামলেন।

নীল বসল না আর। অডিটোরিয়ামের শেষ বেঞ্চ থেকে উঠে বেরিয়ে এল চওড়া করিডরে। তবে সেটুকু সময়ের মধ্যেই শুনল একটা ছেলে জানতে চাইছে, “এই রেমব্রান্টের এক-একটা ছবির দাম কত হবে স্যার?”

হাসি পেল নীলের। এরাও এই বয়সে এখন টাকাপয়সার ব্যাপারটা বুঝে গিয়েছে। ও ঘড়ি দেখল। বিকেল সাড়ে তিনটে বাজে। সন্ধে সাতটার আগে গোকুল মিশ্র সময় দিতে পারবেন না। তাই এই সুযোগে হস্টেলে ফিরে একটু ফ্রেশ হয়ে নিতে হবে।

নীল করিডর থেকে মাঠে নামার সিঁড়িতে পা দিতে গিয়েও থমকে গেল। সেই সুন্দরমতো মেয়েটা হাত তুলে ওকে দাঁড়াতে বলছে। নীল দাঁড়াল। এমন হাতছানি এড়ানো উচিত নয়। নীল এখানে এসেছে চারদিন হল। তার মধ্যে এই মেয়েটাই চোখে পড়েছে প্রথমে। এত সুন্দর দেখতে মেয়েটাকে চোখে না পড়ে যে উপায় নেই! এমন টানাটানা চোখ-নাক কি মিকেল এঞ্জেলো নিজে তৈরি করেছেন? তবে আলাপ করার সুযোগ হয়নি এখনও। বোধহয় এবার হবে। মেয়েটা এদিকেই আসছে।

শুধু মেয়েটা নয়, এল আরও তিনজন। এদের মুখ চেনা। হস্টেলে আর এই ক্যাম্পাসেও এদের দেখেছি। কিন্তু পরিচয় হয়নি।

মেয়েটা এগিয়ে এসে হাত বাড়াল নীলের দিকে, “হাই, আয়্যাম কুমুদ্বতী বিসারিয়া।”

“নীল, আই মিন নীলাম্বর দে।”

“বেঙ্গলি?” হাসল কুমু।

“হ্যাঁ,” নীল এবার প্রশ্নবোধক চাহনিতে তাকাল বাকিদের দিকে।

কুমুই পরিচয় করিয়ে দিল। প্যাট্রিক জফ, ইতালি থেকে এসেছে। পূরব ঝা এসেছে বিহার থেকে আর হিরণ্য কারলেকের এসেছে মহারাষ্ট্র থেকে। কুমুদ্বতী নিজে রাজস্থানের মেয়ে। এক মাসের জন্য ওরা সকলে এসেছে এই কৃষ্টিতে আর্টের ওপর একটা ওয়ার্কশপে।

কুমু প্রশ্ন করল, "তুমি তো প্রোফেসর গোকুল মিশ্রর জীবনী লেখার কাজ করছ, না?"

নীল মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ। ওঁর উপর অনেক আগেই এমন বই লেখা দরকার ছিল। কিন্তু আমাদের দেশে বোধহয় গুণীদের কদর হয় না।"

"তা কেন? তুমি তো লিখছ," এবার পূরব কথা বলল।

"এত অল্প বয়সে হঠাৎ এমন জীবনী লেখার মতো বোরিং কাজ করছ?" বলেই ছোট্ট করে জিভ কাটল কুমু। বলল, "আই অ্যাম জাস্ট জোকিং!"

নীল হাসল। ভারী হাসিখুশি মেয়ে তো! তবে এত অল্প বয়স কথাটা বোধহয় ঠিক নয়। ছাব্বিশ বছরটা খুব একটা কচি বয়স নয়।

প্যাট্রিক বলল, "তোমায় তো হস্টেলে দেখেছি আমি। তা ক'দিনের জন্য এসেছ? মানে জীবনী লেখার জন্য ইনফো পেতে আর কতদিন লাগবে বলে মনে হয়?"

"প্রোফেসর মিশ্র তো তেমনভাবে সময়ই দিতে পারছেন না। ১৫ জুলাই না গেলে কিচ্ছু বলা যাবে না," নীল বলল।

হঠাৎ একটা পায়ের শব্দ শুনে নীল পিছনে ঘুরল। একটা লোক এসে দাঁড়িয়েছে। গায়ে নীল ফুলশার্ট আর সাদা প্যান্ট। পাট করে আঁচড়ানো চুল। আর এই ছায়াচ্ছন্ন করিডরেও চোখে সানগ্লাস পরে রয়েছে। লোকটা কোনও ভণিতা না করে নীলকে বলল, "এই যে মিস্টার, তুমি তোমার নাম আর হোয়্যার অ্যাবাউটস আমাদের সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্টে লিখিয়েছ?"

"মানে?" ঘাবড়ে গেল নীল।

"তুমি জানো না যে, ১৫ জুলাইয়ের মধ্যে কেউ যদি এখানে আসে,

তার ডিটেল আমাদের রাখতে বলা হয়েছে? যাও, এখনই সাউথ গেটে আমাদের অফিসে গিয়ে নাম-ধাম লিখে এসো,” কথা শেষ করে লোকটা এবার কুমুর দিকে তাকাল। চোখ কালো কাচের আড়ালে থাকলেও ঠোঁটের ভঙ্গিটার মধ্যে একটা অসভ্যতা টের পেল নীল। আচ্ছা বদ লোক তো!

লোকটা এবার বলল, “আর তোমরা? পিকাসো রসেটিরা? নাম, গোত্র সব লিখেছ তো?”

প্যাট্রিক বলল, “লিখেছি, তবে এর দরকারটা বুঝতে পারছি না। আমরা তো আর্টিস্ট ওয়ার্কশপে এসেছি। তার জন্য এমন প্রসিডিয়োর কেন?”

“আর্টিস্ট?” লোকটা মুখ বাঁকাল, “গত চার মাসে সিডনি, আমস্টারডাম, প্যারিস আর নিউ ইয়র্ক থেকে রেনোয়া, মোনে, গগ্যাঁ আর ক্লিমট চুরি গিয়েছে। এখানেও রেমব্রান্টের অপ্রকাশিত ছবি রয়েছে। চোরেরা যে ছোঁক ছোঁক করছে! তাই সব নামধাম দরকার, বুঝেছ? আর তা ছাড়া এই করিডরটা তো কফিশপ নয়, যে আড্ডা দেবে। যাও তোমরা এখন, ডিসপারস,” লোকটা চলে যাওয়ার আগে আর একবার কুমুকে মাপল।

দূরে কালো কাচে ঢাকা নীলের ছোট্ট গাড়িটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেটার দিকে হাঁটতে হাঁটতে ও বলল, “এভাবে কথা বলছেন কেন ভদ্রলোক? কী নাম এঁর?”

“ভদ্রলোক? হুঃ, ছোটলোক,” কুমুর গলায় রাগ, “এর নাম তমোনাশ রয়। এখানকার সিকিয়োরিটি চিফ। অসভ্য, ইতর একটা। এমন করে কথা বলছে যেন আমরা সব চোর। মুডটাই অফ করে দিল।”

নীল গাড়ির সামনে পৌঁছে দরজা খুলে বলল, “তোমরা হস্টেলে গেলে আমি তোমাদের লিফট দিতে পারি।”

প্যাট্রিক বলল, “না, আমাদের একটা সেশন আছে। সেখানেই যাচ্ছিলাম। তুমি গোকুল মিশ্রর জীবনী লিখছ বলে আলাপ করতে এলাম। আচ্ছা, আসি। কেমন?”

নীল গাড়িতে বসে কালো কাচ তুলতে যাবে এমন সময় হিরণ্য

এই প্রথম গাড়ির জানলায় ঝুঁকে বলল, "নামটা কিন্তু লিখিয়ে দেবে সিকিয়োরিটি রেজিস্টারে। রেমব্রান্টের ছবি ডিসপ্লে করা হবে ১৫ জুলাই। তার আগে সকলকে সজাগ থাকতে হবে। প্রায় পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার দাম এই ছবিটার। তমোনাশ রয়ের কথা যদি সত্যি হয়, তা হলে কিন্তু এই হিমাচলের উপত্যকাতেও মধুর লোভে মৌমাছি এসে জুটবে। আগাম সতর্কতা সবচেয়ে বেশি জরুরি। হয়তো ছবিচোর ইতিমধ্যেই এসে উপস্থিত হয়েছে এখানে।"

॥ ১ জুলাই : অপেক্ষা ॥

চারদিকে পাহাড়ে ঘেরা বাটির মতো উপত্যকায় কৃষ্টি আর্ট অ্যান্ড কালচারাল সোসাইটির ক্যাম্পাসটা এখান থেকে থার্মোকলের তৈরি মনে হচ্ছে! এখন বর্ষাকাল, তবুও বিশেষ বৃষ্টি হচ্ছে না। পরিষ্কার নীল আকাশ জুড়ে সাদা মেঘ ছুঁয়ে রয়েছে পাহাড়ের মাথা। এমন সুন্দর জায়গায় দাঁড়িয়ে আমার হঠাৎ ফাদার ফ্রান্সিসের কথা মনে পড়ল। বহুদিন দেখা হয়নি ফাদারের সঙ্গে। আমি সময়ে সময়ে শুধু ওঁর অ্যাকাউন্টে কিছু টাকা জমা দিই। তবে উনি বারণ করেন। বলেন, "দরকার নেই আমার। এই ছোট্ট পাহাড়ে মানুষের সাহায্যে ঠিক চলে যায় আমাদের।" কিন্তু ওঁর আশ্রম ছাড়াও আরও অন্য অনাথাশ্রমকেও টাকা দিই আমি। তাই সেখানকার শিশুদের সুস্থভাবে বাঁচার জন্য চাই টাকা। অনেক টাকা।

আর এই টাকা, ওই দূরে থার্মোকলের মতো দেখতে বাড়িটার মধ্যে থাকা একটা ছবি আমায় দেবে! রাইকারের এঁকে দেওয়া দুটো ছবিই সযত্নে রেখে দিয়েছি আমি। আর সময় হলে...

মার্চ মাসের প্রথমে এস বি-র ফোনটা পাওয়ায় আমি অবাক হইনি। নানা ধরনের অপরাধমূলক কাজের বিনিময়ে আমি মোটা টাকা নিই। তবে আমি কখনও ক্লায়েন্টদের সামনে যাই না। ফোনে কথা সেরে বলি যে,

কাজ হয়ে গেলে আমার অ্যাকাউন্টে টাকাটা জমা দিয়ে দিতে অথবা অন্য কোনও জায়গা থেকে টাকাটা তুলে নিই আমি। অন্যান্যদের মতো এস বি-ও প্রথমে দেখা করতে চেয়েছিল আমার সঙ্গে। আমি আমল না দিয়ে বলেছিলাম, "আপনি ফোনেই বলুন।"

উনি বলেছিলেন, "আমার জরুরি একটা কাজ করে দিতে হবে আপনাকে। কৃষ্টি আর্ট অ্যান্ড কালচারাল সোসাইটিতে ১৫ জুলাই রেমব্রান্টের একটা অপ্রকাশিত ছবি প্রকাশিত হবে। তার আগে সেটার রেস্টোরেশনের কাজ চলবে। রেস্টোরেশন শেষ হবে ৯ জুলাই আর প্রদর্শনী ১৫ জুলাই। ঠিক এর মাঝের দিনগুলোর মধ্যেই ওই ছবিটা আপনাকে লুকিয়ে বের করে আনতে হবে। আর তার পরিবর্তে প্ল্যান্ট করতে হবে একটা হুবহু নকল ছবি। ছবিটা এমনভাবে করাবেন, যাতে খুঁটিয়ে ল্যাব টেস্ট করলেই একমাত্র বোঝা যাবে যে, সেটা আসলে নকল। পারবেন?"

না পারার মতো কিছু নেই। ইমপসিবল ইজ় নাথিং।

এস বি বলেছিল, "আমি আপনাকে ছবিটার বড় দুটো ফোটোগ্রাফিক প্রিন্ট পাঠাব। সেটা দেখে আঁকা সম্ভব হবে নিশ্চয়ই? আচ্ছা, কীভাবে পাঠাব? আপনি তো দেখা করবেন না।" রাইকারের ঠিকানায় ছবিগুলো পাঠাতে বলেছিলাম আমি। তারপর বলেছিলাম, "এর জন্য আমি পঁচাত্তর হাজার ডলার নেব।"

"ডান। তবে পুরোটাই কাজের পরে দেব, আগে নয়। আপনাকে বিশ্বাস করতে পারি তো?"

বিশ্বাসভঙ্গের কাজ আমি মাত্র একবার করেছি। তাও নিরীহ মানুষদের বোমার হাত থেকে বাঁচিয়ে! কিন্তু এ তো নিরীহ চুরি। কোনও প্রাণনাশের আশঙ্কা নেই। আমি বলেছিলাম, "বিশ্বাস করতে পারেন, যদি আপনি নিজে অবিশ্বাসের কোনও কাজ না করেন।"

সেই ডিলের ফলশ্রুতি এই ছবি। রেমব্রান্টের আঁকা তাঁর ছেলে টাইটাসের ছবির নকল। রাইকার এঁকে দেওয়ার পর ইয়োরোপের চারজন

বিশেষজ্ঞকে দিয়ে চেক করিয়েছি নকল ছবিটাকে। তারা বলেছে, এত দুর্দান্ত নকল তারাও কোনওদিন দেখেনি! এখন শুধু অপেক্ষা। গোয়া থেকে খুঁজে পাওয়া রেমব্রান্টের ছবিটার সংস্কারের অপেক্ষা। কৃষ্টি ফাউন্ডেশনে সেই সংস্কারের কাজ শেষ হলেই আমি নেমে পড়ব কাজে। কাজ, আমার জন্য, ছোট ছোট বাচ্চাদের জন্য।

পাহাড়ি নদীর উপর পুরনো ইটের লাভার্স ব্রিজ পেরিয়ে হাঁটতে থাকলাম আমি। কৃষ্টিতে ফিরতে হবে আমায়।

॥ ৫ জুলাই : প্রতিক্রিয়া ॥

মুখ, চোখ এখনও লাল হয়ে আছে সুধীর বেদীর। মনে হচ্ছে, কেউ যেন মাথার ভিতরে বসে আগুন জ্বালাচ্ছে। যে-কোনও মুহূর্তে মাথাটা ফেটে যেতে পারে। করিডর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ঘড়িটা দেখল ও। সন্ধে সাড়ে সাতটা বাজে। ওর এক জায়গায় ডিনারের নেমন্তন্ন রয়েছে। কিন্তু মনটা এমন টক হয়ে আছে যে, কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না। সকলের সামনে মনীশ উপাধ্যায় এমন করে বলতে পারল?

সুধীর জানতে চেয়েছিল, "এই যে রেমব্রান্টের চারশো বছর উপলক্ষে তাঁর অপ্রকাশিত ছবি উন্মোচন করার পরিকল্পনা করেছেন, তার জন্য উপযুক্ত সিকিয়োরিটির ব্যবস্থা করেছেন তো?"

"মানে?" ভুরু কুঁচকে তাকিয়েছিল মনীশ, "আপনি এমন প্রশ্ন করছেন কেন?"

"জানেন না, গত বছরখানেকের মধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে নানা মূল্যবান ছবি চুরি হয়েছে? তাই জানতে চাইছি, এখানে নিরাপত্তার ব্যবস্থা কেমন?"

"তমোনাশ রয়েছে। হি ইজ় ভেরি গুড ইন সিকিয়োরিটি ম্যাটার্স।"

"তমোনাশ রয়? ওই হামবাগ, খিটখিটে লোকটা? মিস্টার উপাধ্যায়,

রেমব্রান্টের ছবিটা এখান থেকে চুরি হলে কিন্তু কৃষ্টির ভীষণ বদনাম হবে। আপনার তো দায়িত্ব আছে একটা।”

“প্লিজ়, আমাকে আমার দায়িত্ব শেখাবেন না। ‘দায়িত্ব’ কথাটা আপনার মুখে মানায় না। আমার সিকিয়োরিটি যথেষ্ট টাইট।”

এবার সুধীর রেগে উঠেছিল, “আপনি আমায় ব্যক্তিগত আক্রমণ করছেন কেন? আর শুধুমাত্র তমোনাশ রয়ের উপর ভরসা করছেন? আপনি বোঝেন রেমব্রান্টের আঁকা ছবির গুরুত্ব?”

“শাট আপ,” মনীশ উপাধ্যায় চিবিয়ে চিবিয়ে বলেছিল, “রেমব্রান্টের ছবিটা যেখানে রাখা হবে সেই গ্র্যান্ড গ্যালারি ছ’তলায়। বাইরে থেকে হেভিলি গার্ডেড। রাতে সব দরজা বন্ধ থাকে। ওর একদিকের কাচের দেওয়ালটা লেজার-রে দিয়ে স্ক্রিন করা। তা ছাড়া একজন ইন্টারপোল থেকে এখানে আছে। বাট অবভিয়াসলি ইন ডিসগাইস।”

“ইন্টারপোল? হঠাৎ?” মনে মনে সতর্ক হয়ে উঠেছিল সুধীর। ওর প্ল্যানে তো ইন্টারপোল নামক কাঁটাটা ছিল না।

“প্যাট্রিক জফ। ওয়ার্কশপ অ্যাটেন্ড করতে এসেছে। আসলে অপ্রকাশিত এই রেমব্রান্ট মানুষের কৌতূহল বাড়াচ্ছে। ইন্টারপোলের কাছে খবরও আছে যে, ছবিটা নাকি টার্গেট হতে পারে। হল্যান্ডে একজন আর্ট ফরজার ধরা পড়েছে। তার থেকে নাকি পুলিশ জানতে পেরেছে এই ছবিটাও চোরদের টার্গেটে আছে। তাই তারা জফকে পাঠিয়েছে। তবে ব্যাপারটা কেউ জানে না। আর মনে রাখবেন, কথাটা কৃষ্টির ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের মধ্যেই যেন থাকে। বুঝেছেন?”

সুধীর বলেছিল, “এমন করে বলছেন কেন? আমরা কাকে বলব? কৃষ্টির ভালটা আমাদেরও মাথায় আছে। তা ছাড়া আমার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে কি সন্দেহ আছে আপনার।”

“বিশ্বাস? আপনাকে? মনে নেই, আগের ইলেকশনে কী করেছিলেন? তারপরও কোন মুখে এসব কথা বলছেন আপনি? এই ম্যানেজিং কমিটির

রুলিং গ্রুপ আর অপোজ়িশনের মধ্যে যাতে স্বচ্ছতা থাকে, তাই এই খবরটা দিলাম আমি। না হলে দিতাম না। আমার শরীরে তো আর চোরের রক্ত নেই, যে লুকিয়ে সব করব।”

চোর! মানে? সকলের সামনে ওকে চোর বলা? মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠেছে সুধীর বেদীর। মাথায় আগুন জ্বলছে। বড্ড বাড় বেড়েছে মনীশের। এমন টাইট দেবে যে, জীবনে আর মাথা তুলতে হবে না।

গাড়িতে বসে পকেট থেকে একটা ওষুধ বের করে জিভের তলায় রাখল সুধীর। হার্ট বেশি চাপ সহ্য করতে পারে না আজকাল। এই ওষুধ আর পিস্তল সুধীরের নিত্যসঙ্গী। গাড়ির সামনের সিটে ওর একজন বডিগার্ড থাকলেও একটা ছোট অটোম্যাটিক পিস্তল সবসময় সঙ্গে রাখে ও। রোজগার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শত্রুও যে বাড়ে! তবে প্যাট্রিক জফ একটা অশনি সংকেত! ওর প্ল্যান ভন্ডুল হওয়ার একটা চান্স থেকে যাচ্ছে। অদম্য সেন নামে ছবি বদলের জন্য যাকে নিয়োগ করেছে সুধীর, ক্রাইম দুনিয়ায় তার প্রচুর নাম। কিন্তু তা হলেও পঁচাত্তর হাজার ডলার চেয়ে একটু বাড়াবাড়িই করেছে লোকটা। সুধীরের অন্য একটা ভাবনা রয়েছে। তাই সুধীর একটা ব্যাকআপও রেখেছে। সিজ়ার। ঠান্ডা মাথায় রক্তপাত ঘটাতে তার মতো পারদর্শী কেউ নেই। ছায়ার মতো কাজ করে দৈত্যের মতো চেহারার লোকটা। এর আগেও ব্যাবসার নানা ক্ষেত্রে তাকে কাজে লাগিয়েছে সুধীর। ইন্টারপোলের লোকজন খুবই দক্ষ হয়, তাই চান্স নেওয়া যাবে না। কিন্তু জফকে একেবারে প্রাণে মেরে দেওয়াও সম্ভব নয়। তা হলে সমস্যা বাড়বে আরও। তাই শুধু জখম করে সরিয়ে দিতে হবে। আর জখমটাও এমনভাবে করতে হবে, যাতে মনে হয় অ্যাক্সিডেন্ট। তারপর দেখা যাবে মনীশের দৌড়।

চোর? আমি চোর? চোয়াল শক্ত করল সুধীর বেদী। মনীশ উপাধ্যায়, তুমি দেখো কীভাবে সকলের সামনে তোমায় চোর প্রতিপন্ন করব আমি। ১৫ জুলাই রেমব্রান্টের আঁকা ছবি দেখে পাবলিকলি আপত্তি তুলব আমি।

বলব, আসল রেমব্রান্ট সরিয়ে তুমি হুবহু নকল পেন্টিং রেখেছ যাতে লোকে ধরতে না পারে। ছবির ল্যাব টেস্ট করলে ধরাও পড়বে সেই সত্য। সকলে থুতু দেবে মনীশের গায়ে। সকলের সামনে চোখের জল ফেলতে হবে। কিন্তু তার আগে প্যাট্রিক জফের বন্দোবস্ত করতে হবে। পকেট থেকে ফোনটা বের করল সুধীর।

॥ ৬ জুলাই : ডিনারের পরে ॥

"কিয়ারোসকিউরো," কফির কাপটা দু'হাতে চেপে ধরে বলল কুমু।

নীল দেখল হিরণ্য ছাড়া বাকিরা সকলেই হাসছে। সেমিনার হলের পাশের এই জায়গাটায় কয়েকটা কংক্রিটের স্ল্যাব এলোমেলোভাবে পড়ে রয়েছে। নীলরা সকলে সেখানেই বসে রয়েছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। হিমাচলের এই পাহাড়ি অঞ্চল এমনিতেই ঠান্ডা। আজ আবার বৃষ্টি হয়েছে, তাই ঠান্ডাটা ভালই পড়েছে। ক্যান্টিন থেকে রাতের খাবার সেরে এই ঠান্ডাটাই উপভোগ করতে সেমিনার হলের পাশে এসে বসেছে ওরা। একটু আগে ক্যান্টিনের একজন এসে এখানেই কফি দিয়ে গিয়েছে ওদের। এই ক'দিনেই নীলের সঙ্গে বেশ ভাল বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছে কুমু, প্যাট্রিক আর পূরবের। তবে হিরণ্য একটু আলগোছে থাকে। আজ কথা হচ্ছে ১৫ জুলাই রেমব্রান্টের আঁকা ছবির উন্মোচন নিয়ে। সেই আলোচনার জের টেনেই কুমু বলল, "কিয়ারোসকিউরো।"

নীল হাসল। কুমু কী ভেবেছে, ও এই শব্দের মানে জানে না? ও বলল, "প্যাট্রিক হয়তো ভাল বলতে পারবে এর মানে। ওর দেশের কথা থেকেই তো শব্দটা এসেছে।"

প্যাট্রিক বলল, "ঠিক। 'কিয়ারোসকিউরো' শব্দটি ইতালীয়। মানে, ক্লিয়ার-ডার্ক। বা আলো-ছায়াও বলা যেতে পারে। রেমব্রান্টের ছবিতে এর গুরুত্ব অপরিসীম। 'আলো'-কে ছবির চরিত্র করে তোলাটা রেমব্রান্টেরই

নৈপুণ্য। কী অসাধারণ তাঁর আলো-ছায়ার কেরামতি। যেন আমাদের জীবনের প্রতিফলন।”

পূরব বলল, “এই ছবিটাতেও সেই আলো-ছায়ার খেলা রয়েছে।”

“তোমরা দেখেছ?” নীল উৎসাহিত হল।

“হ্যাঁ, গোকুলস্যারের সঙ্গে আমাদের দরকার ছিল বলে ল্যাবে গিয়েছিলাম। জানোই তো, ওখানে ছবিটার উপর থেকে বহুকালের জমা ধুলো সরিয়ে তাকে রেস্টোর করা হচ্ছে। সেখানেই ছবিটাকে দেখলাম আমরা,” কুমুর গলায় তৃপ্তি। কফিটা শেষ করে একটু দূরে রাখা ট্র্যাশে ও টুপ করে ছুড়ে মারল কাপটা। নিখুঁত টিপ। ও বলল, “চার-পাঁচজন মিলে কাজ করছিল। তবে স্যার বেশিক্ষণ থাকতে দেননি।”

“লাকি পিপ্‌ল,” হাসল নীল, “আমি এখনও দেখতে পাইনি ছবিটা। আরে প্রোফেসর মিশ্রকে যখন ইন্টারভিউ করার সময় পাই, উনি হয় ওঁর চেম্বারে থাকেন, নয়তো লাইব্রেরিতে থাকেন। তবে রিকোয়েস্ট করেছিলাম ছবিটা দেখার। বললেন, সময়মতো দেখার সুযোগ পাবে। তোমরা সত্যিই লাকি।”

প্যাট্রিক বলল, “উনি যে সাবধান হবেন সেটা তো স্বাভাবিক। রেমব্রান্টের যে-কোনও ছবির দামই আকাশছোঁয়া। এটারও নিশ্চয়ই অনেক দাম হবে।”

“তবে দাম দিয়েই কি আর সবকিছুর মূল্যায়ন হয়?” হিরণ্য আচমকা বলল কথাটা।

“ঠিক। কিন্তু সেটা ক’জন বোঝে। পৃথিবীতে কিছু ধনকুবের আছে, যারা পারলে সব ছবি কিনে নিজেদের বাড়ির বৈঠকখানায় টাঙিয়ে রাখে। এতে যে কী লাভ হয়! সেখানে তো নিজে আর বাড়ির কাজের লোকজন ছাড়া বিশেষ কেউ দেখতেও পায় না,” কুমু দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

সেমিনার হলের বাইরের অল্প আলোয় নীল দেখল ঠান্ডা হাওয়ায় একটা ধোঁয়া পাক খেল কুমুর সামনে। ছুরি দিয়ে কেটে বের করা পাতলা নাকটা একটু লাল হয়ে আছে কি?

প্যাট্রিক হাসল, "এসব হল ইনভেস্টমেন্ট। ভবিষ্যতে টাকায় টান পড়লে সেগুলো বিক্রি করে তারা। তবে এই ছবিটা কিন্তু দারুণ। ছেলে টাইটাসের একটা ছবি, 'টাইটাস অ্যাট দ্য ডেস্ক', রটারডাম মিউজ়িয়ামে আছে। ৭৭ সেন্টিমিটার লম্বা, ৬৩ সেন্টিমিটার চওড়া। ১৬৫৫ সালে আঁকা। এখানের এই ছবিটা কিন্তু তারও কয়েক বছর পরের। বোধহয় ১৬৫৮ সালের। তবে মাপটা এক। টাইটাস এখানে উদাস হয়ে জানলার বাইরে তাকিয়ে রয়েছে। জানলা দিয়ে নিসর্গও দেখা যাচ্ছে। এমন একটা ছবি যে কীভাবে গোয়ায় এল! তবে একটাই বাঁচোয়া, ছবির রং এতদিনের ধুলোয় চাপা পড়েছে শুধু। আর কোনও সমস্যা নেই। রেস্টোরেশনের পর ফাটাফাটি দেখতে লাগবে।"

পূরব বলল, "সত্যি, রেমব্রান্টের ছবি দেখলে আমার সারা শরীরে কাঁটা দিয়ে ওঠে।"

"সে তুমি সজারু হতেই পারো! কিন্তু আর একদম এখানে বসে থাকা যাবে না। রেমব্রান্ট নিয়ে অনেক বাতেলা হয়েছে। এবার হস্টেলে যাও।" পিছন থেকে আচমকা তমোনাশের গলা পেয়ে চমকে গেল সকলে।

"কেন?" তমোনাশের রুক্ষ স্বরের পালটা জবাবে কুমুও রুক্ষ গলায় বলল।

"আমি বলছি তাই। ওঠো তোমরা!" তমোনাশ আরও এগিয়ে এল।

নীল বুঝল, কথায় কথা বাড়বে। ও বলল, "ঠিক আছে। আমরা যাচ্ছি।"

"শোনো, ফারদার এখানে কেউ ঘোরাঘুরি করবে না এই সময়ে," তমোনাশ কড়া গলায় বলল।

কুমু কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু পূরব বাধা দিল। বলল, "চল, লেটস গো ব্যাক।"

নীলদের উঠতে দেখে তমোনাশ আর দাঁড়াল না। কুমুর দিকে অভদ্রভাবে তাকিয়ে সেমিনার হলের সামনে দিয়ে মেন বিল্ডিং-এর দিকে এগিয়ে গেল।

কুমু বলল, "লোকটা ভীষণ রুড। সুযোগ পেলে এমন দেব না, বুঝবে! এই কৃষ্টির ক্যাম্পাস কি ওর বাপের? আমরা এখানে ওয়ার্কশপ অ্যাটেন্ড করতে এসেছি। আর একটা ন্যূনতম বয়সও হয়েছে আমাদের। ও কেন এমন ব্যবহার করবে? আই উইল কমপ্লেন এগেন্সট হিম।"

"ছাড় না," পূরব বলল।

এখান থেকে হস্টেলটা হেঁটে পাঁচ মিনিট। রাস্তার পাশে পাশে গাছ আর ঝিমধরা সোডিয়াম ভেপার লাগানো এক অদ্ভুত আলো-ছায়া তৈরি হয়েছে চারদিকে। আর এর মধ্যে ওই মেন বিল্ডিং-এ একটু-একটু করে জেগে উঠছে প্রায় সাড়ে তিনশো বছরের পুরনো এক ছবি। আলোর ছবি, অন্ধকারের ছবি। বাবার আঁকা তাঁর সন্তানের ছবি। চারদিক বড় নিস্তব্ধ মনে হল নীলের। তমোনাশ এসে সুর কেটে দিয়েছে আড্ডার। সকলে চুপচাপ হাঁটছে। নুড়ির উপর জুতোর শব্দ গড়িয়ে পড়ছে রাতের ঢাল বেয়ে। হঠাৎ প্যাট্রিক বলল, "এই রে, আমি মোবাইলটা ফেলে এসেছি ক্যান্টিনে।"

"ক্যান্টিনে?" হিরণ্য অবাক হল।

"তোমরা এগোও, আমি আসছি।" প্যাট্রিক ওদের কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে আবার ক্যান্টিনের দিকে চলে গেল।

"মোবাইল ফেলে এসেছে?" পূরব অবাক হয়ে তাকাল।

"চল," হস্টেলের দিকে এগোবার আগে নীল একবার পিছনে ফিরল। আর দেখল, হিরণ্য প্যাট্রিকের চলে যাওয়া পথের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রয়েছে।

॥ ৬ জুলাই : মধ্যরাতের পাহাড়ে ॥

সুচটা কাগজে মুড়ে ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জটার সঙ্গে কার্গো প্যান্টের হাঁটুর পাশের পকেটে ঢুকিয়ে রাখল সিজ়ার। অন্ধকারে মাটিতে শোয়ানো শরীরটার দিকে দেখল একবার। নিথর। মেরুদণ্ডের ঠিক জায়গায়

ইঞ্জেকশনটা দিয়েছে। মানুষ থেকে জড়পদার্থে পরিণত হয়েছে শরীরটা। ঘাড়ে আচমকা মেরে অজ্ঞান করে পাহাড়ের মাথায় শরীরটাকে বয়ে আনতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে সিজ়ারকে। কিন্তু ওভাবে আর নীচে নামতে হবে না। পা দিয়ে শরীরটাকে ধাক্কা দিল সিজ়ার। পাথর খসিয়ে ছোট ছোট গাছপালা ভেঙে শরীরটা তলিয়ে গেল খাদের অন্ধকারে।

॥ ৭ জুলাই : কফিশপে ॥

আজ মেঘ করে আছে খুব। উপত্যকা থমথম করছে। বৃষ্টি নামবে যে-কোনও সময়ে। কফিশপের জানলা দিয়ে দূরের পাহাড়গুলোকে অদ্ভুত মায়াময় লাগছে। মনে হচ্ছে, সত্যিই ওগুলো পাহাড় তো, নাকি মেঘ? এই থমথমে আকাশ যেন কৃষ্টির পরিবেশকেই রিফ্লেক্ট করছে। কী করে যে এমনটা হল, এখনও বুঝতে পারছে না নীল। গতকাল রাতে যখন মোবাইল আনতে প্যাট্রিক ক্যান্টিনের দিকে গিয়েছিল তখন কি বুঝতে পেরেছিল এমনটা ঘটবে? রাতে প্যাট্রিক ফিরেছিল কিনা, সেটা আর খোঁজ করেনি কেউ। সকালে কৃষ্টির ওয়ার্কশপে আসা কিছু ছেলেমেয়ে পাহাড়ের খাদে একটা বড় গাছের গোড়ায় প্যাট্রিকের শরীরটাকে আটকে থাকতে দেখেছিল! কৃষ্টির ক্যাম্পাসে খবরটা ছড়াতে সময় লাগেনি একদম। আধঘণ্টার মধ্যে অ্যাম্বুলেন্সে প্যাট্রিককে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে সিমলায়। শুনছে, এরপর দিল্লিতে পাঠানো হবে ওকে। প্যাট্রিককে অ্যাম্বুলেন্সে তোলার সময়ে দেখেছিল নীল। মাথার বাঁদিকটা থেঁতলে গিয়েছে। কলারবোন যেভাবে উঁচু হয়ে আছে, তাতে নিশ্চিত যে সেটা ভেঙেছে। এ ছাড়া পায়ের অবস্থাও শোচনীয়। কীভাবে এমন মারাত্মক জখম হল প্যাট্রিক? ও তো যাচ্ছিল ক্যান্টিনে! সেখান থেকে পাহাড়ে গেল কেন ও?

পুলিশ এসে ঘুরে গিয়েছে ক্যাম্পাস থেকে তবে তারা ঘটনাটা অ্যাক্সিডেন্ট বলেই প্রমাণ করতে চাইছে। কারণ, যদি কোনও ক্রিমিনাল কেস তৈরি

হয়, তা হলে জল অনেকদূর গড়াবে। প্যাট্রিকের দেশের হাইকমিশন ব্যাপারটা ছাড়বে না সহজে। তাই পুলিশ সেফ গেম খেলে বলে দিয়েছে, অ্যাক্সিডেন্ট। তবে তমোনাশ রয় কিন্তু ছাড়েনি। এখন সে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে ক্যাম্পাসে। তার বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে যে, এর পিছনে অন্য গল্প আছে।

"তমোনাশ তোমায় ধরেছিল?"

কুমুর প্রশ্নে মুখ ফেরাল নীল। সকাল থেকে নানা ঝড়-ঝাপটায় মেয়েটার মুখটা একটু শুকনো লাগছে। তবু কী অসাধারণ!

"কী হল? কী দেখছ? তমোনাশ ধরেছিল তোমায়?"

নীল হাসল। কুমু কি বুঝতে পেরেছে ওর মুগ্ধতা?

ও বলল, "না, এখনও ধরেনি। তবে ধরবে নিশ্চয়ই। এমন অবস্থায় ও কি আর ছড়ি ঘোরাবার সুযোগ ছাড়বে?"

"আমি কিন্তু একটা কথা ভাবছি," কুমু গম্ভীরমুখে বলল, "হিরণ্য কাল রাতে কোথায় ছিল?"

"কেন?"

"আমি আমার ঘরের জানলা দিয়ে একজনকে বেরোতে দেখেছি রাতে। হাঁটাচলা দেখে তো হিরণ্য বলেই মনে হল।"

নীল চিন্তিত মুখে বলল, "তুমি বললে বলে মনে পড়ল, হিরণ্য কাল অদ্ভুতভাবে তাকিয়েছিল প্যাট্রিকের যাওয়ার পথে। দৃষ্টিটায় এমন একটা কিছু ছিল যে..."

"ওই যে গোকুলস্যার," কুমু হঠাৎ নীলের কথার মাঝখানে বলে উঠল।

গোকুল মিশ্র কফি শপে ঢুকে কোনার একটা টেবিলে বসলেন। ওদের দেখেছেন বলে মনে হল না। নীল দেখল, মোটা চশমা পরা মানুষটা একটা জার্নাল খুললেন। সাদা তুলোর মতো চুল এলোমেলো হয়ে আছে। এত দূর থেকেও নিকোটিনের দাগধরা আঙুলগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

কুমু বলল, "একটা মজার কথা জানো?"

"কী?" নীল ভ্রূ তুলল।

"গোকুলস্যার নাকি ভীষণ কিপটে। ওঁর নাকি একটাই সুট, একজোড়া লেদার শু, আর একটাই চশমা আছে। দেখো না, রোজ কেমন ওই খয়েরি সুটটাই পরেন।"

"যাঃ," নীল হাসল।

"সত্যি বলছি। এত বড় মানুষ, এত টাকা রোজগার করেন, কিন্তু কিপটে! মজার কথা না? শুনেছি উনি এক টাকাকে নাকি এক হাজার টাকা হিসেবে দেখেন।"

"কে বলে এসব তোমাদের?"

"এই ব্যাপারটা সকলেই জানে। তোমার লেখায় কথাটা কাজে লাগতে পারে বলে ইনফরমেশনটা দিলাম।"

নীল কিছু বলতে গিয়েও থমকে গেল। তমোনাশ রয় ঢুকছে কফিশপে।

"তো এখানে বসে গপ্‌পো হচ্ছে?" এই মেঘলা দিনে, শপের ভিতরের মন্দ আলোতেও তমোনাশ সানগ্লাস পরে রয়েছে।

কুমু বলল, "মানে, কী বলতে চাইছেন?"

"ইউ পিপ্‌ল আর সো ইররেসপন্সিবল। কখন থেকে তোমাদের খুঁজছি জানো?" তমোনাশ প্রায় চিৎকার করে উঠল।

কুমু বলল, "কেন খুঁজছেন?"

"কাল রাতে তোমরা কোথায় ছিলে?"

"কেন?" নীল জিজ্ঞেস করল এবার।

"তোমরা কোথায় ছিলে বলো। প্যাট্রিক যখন তোমাদের ছেড়ে ক্যান্টিনের দিকে গেল তখন তোমরা কোথায় ছিলে?"

"কেন বলব?" কুমু উঠে দাঁড়াল, "এসব জিজ্ঞেস করছেন কেন?"

"প্যাট্রিকের এই অবস্থার পর..."

"মারা গেছে প্যাট্রিক? যায়নি। কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে?

তাও করেনি। পুলিশ বলছে অ্যাক্সিডেন্ট। সেখানে আপনি কে? কৃষ্টির সিকিয়োরিটি চিফ মানেই কিন্তু প্রশ্ন করার অথরিটি নেই আপনার। আমি কিচ্ছু বলব না। চল নীল," কুমু পার্স থেকে কফির দাম টেবিলে রেখে নীলের হাত ধরে টানল।

"এভাবে পার পাবে না তোমরা!" তমোনাশ গর্জন করল।

"চল নীল।" কুমু হেঁটে বেরিয়ে গেল দরজা দিয়ে। নীল হাঁটতে হাঁটতে দেখল সানগ্লাস খুলে হিংস্র চোখে তাকিয়ে রয়েছে তমোনাশ রয়।

॥ ১০ জুলাই : রেস্টোরেশনের পর ॥

মাথাটা সামান্য হেলিয়ে হাসল সুধীর। অনুপটা গাধাই রয়ে গিয়েছে। বলে কিনা, এখন যদি ১৫ জুলাইয়ের অনুষ্ঠান বাতিল হয়ে যায়! আরে প্যাট্রিক কি মারা গিয়েছে নাকি? ও এখন কোমায়। বেশি ইন্টারপোলগিরি ফলানোর ফল। সিজ়ার সত্যি শিল্পী। অপরাধ-শিল্পী। সকলের চোখ এড়িয়ে প্যাট্রিক যাচ্ছিল মনীশ উপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু সিজ়ারের হাজারটা চোখ, লক্ষ ইন্দ্রিয়! পাহাড়ের নীচের এক অন্ধকারে প্যাট্রিকের পিছনে অনেকটা মাটি ফুঁড়েই যেন উদয় হয়েছিল সিজ়ার। প্যাট্রিক বোঝার আগেই রবারের ব্যাটন নেমে এসেছিল প্যাট্রিকের মাথার পিছনে।

তারপর সংজ্ঞাহীন প্যাট্রিককে পাহাড়ের মাথায় বয়ে নিয়ে গিয়েছিল সে। লম্বা-চওড়া সিজ়ারের কাছে সেটা কোনও ব্যাপারই নয়। সেখানে মাটিতে উপুড় করে শুইয়ে মেরুদণ্ডের বিশেষ জায়গায় পুশ করেছিল ইঞ্জেকশন। কমপক্ষে দু'সপ্তাহের জন্য অসাড় হয়ে থাকবে প্যাট্রিক। তারপর ওকে গড়িয়ে দিয়েছিল পাহাড়ের ঢাল দিয়ে। কেউ তো আর পিঠে ইঞ্জেকশনের দাগ লক্ষ করবে না। সবটাই নিখুঁতভাবে অ্যাক্সিডেন্ট প্রমাণ করা যাবে। আর পুলিশও তেমন গুরুত্ব দিয়ে দ্যাখেনি ব্যাপারটাকে। শুধু ওই ব্যাটা

তমোনাশ রয়টাই বাড়াবাড়ি করছে। মনীশের হাত আছে যে ওর মাথার উপর!

হাত! ওটা আর ক'দিন পরে লজ্জায় নিজের মুখ ঢাকতে ব্যবহার করতে হবে মনীশ উপাধ্যায়কে। ওকে অপমান করা! প্রেসিডেন্টের চেয়ার কেড়ে নেওয়া! কোটি কোটি টাকার ওপর নিয়ন্ত্রণ!

দাঁড়াও, বের করছি। সুধীরের হাতে দুটো তাস আছে। একজন সিজ়ার আর অন্যজন সেই অদম্য সেন। সিজ়ার তার প্রথম কাজটা করেছে। এবার অদম্য সেনের পালা।

গাড়ির সিটে ছড়িয়ে বসল সুধীর। কৃষ্টির মেন গেট দিয়ে গাড়ি ঢুকছে। রেমব্রান্টের আঁকা ছবিটা থেকে কয়েক শতাব্দীর ধুলো সরে গিয়েছে। আজ কৃষ্টির বোর্ডের রুলিং ও অপোজ়িশন, দু'পক্ষকেই স্পেশ্যাল ইনভিটেশন পাঠিয়েছে মনীশ। ও দেখাতে চায় ওর কৃতিত্ব! রেমব্রান্টের এই ছবির উন্মোচনের জন্য পৃথিবীর অনেক মিউজ়িয়াম সম্পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করেছিল। কিন্তু তাদের কাছ থেকে এই সম্মান কেড়ে এনেছে মনীশ উপাধ্যায়। মনে মনে হাসল সুধীর। ১৫ তারিখ এই ছবিই হবে মনীশের নেমেসিস।

গাড়ি এসে থামল মেন বিল্ডিং-এর সামনে। গাড়ি থেকে নেমে সুধীর এগোল লিফ্‌টের দিকে। পিছনে অনুপ আসছে। লিফ্‌টে উঠে অনুপ আবার একই কথা বলল, "সুধীরভাই, যদি অনুষ্ঠান বাতিল হয়ে যায়? ইতালিয়ান ছেলেটার যা হল!"

"তুমি গাধা?" খেঁকিয়ে উঠল সুধীর। লিফ্‌টম্যানটা চমকে তাকাল। সুধীর বলল, "কিচ্ছু হবে না। অ্যাক্সিডেন্টের সঙ্গে প্রোগ্রাম বাতিলের সম্পর্ক কী?"

"না, মানে ওটা অ্যাক্সিডেন্টই তো?"

"না তো কী? পুলিশ তো বলেইছে যে, প্যাট্রিক জফ পাহাড় থেকে পা পিছলে পড়ে গিয়েছে।"

"অত রাতে পাহাড়ে কী করছিল ছেলেটা?"

সুধীর উত্তর দিল না। লিফ্‌ট এসে থেমেছে ছ'তলায়। এটাই গ্র্যান্ড ডিসপ্লে গ্যালারি। কৃষ্টির সবচেয়ে ভাল ছবিগুলো এখানে রাখা হয়। এই ঘরটার একদিকের দেওয়াল সম্পূর্ণ কাচের। দুপুরের আলোয় অদ্ভুত লাগছে চারদিক। এই হলের প্রবেশপথের সামনে মেটাল ডিটেক্টর ব্রিজ রাখা। পাশে দু'জন সিকিয়োরিটির সঙ্গে দরজা আগলাচ্ছে তমোনাশ রয়।

সুধীর আলতো করে অনুপের পিঠে হাত দিল। বলল, "যা হয়ে গিয়েছে, তা নিয়ে চিন্তা কোরো না। এত ভয় পাও কেন? একদম নার্ভাস হবে না। আমার প্ল্যান যেন গুবলেট না হয়।"

দরজার কাছে মোবাইল ফোন জমা নিচ্ছে তমোনাশ। সুধীর ফোনটা জমা দিয়ে সিকিয়োরিটি ব্রিজ পেরিয়ে এগিয়ে গেল। দরজার উলটোদিকে সেই বিখ্যাত ছবি। মেহগনি ফ্রেমের উপর স্ক্রু দিয়ে আঁটা প্লেক্সিগ্লাসের তলায় জ্বলজ্বল করছে টাইটাস। সুধীর কাছ থেকে দেখবে বলে এগোতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল। পিছনে অনুপের গলা শোনা যাচ্ছে।

তমোনাশের সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করছে অনুপ, "না, মোবাইল দেব না আমি। কেন, মোবাইল নিয়ে ভিতরে গেলে কী হবে?"

"প্লিজ় মিস্টার আইয়ার। যা নিয়ম তা মানতেই হবে। না হলে..." তমোনাশ গম্ভীরভাবে বলল।

"না হলে মানে? না হলে মানে কী? আমি ক্রিমিনাল? আমার দরকারি ফোন আসবে।"

"দেখুন, উপাধ্যায়স্যার বলেছেন, টপমোস্ট সিকিয়োরিটির জন্য নো মোবাইলস আর অ্যালাউড। মোবাইল না জমা রাখলে আপনাকে ঢুকতে দেব না।"

"উপাধ্যায়স্যার!" চিৎকারে ফেটে পড়ল অনুপ, "মাই ফুট। আই ওয়াক আউট ইন প্রোটেস্ট। দরকার নেই ছবি দেখে। গো টু হেল।" অনুপ লিফ্‌টের অপেক্ষা না করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। হাসি পেল সুধীরের। ব্যাপারটা প্ল্যানের মধ্যে ছিল না, কিন্তু গাধা অনুপটা সামান্য মোবাইল নিয়ে ঝঞ্ঝাট

করে মনীশের চেষ্টায় সামান্য হলেও কালি ঢেলে দিল। সকলের সামনে প্রমাণ করেছে যে, মনীশ বাড়াবাড়ি করছে। ও দেখল তমোনাশ মুখ লাল করে টয়লেটের দিকে চলে গেল।

কাচের দেওয়ালের কাছে সরে এল সুধীর। ওই মাঠের মধ্যে দিয়ে হেঁটে গাড়ির দিকে এগোচ্ছে অনুপ। হাঁটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে রাগ কমেনি। কানে মোবাইল ধরা রয়েছে অনুপের। দরকারি ফোনটা এল কি?

॥ ১০ জুলাই : একাকী ॥

পিঞ্চার যন্ত্রটা আমি সিয়েরা লিয়ঁর একজন অস্ত্র ব্যবসায়ীর থেকে কিনেছিলাম। কোনও ইলেকট্রিক্যাল ট্রান্সফর্মারকে এক মিনিটের জন্য ট্রিপ বা অকেজো করিয়ে দিতে এটা ব্যবহৃত হয়। এতদিন পরে এটা কাজে লাগবে আবার। আমি যন্ত্রটাকে টেবিলের উপর রাখলাম। আজ একটু আগে এস বি-র ফোন এসেছিল। ছবি গ্যালারিতে চলে এসেছে, এবার সেটা হটিয়ে তার জায়গায় নকল ছবি টাঙাবার সময় এসেছে। মাঝে আর কয়েকটা মাত্র দিন রয়েছে। এস বি বলেছে যে, ছবিটা সরানোমাত্র যেন ওকে আমি খবর দিই। তা হলে লোক মারফত সেটা আমার থেকে নিয়ে নেওয়ার বন্দোবস্ত করবে। আমি ভেবে দেখেছি, এস বি-র পাঠানো লোকটার সামনে কিছুক্ষণের জন্য ছদ্মবেশে গেলেও সমস্যা হবে না।

কিন্তু আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছে অন্য কথা। আমার মনে হচ্ছে, এস বি-র মাথায় অন্য কিছু ঘুরছে। মনে হচ্ছে, আমার সাবধানে থাকা উচিত। ক্যাম্পাসে প্যাট্রিক জফ বলে যে ছেলেটার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, তা মনে হচ্ছে দুর্ঘটনা নয়। ওই জায়গাটায় আমি গিয়েছিলাম একা। যে জুতোর ছাপ ওখানে ছিল, তা প্যাট্রিকের জুতোর ছাপ নয়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় ওর জুতোটা দেখেছিলাম। বরং পাহাড়ের মাথায় প্যাট্রিকের জুতোর কোনও ছাপই ছিল না। আমার মনে হয় অজ্ঞান করে ওকে পাহাড়ে তুলে

নিয়ে ধাক্কা মেরে নীচে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। না, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই, কিন্তু আমার ছ'নম্বর ইন্দ্রিয় ক্রমাগত সংকেত পাঠাচ্ছে আমায়। এস বি-র গলা সন্দেহজনক লাগছে আমার। কাজ শেষ না করলে টাকা দেবে না বলেছে, কিন্তু করলে দেবে তো?

আমি মন ঘোরাতে পিঞ্চারটাকে দেখলাম। এটাকে এক ফাঁকে গিয়ে এই ক্যাম্পাসের ট্রান্সফর্মার রুমে লাগিয়ে দিয়ে আসতে হবে। গ্র্যান্ড গ্যালারিতে ঢোকার জায়গাগুলোয় সব লেজ়ার লাগানো রয়েছে। এক মিনিটের জন্য কারেন্ট বন্ধ না করতে পারলে কিছুতেই ওই ঘরে ঢোকা যাবে না। কাজ শেষে বেরোবার সময়ও আরও একবার কারেন্ট বন্ধ করতে হবে। কতক্ষণ বন্ধ থাকবে, এক মিনিট? হ্যাঁ, তাই যথেষ্ট আমার পক্ষে। লেজ়ার অকেজো করতে পারলেই বাকিটা সহজ। এখন শুধু মনটাকে শান্ত করতে হবে। কাজের আগে মনসংযোগ জরুরি।

আজও ফাদার ফ্রান্সিসকে ফোন করেছিলাম। ফাদার জিজ্ঞেস করেছিলেন, "তুই কেন এমন অন্ধকারে থাকিস? সৎপথে রোজগার করতে পারিস না?"

"সৎপথে টাকা রোজগার করলে চারটে অরফ্যানেজে কনট্রিবিউট করা যায় না, ফাদার।"

"কিন্তু বাজে কাজ করে কতদিন চলবে?"

"যতদিনই চলুক, কিছু বাচ্চা তো বাঁচছে এই টাকায়। তা ছাড়া অসৎ কাজ হলেও এই কাজে মনের জোর লাগে।"

"না, সৎ হওয়ার জন্য মনের জোরের দরকার হয় বেশি। তোর বাবা এসব দেখলে কষ্ট পেতেন।"

ওয়ালেট থেকে ছবিটা বের করে বাইরে থেকে আসা অল্প আলোয় ধরলাম। আমার পাঁচ বছর বয়সের ছবি। ছবিতে আমি জানলা দিয়ে তাকিয়ে রয়েছি আনমনে। আচ্ছা, বাবা কখন তুলেছিল এই ছবিটা? ছবিতে বাবা নেই, কিন্তু তবুও কী জীবন্ত তার উপস্থিতি। বাবা এসব দেখলে কষ্ট পেত?

আমি বাইরে তাকালাম। মনকে দুর্বল হতে দেওয়া চলবে না। কাল-পরশুর মধ্যেই কাজ সারতে হবে আমায়। ১৩ জুলাইয়ের মধ্যে এই উপত্যকা ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হবে। আমি টেবিল থেকে পিঞ্চার আর রিমোটটা ব্যাগে ভরতেই, করিডরে কার যেন পায়ের শব্দ পেলাম।

॥ ১১ জুলাই : ছোট্ট ঘটনা ॥

"স্যারের কথা চিন্তা করলেই আমার এত এমব্যারাসড লাগছে না! কী করে যে চশমাটা ভেঙে গেল। ভিড়ের মাঝে ধাক্কাধাক্কিতে চশমাটা হাত থেকে পড়ে..." কথাটা শেষ না করে মাথা ঝাঁকাল পূরব।

নীল পিঠে হাত দিল ওর, "ছাড়ো, কিচ্ছু হবে না। তুমি তো জেনেবুঝে কিছু করোনি।"

পূরব নীলের দিকে ফিরল, "তুমি তো আমার পিছনে ছিলে, দেখলে কে ধাক্কা মারল আমায়?"

"ধাক্কা? না, আমি আমার নোটবই আর ক্যামেরা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম।" নীল ঠোঁট উলটাল।

কুমু বলল, "বাদ দাও। ওয়ার্কশপ শেষ হওয়ার পরে রোজই অমন ধাক্কাধাক্কি হয়। ঘরের একজ়িটটা এমন ছোট আর স্যারের টেবিলটাও দরজার কাছে। আর তা ছাড়া সামান্য চশমা তো।"

"না, মোটেই সামান্য নয়। স্যারের একটাই চশমা!" পূরব বলল।

"ও-ও," হাসল কুমু, "স্যারের মাইজ়ারলি নেচার তো। তা কে বলল একটা চশমা?"

"আরে গোকুলস্যারই বিড়বিড় করছিলেন, 'একটা চশমা, তাও ভাঙল, আবার বানাতে হবে।' ইস, স্যার কী ভাবলেন বলো তো?"

নীল পাহাড়ের দিকে তাকাল। আজ সকাল থেকে একটানা বৃষ্টি হয়ে চলেছে। নীল ওড়নার মতো ঝাপসা আলোয় ঢেকে আছে উপত্যকা। এমন

দিনে মনখারাপ হয়ে থাকে নীলের। ও বলল, "চলো আজ একসঙ্গে লাঞ্চ করি সকলে।"

"লাঞ্চ হবে না। আমায় একবার টাউনে যেতে হবে। তার আগে তমোনাশ রয়ও ডেকেছে। আমার ফিল-আপ করা ফর্মে নাকি বাড়ির ঠিকানা লিখতে ভুলে গিয়েছি। ইউ পিপ্‌ল এনজয় লাঞ্চ," পূরব ছাতা খুলে বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে গেল।

কুমু ক্যান্টিনের দিকে হাঁটতে হাঁটতে বলল, "এই তমোনাশ লোকটাকে দেখলেই মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। একটা নুইসেন্স। আরে, আমরা অন্য জায়গা থেকে ইনভিটেশন পেয়ে এখানে এসেছি মাত্র। উই আর নট ক্রিমিনালস। কিন্তু ব্যাটা এমন করছে— রাতে কোথায় ছিলে? প্যাট্রিক তোমায় শেষ কী বলেছিল? এই ফর্ম ভরো, ওখানে যাবে না— অল বুল শিট।"

নীল বলল, "আরে শুধু তোমাদের সঙ্গেই নয়। আমায় বলে, 'কী সাংবাদিকতা করো যে গাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়াও?' যেন ওর বাবার টাকায় তেল কিনি। সেদিন অনুপ আইয়ার বলে কৃষ্টির ম্যানেজমেন্টের একজনের সঙ্গে তো হাতাহাতির উপক্রম হয়েছিল ওর।"

"কবে?" কুমু গল্পের গন্ধ পেয়ে ওর দিকে তাকাল।

"ম্যানেজমেন্টের কয়েকজনের কাছে রেমব্রান্টের আঁকা ছবিটা দেখানোর অনুষ্ঠান ছিল! ম্যানেজমেন্টের বাইরের লোক বলতে ছিল গোকুলস্যার আর ওঁর বায়োগ্রাফার হিসেবে আমি। মোবাইল নিয়ে ঝঞ্ঝাট লেগেছিল অনুপ আর তমোনাশের। সে এক সিন!"

কুমু বলল, "এই লোকটাকে ইমিডিয়েটলি স্যাক করা উচিত।"

নীল হেসে কিছু বলতে গিয়েও পারল না। দেখল হিরণ্য এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। ওর মুখ-চোখ বরাবরের মতো এখনও সিরিয়াস।

"হাই হিরণ্য," কুমু হাসল।

হিরণ্য বলল, "পূরব কোথায়?"

"কেন? টাউনে যাবে বলল তো!" নীল অবাক হল।

"টাউনে?" হিরণ্য থমকে গেল এক মুহূর্ত, "আচ্ছা, ছেলেটাকে কেমন মনে হয় তোমার?"

"কেন? কী মনে হবে?" এবার কুমুর অবাক হওয়ার পালা।

"তুমি কি জানো, প্যাট্রিক যে রাতে আহত হল, সেই রাতে ও অনেকক্ষণ ঘরে ছিল না?"

"তোমায় কে বলল?" প্রশ্নটা করে নীল আড়চোখে কুমুকে দেখল। কুমু হিরণ্যর সম্বন্ধে কী বলেছে সেটা আর বলল না।

"আমি জানি," হিরণ্য বলল।

"ও আমার ঘরে এসেছিল, ওয়ার্কশপে আমার করা স্কেচগুলো দেখতে," কুমু বলল।

"অত রাতে?" হিরণ্য ভুরু কোঁচকাল।

"সো হোয়াট?" কুমু রেগে গেল।

"না, তা নয়। আমার মনে হয় হি ইজ় আ ফিশি গাই। জেনো, শুধু প্যাট্রিকের অ্যাক্সিডেন্টই নয় আরও কিছু অঘটন ঘটবে। আর ঘটবে খুব শিগগিরই। বি অন ইয়োর গার্ড," হিরণ্য আর কথা বলার সুযোগ না দিয়ে চলে গেল।

কুমু বলল, "কী সব ঘটছে বলো তো? আরও যে কীসব ঘটতে চলেছে? আমার ভয় করছে নীল।" নীল কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারল না। গলা শুকিয়ে গিয়েছে। বুকের ভিতর ফড়িং উড়ছে। কুমু কখন যেন পেঁচিয়ে ধরেছে ওর হাত!

॥ ১২ জুলাই : অপারেশন ॥

কাজটা খুব সোজা। গ্যালারির কাচের দেওয়ালের প্রায় পঁয়তাল্লিশ ফুট নীচ থেকে পাহাড়ের ঢালের মতো নেমে গিয়েছে একতলা অবধি।

একতলায় এই ঢালের মাঝে চৌকো করে কেটেই দরজা বানানো হয়েছে। এই ঢালু অংশটা কংক্রিটের তৈরি। তবে তার উপর মাটি ফেলে ঘাস বোনা হয়েছে। পাতাবাহার গাছ লাগিয়ে লেখা হয়েছে, কৃষ্টি আর্ট অ্যান্ড কালচারাল সোসাইটি। পাহাড়ের অনেক উঁচু থেকেও এই লেখা দেখা যায়। আমায় এই ঢাল বেয়ে উঠতে হবে তিনতলার কাছাকাছি উচ্চতায়। বাকিটা দেওয়ালের খাঁজে পা রেখে পৌঁছোতে হবে কাচের দেওয়ালে। স্টেনলেস স্টিলের পাত দিয়ে লাগানো আড়াই ফুট বাই তিন ফুটের এক-একটা কাচ। অটোম্যাটিক স্ক্রু-ড্রাইভার দিয়ে একটা কাচ খুলতে বড়জোর চল্লিশ সেকেন্ড। তারপর শুধু রিমোট দিয়ে পিঞ্চার অ্যাকটিভেট করে মিনিটখানেকের জন্য ক্যাম্পাসের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া। লেজ়ারও অফ হয়ে যাবে। সেই সুযোগে ভিতরে ঢুকে পড়তে হবে। রেমব্রান্টের ছবিটা স্ক্রু লাগানো প্লেক্সিগ্লাস থেকে বের করে পালটাতে লাগবে আরও পাঁচ মিনিট। তারপর কাচের দেওয়ালের কাছে এসে আবার পিঞ্চার, লোডশেডিং, লেজ়ার অফ। বাইরে বেরিয়ে কাচ লাগিয়ে দেওয়া। ক্লিন অ্যান্ড স্টার্চড। কেউ বুঝতে পারবে না।

আয়নায় একবার দেখে নিলাম নিজেকে। আপাদমস্তক ধূসর লাইক্রায় ঢেকে নিয়েছি শরীর। চোখে নাইট ভিশন গগল্‌স। লোডশেডিং-এ কাজে লাগবে। পিঠে ক্রস করে ঝুলিয়ে নিয়েছি রাইকারের এঁকে দেওয়া হুবহু নকল ছবিটা। এবার বেরিয়ে পড়তে হবে। পাহাড়ের একদম কোল ঘেঁষে এখানকার ইলেকট্রিক্যাল কন্ট্রোল জ়োন। ক্যাম্পাসটা এত বড় যে, যেতে সময় লাগবে। এই সময়ে দুটো গার্ড থাকে ওখানে। কিন্তু দুটোই কুঁড়ের হদ্দ, ঘুমোয়। ট্রান্সফরমারের নীচে ছোট্ট পিঞ্চারটা লাগাতে সমস্যা হবে না।

অন্ধকারের সঙ্গে মিশে এগোতে থাকলাম আমি। মাথার উপর ছড়িয়ে থাকা মেঘের আকাশ। দু'-চারটে তারা উঁকি মারছে সেই ফাটল দিয়ে। দুর্বল চাঁদ মেঘের ভিতরে ডুবে-ভেসে টিকে আছে কোনওমতে। আর তার অনেক নীচে, অন্ধকারের সঙ্গে মিশে এগোচ্ছি আমি।

আট মিনিটের মাথায় পাহাড়ের একপাশে কন্ট্রোল রুমে এসে পৌঁছোলাম। কাচের ঘরে একজন গার্ড যথারীতি ঘুমোচ্ছে আর অন্যজন নেই। কোথায় লোকটা? আমি তারের গেট টপকে ভিতরে ঢুকলাম। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে দ্রুত এগিয়ে গেলাম মিটার পঞ্চাশেক দূরের ট্রান্সফর্মার রুমের দিকে। দরজাটায় তালা। আমি মাস্টার কি বের করে তালা খুলতে যাব হঠাৎ পিছন থেকে আচমকা শুনলাম, "পুট ইয়োর হ্যান্ডস আপ..."

কে? শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল আমার। সেকেন্ডেরও ভগ্নাংশ সময়ের মধ্যে নিচু হয়ে গড়িয়ে গেলাম পাশের ঝোপে। আর গড়াতে গড়াতে শুনলাম, "...অ্যান্ড সে ওম শান্তি ওম।"

দ্বিতীয় গার্ড প্যান্টের বেল্ট বাঁধতে বাঁধতে জড়ানো গলায় থেমে থেমে গান গেয়ে ফিরছে। ক্লোজ় শেভ। লোকটা আদৌ স্বাভাবিক অবস্থায় আছে বলে মনে হল না। নিশ্চয়ই আমায় খেয়াল করেনি। গালি দিলাম নিজেকে। আরও সাবধান হতে হবে আমায়।

ইলেকট্রিক্যাল কন্ট্রোল জ়োন থেকে যখন বেরোলাম তখন মেঘ আরও ঘনিয়ে এসেছে আকাশে। ক্যাম্পাসের ভিতর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা আলোয় মনে হচ্ছে, এই বৃহৎ দৃশ্যপট যেন সেই ওলন্দাজ শিল্পীরই আঁকা। আমি সেই কিয়ারোসকিউরো ভেদ করে এগোতে লাগলাম। রেমব্রান্টকে পালটাতে হবে রাইকার দিয়ে।

"হ্যান্ডস আপ।" না, আর গান নয়। গলাটা শুনে থমকে গেলাম আমি। ধীরে ধীরে পিছন ফিরলাম। আরে, একে তো আমি চিনি। তবে একটা বাঁচোয়া, মুখোশ থাকায় ও আমায় চিনতে পারছে না। ও এগিয়ে এল আমার দিকে। হাতে পিস্তল। ও প্রশ্ন করল, "কে তুমি? কী করছ এত রাতে?"

আমি উত্তর না দিয়ে নিমেষে প্যান্টের পকেট থেকে লম্বা নলের মতো যন্ত্রটা বের করে সুইচ টিপলাম। পিং...। এটা মেকানিক্যাল ডার্ট। ট্রিগারে চাপ পড়ামাত্র একটা ইঞ্চিচারেক ফোল্ডিং তির গিয়ে লাগল ওর শরীরে।

ন্যানো সেকেন্ড। কাটা গাছের মতো পড়ে গেল। সংজ্ঞাহীন। আমি এগিয়ে গিয়ে তিরটা খুলে নিলাম শরীর থেকে। তুলে নিলাম পিস্তলটা। তারপর পড়ে থাকা পাথর তুললাম একটা। একে কয়েকদিনের জন্য অকেজো করে দেওয়া দরকার। পায়ের গোড়ালিটা কাঠ ফাটার মতো শব্দ করে ভাঙল। ও বুঝতেই পারল না। আমি এবার ওর মানিব্যাগ আর গলার সোনার চেনটা নিয়ে নিলাম। ডাকাতির কনফিউশন গুলে দিতে হবে ঘটনায়। তারপর ওকে গড়িয়ে দিলাম পাশে চওড়া ড্রেনের ভিতর। দেরি হল কিছুক্ষণ, কিন্তু তাও রাত বাকি আছে অনেকটা। কাজ পড়ে রয়েছে। একজন পুত্র জানলা দিয়ে তাকিয়ে রয়েছে বাইরের দিকে। বাইরে নিসর্গ, বাইরে মুক্তি। আমি বুকের কাছে হাত দিলাম। বাবা আছে আমার সঙ্গে। বাকিটুকুও থাকবে। গ্যালারির দিকের অন্ধকারে ধীরে ধীরে মিশে গেলাম আমি।

॥ ১৩ জুলাই : দীর্ঘতম রাত্রি—১ ॥

"আচ্ছা, পূরব এল না তো?" ঘোরলাগা গলায় জিজ্ঞেস করল হিরণ্য।

এই ঘরটায় আলো কমিয়ে রাখা হয়েছে। তার ভিতরেও নীল দেখল হিরণ্যের মুখে এক অদ্ভুত ক্লান্তি।

কুমু বলল, "বললাম তো ওকে আসতে, কিন্তু এল না!"

"যাক গে, বাদ দাও। হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ," হিরণ্য হাসার চেষ্টা করল।

"কী করে হল এসব?" নীল চুলের ভিতর হাত চালাল।

মাথা নিচু করে কয়েক মুহূর্ত ভাবল হিরণ্য, তারপর বলল, "ইটস নো পয়েন্ট হাইডিং এনিমোর। আয়্যাম আ প্রাইভেট এজেন্ট।"

"এজেন্ট? মানে? তুমিও এজেন্ট? প্যাট্রিকও এজেন্ট? গোকুল মিশ্র এজেন্ট নন তো?" উত্তেজিত হয়ে বলল কুমু।

"তোমরা সকলেই আমাদের বন্ধু সেজে এসে আমাদের উপর নজরদারি করছিলে। আর আমরা বোকার মতো তোমাদের বিশ্বাস করে..."

নীল কুমুর পিঠে হাত রেখে শান্ত করার চেষ্টা করল। বলল, "কাম ডাউন। এটা ওর কাজ, ও কী করবে?"

হিরণ্য বলল, "প্রসপেক্ট ইনশিয়োরেন্স রেমব্রান্টের ছবিটাকে ইনশিয়োর করেছে। যদিও মনীশ উপাধ্যায় বলেছেন যে, সিকিয়োরিটি টাইট, তবুও ওরা সিক্রেটলি আমায় এখানে পাঠিয়েছে। এই সদ্য-পাওয়া ছবিটার উপর অনেকের লোভ রয়েছে। এটাকে গার্ড করা ইম্পর্ট্যান্ট। কিন্তু..."

হিরণ্যকে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে দেখে নীল বলল, "কিন্তু তোমার এই হাল হল কীভাবে? পুলিশ যে বলল মাগিং, তা কি সত্যি?"

"আই ওয়াজ় নট মাগড। ইট ওয়াজ় আ কভার আপ অ্যাক্ট। চোরের লক্ষ্য ছিল ছবি। ইলেকট্রিক্যাল কন্ট্রোল রুম থেকে বেরোতে দেখেছিলাম ওকে। তারপর গ্যালারির দিকে এগোতে দেখে মাঝপথে ওকে ইন্টারসেপ্ট করি। প্রায় কবজাও করে ফেলেছিলাম। কিন্তু, একটা 'পিং' শব্দ শুনলাম আর তারপর এভরিথিং ওয়েন্ট ব্ল্যাক। জ্ঞান হল এই নার্সিংহোমে। দেখো না, পা ভেঙে দিয়ে আমায় অচল করে দিয়ে গেছে।"

"কিন্তু, ছবি তো চুরি হয়নি। তা তুমি চিনতে পেরেছিলে লোকটাকে?" কুমু জিজ্ঞেস করল।

"না। আর চিনব কী করে? আগাগোড়া গাঢ় রঙের পোশাক পরেছিল লোকটা। কিন্তু কেন চুরি করল না, তাই তো ভাবছি।"

নীল দেখল হিরণ্য হাঁপাচ্ছে। ডাক্তাররা বলেছে এমন একটা ড্রাগ ওর শরীরে ঢুকেছিল, যার ফলেই ঘোরলাগা ভাব। ওকে আর কথা বলানো ঠিক নয়। নীল উঠল। বলল, "আজ আমরা যাই, তুমি রেস্ট নাও।"

হিরণ্য মাথা নাড়ল, "আর রেস্ট। এবার চাকরিটা যাবে আমার। অসুস্থ মা-বাবার একমাত্র সম্বল আমি। কিন্তু..."

"আরে ছবি তো চুরি হয়নি। তুমি ভয় পাচ্ছ কেন?" কুমু সান্ত্বনা দিল।

"তা হলেও..."

"ধ্যাত, ছাড়ো ওসব। আমরা আসি," কুমু হেসে নীলের সঙ্গে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। করিডর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নীলের খারাপ লাগল। হিরণ্য চুপচাপ ছেলে, কিন্তু গোটা ঘটনায় এত বিব্রত হয়েছে যে, ব্যক্তিগত কথাবার্তাও বলে ফেলছে। ও বলল, "একটাই বাঁচোয়া, রেমব্রান্টের ছবিটা চুরি যায়নি, না? তবে পুলিশের উচিত সিকিয়োরিটি বাড়ানো। ক্যাম্পাসে ডাকাত ঢুকল কী করে?"

কুমু কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল।

নার্সিংহোমের রিসেপশনে তমোনাশ দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওদের দেখে এগিয়ে এল লোকটা, "তোমরা কাদের এজেন্ট?"

"মানে?" কুমুর নরম গলা নিমেষে কঠিন হয়ে উঠল।

"যে রেটে রোজ এজেন্ট বেরোচ্ছে। তা গতকাল রাতে তোমরা কোথায় ছিলে?" তমোনাশের স্বর রুক্ষ হয়ে উঠল।

নীল কিছু বলার আগে কুমু হাত ধরে টানল ওকে, "চলো, ফালতু প্রশ্নের জবাব দেব না।"

"বাট আই শুড নো," তমোনাশ কুমুর হাত ধরতে গেল।

"হাউ ডেয়ার ইউ টাচ মি? স্কাউন্ড্রেল! আমি তোমার বিরুদ্ধে চার্জ আনব।"

নীল দেখল অবস্থা হাতের বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে। ও কুমুকে ধরে নিয়ে বেরিয়ে এল রিসেপশনের বাইরে। সত্যি তমোনাশ খুব বাড়াবাড়ি করছে।

"তোমরা কি হিরুর বন্ধু?" দরজার কাছে প্রশ্নটা শুনে থমকাল নীল। একজন বৃদ্ধ মানুষ তাকিয়ে রয়েছেন ওদের দিকে।

"হ্যাঁ, আপনি?"

"হিরু আমার ছেলে। ও ভাল হয়ে উঠবে তো?"

নীল হাসল, "আপনি চিন্তা করবেন না। ও ভাল হয়ে যাবে। বিশেষ কিছুই হয়নি।"

"বলছ?" ভদ্রলোক সামান্য স্বস্তি পেলেন যেন।

কুমু বলল, "আঙ্কল ডোন্ট ওয়ারি। হিরণ্য উইল বি অল রাইট। আর ওর চাকরি নিয়েও চিন্তা করবেন না।"

"করছি না। আমার ছেলে ভাল হয়ে উঠলেই হল," ভদ্রলোক আবার ফিরে গেলেন নিজের জায়গায়।

টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে বাইরে। ছাতা খুলে নীল ধরল কুমুর মাথায়। দূরে ওর গাড়িটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। হিরণ্যর বাবার অসহায় মুখটা এখনও চোখে ভাসছে। নীল বলল, "তুমি ছাতাটা ধরো তো, আমি একবার আসছি।"

"কোথায় যাচ্ছ?" কুমু অবাক হল।

'হিরণ্যর বাবাকে একটা কথা বলা দরকার।"

নীল যখন ফিরে এল কুমু ততক্ষণে গাড়ির ভিতরে বসে পড়েছে। নীল ড্রাইভারের সিটে বসে বলল, "চলো, এবার তোমার জন্মদিনের কেক কাটি।"

কুমু হঠাৎ হাত রাখল নীলের হাতে। মৃদু গলায় বলল, "তুমি যে আজ আমার জন্মদিনের জন্য সিমলায় যাওয়া পিছিয়ে দিলে, তার জন্য থ্যাঙ্কস।"

নীলের গলার কাছে ছোট্ট একটা বেলুন ফুলল। গাড়ির নির্জনতায় সে নরম চোখে তাকাল কুমুর দিকে। কুমু আরও এগোল। আলতো করে হাত দিল নীলের মাথার পিছনে। টানল কাছে। নীলের গরম নিশ্বাসের সঙ্গে মিশে গেল কুমুর নিশ্বাস। ঠোঁটে মিশল ঠোঁট। বৃষ্টি আরও জোরে এল। আর ক্রমশ ঝাপসা হয়ে যেতে লাগল উপত্যকা।

"তাই? কখন? না না ওখানে নয়, ওই যে লাভার্স ব্রিজটা রয়েছে, তার উপর দিয়ে ওই দিকে গিয়ে ডানদিকের রাস্তা ধরবে। শোনো, গাড়ি নেবে না। গাড়িটা ব্রিজের এইদিকে, মানে ক্যাম্পাসের দিকে রাখবে। তারপর হেঁটে, যেখানে বললাম, সেখানে যাবে। আমার লোক থাকবে ওখানে। ওর হাতে জিনিস দিয়ে তোমার টাকা বুঝে নেবে। ঠিক আছে?" সুধীর চুপ করে ওপাশের উত্তরটা শুনল। তারপর আবার বলল, "মনে থাকে যেন, ছবিটা রোল করে ফায়ার অ্যান্ড এক্সপ্লোশন গ্রুপ কেসে নিয়ে আসবে। ছবির যেন কোনও ক্ষতি না হয়। নো রং মুভস। যদি এখান থেকে নিরাপদে বেরোতে চাও, তা হলে চালাকি করবে না। আমি এই জায়গাটাকে হাতের তালুর মতো চিনি। তোমায় না চিনলেও, আমার লোক মারফত ঠিক খুঁজে বের করব তোমায়। তারপর..." সুধীর হাসল শব্দ করে। তারপর কেটে দিল ফোনটা। কিন্তু রাখল না। আবার ডায়াল করল। কার সঙ্গে জানি কথা বলল লাভার্স ব্রিজের ওই পাড়ে নির্দিষ্ট জায়গায় যাওয়ার জন্য।

অনুপ বোতল থেকে হুইস্কি ঢেলে ড্রিঙ্ক বানাচ্ছিল। সুধীর সোফার ব্যাকরেস্টে মাথা রেখে কথা বলছিল এতক্ষণ। এবার কথা শেষ করে ফোনটা সোফায় ছুড়ে সোজা হয়ে বসল। মুখে হাসি উপচে পড়ছে।

অনুপ জিজ্ঞেস করল, "কী হল? এনি গুড নিউজ়?"

"এটাও বোঝো না? তুম গধে হো কেয়া? আরে কাজ হয়ে গিয়েছে। রেমব্রান্ট হাপিস। গ্যালারিতে যেটা ঝুলছে, সেটা ফেক। আমার লোক লাভার্স ব্রিজের ওই দিকে গিয়ে ছবিচোরের থেকে মাল তুলে আনবে।"

"তোমার লোক মানে?"

"সে আছে। সব জানতে হবে না তোমায়। তুমি শুধু দেখো কী হয়। পরশু বিকেলে যখন 'টাইটাস বাই দ্য উইন্ডো'-এর উদ্বোধন হবে আই

উইল চ্যালেঞ্জ দ্য অথেন্টিসিটি অব দ্য পিকচার। প্রথমে পরীক্ষা করে দেখা যাবে যে, ছবিটা ঠিক আছে, কিন্তু তারপর এক্স-রে করে ল্যাব টেস্ট করলে ধরা পড়বে যে ওটা খুব নিখুঁত একটা ফেক। আমি তখন দেখতে চাই মনীশ উপ্যাধ্যায়কে। আমি চোর? শালা, মনীশকে মাটিতে মিশিয়ে দেব আমি। বলব, ছবিটা হাপিস করেছে ও-ই। তারপর একটা ফেক ছবিকে অরিজিনাল বলে চালাতে চাইছে। আই উইল রুইন হিম! আমায় যেমন সকলের সামনে হিউমিলিয়েট করেছিল, আমিও তেমন সারা পৃথিবীর সামনে ওকে ছিঁড়ে খাব। দেখাব, কৃষ্টির প্রেসিডেন্ট পদ আসলে কার জন্য!"

অনুপ হুইস্কির গ্লাসটা এগিয়ে দিল সুধীরের দিকে। সুধীর তাতে লম্বা চুমুক দিল, "আঃ, আই লাইক দিস বিটারনেস। লেটস এনজয় মাই ভিকট্রি।"

অনুপ বলল, "ড্রিঙ্কটা কি একটু কড়া হয়েছে? সোডা দেব আর-একটু?"

"চুপ করো, কেন অপ্রাসঙ্গিক কথা বলছ!" সুধীর দ্বিতীয় চুমুকটা দিল। বাইরে কড়কড় শব্দে বজ্রপাত হল। সুধীর বেদীর বাড়িটা আজ খালি। কেউ নেই।

"ওঃ, এমন গরম লাগছে কেন?" সুধীর টাইয়ের নটটা আলগা করল। হুইস্কিতে তৃতীয় চুমুকটা দিয়ে বলল, "নেভার মাইন্ড, এ বোধহয় টাকার গরম। অরিজিনাল ছবিটার খদ্দের পেয়ে গিয়েছি আমি। মিলিয়নস অব ডলার কামাব। ডলার অ্যান্ড প্রেসিডেন্টস চেয়ার। তোমাকেও দেব টেন পার্সেন্ট। একেই বলে বুদ্ধি, বুঝেছ অনুপ? তোমার আছে?"

অনুপ এবার হাসল, "কনগ্র্যাচুলেশন ভাইয়া।"

"ইয়াঃ, আই ডিজার্ভ..." হঠাৎ যন্ত্রণায় বেঁকে গেল সুধীরের শরীর। হাতের থেকে হুইস্কির গ্লাস পড়ে গেল নীচের কার্পেটে। সুধীরের ঘাম হচ্ছে। যন্ত্রণায় মোচড়াচ্ছে শরীর। নাক দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে অল্প। টেবিলের উপর রাখা জলের বোতলের দিকে মরিয়াভাবে হাত বাড়াল ও। কিন্তু

বোতলটা পেল না। অনুপ সরিয়ে নিল নিমেষে। বলল, "ইউ ডিজ়ার্ভ টু ডাই। এখন বুঝলে কে গাধা?"

"কেন?" কোনওমতে শব্দটা বেরল সুধীরের মুখ দিয়ে।

অনুপ নিজের মোবাইল বের করে বলল, "আমি গাধা, আমি কিছু পারি না। তোমার ভিকট্রি! টেন পার্সেন্ট! মিলিয়নস অব ডলার। টাকার গরম! না, ওটা বিষের প্রতিক্রিয়া। রেমব্রান্ট তোমার নয়, আমার। আর তিন মিনিটের মধ্যে তুমি শেষ হবে। কিন্তু ততক্ষণে দেখো, আমি কীভাবে তোমার ছবি ওড়াই!"

অনুপ একটা নম্বর ডায়াল করে মোবাইলটা কানে নিল, "হ্যালো, পাখি ব্রিজের দিকে যাচ্ছে। ওকে ব্রিজের উপরেই থামিয়ে ওর পালক ছিঁড়ে নাও। তারপর কথা মতো জায়গায় পৌঁছোবে, বুঝলে? যেন ভুল না হয়। আর কাজটা সেরে ফোনে খবর দেবে আমায়, আমি অপেক্ষা করব," অনুপ ফোনটা কেটে সুধীরের দিকে তাকাল। আর... দুম! বারুদের তেতো গন্ধ। কে যেন লোহার শলাকা ঢুকিয়ে দিয়েছে অনুপের বুক ভেদ করে। সারা শরীর কাঁপছে। যন্ত্রণায় অবশ হয়ে আসছে মাথা। হাত থেকে মোবাইল পড়ে গেল ওর। বুকের বাঁ দিক থেকে রক্তের ধারা নামছে নীচে। চোখ ঝাপসা। তবুও তার মধ্যেই অনুপ দেখল সামনের সোফায় কাত হয়ে পড়া সুধীর বেদীর হাতের পিস্তল থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে।

"গাধা, তুই..." কথা শেষ করতে পারল না সুধীর, স্থির হয়ে গেল। অনুপ শেষবারের মতো চেষ্টা করল পাশে পড়ে থাকা ফোনটা তোলার। কিন্তু হাত পৌঁছোল না। শরীরে শূন্যতা। বজ্রপাত হল কোথাও? বিদ্যুৎ চমকাল? অনুপ আইয়ার ঢলে পড়ল কার্পেটে। বাইরে বৃষ্টি আরও জোরে এল। আর ক্রমশ ঝাপসা হয়ে যেতে লাগল উপত্যকা।

ব্রিজের মুখে গাড়িটা রেখে আমি নামলাম। আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছে উপত্যকায়। সময়ের চেয়ে কুড়ি মিনিট লেট হয়েছে। আসলে ছোট্ট কাজটা সেরে আসতে একটু সময় লেগেছে। বৃষ্টিতে সবকিছু আবছা হয়ে আছে। ব্রিজের নীচ দিয়ে বয়ে যাওয়া পাহাড়ি নদীর বুকে বেজে চলেছে বৃষ্টির শব্দ। মনে হচ্ছে, ঘষা কাচের ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছি আমি। দু'হাত দূরের জিনিসও স্পষ্ট নয়। আমি পিঠে ঝোলানো লম্বাটে কেসটা ঠিক করলাম। এটা বেশ ভারী। আগুন ও বিস্ফোরণ নিরোধক। ঠিক যেমন এস বি বলেছে। আমি ভুরুর উপর থেকে নেমে আসা জল মুছলাম। এরই মধ্যে সারা শরীর ভিজে গিয়েছে। ব্রিজটা বেশ লম্বা। দু'পাশে ইট দিয়ে তৈরি রেলিং আছে। তবে বাঁদিকের রেলিং-এর মাঝখানটা ভাঙা। এখান থেকেই নাকি দু'জন প্রেমিক-প্রেমিকা লাফ দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল। সেদিন থেকেই এই সেতুর নাম লাভার্স ব্রিজ।

আমি দ্রুত হাঁটতে শুরু করলাম। আজ এস বি-র গলায় এমন কিছু একটা ছিল যে, আমার ভিতরের অ্যান্টেনা বলছে, সামনে বিস্তর গন্ডগোল আছে। আমি যথাসাধ্য সাবধান হয়ে আছি, তবু বিপদ তৈরি করছে আবহাওয়া। এই মধ্য জুলাইয়ের বৃষ্টি। আমি একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম। না, পিছনে রাখা আমার গাড়িটা দেখা যাচ্ছে না একদম। ব্রিজটা যেন আজ বেশি লম্বা মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, কেউ যেন রবারের মতো টেনে লম্বা করে দিয়েছে পথ। এই পথের শেষে অপেক্ষা করছে একটা বাঁক। তার ওপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে এস বি-র লোক। সে কি টাকা নিয়ে এসেছে? নাকি...

"ইজ়ি ম্যান, ইজ়ি। হাত তুলে দাঁড়াও। না, নড়বে না। নইলে গুলি চালাতে হাত কাঁপবে না আমার।" বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে কথাটা ধারালো বরফের মতো এসে আঘাত করল আমায়। পিস্তলের হ্যামার টানার ধাতব শব্দটা ক্ষীণভাবে এল আমার কানে। আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। ব্রিজের পাশের

পোস্টে একটা দুর্বল বাল্‌ব জ্বলছে। তার পক্ষে এই বৃষ্টির চাদর ভেদ করা সম্ভব নয়। তবুও পিছনের মানুষটাকে দেখার জন্য হাত তোলা অবস্থাতেও ঘুরলাম আমি। প্রথমে মনে হল শূন্যের মধ্যেই একটা বন্দুক ধরা হাত তাক করে রয়েছে আমার দিকে। তারপর ক্রমশ গোটা মানুষটার অবয়ব নজরে এল আমার। কালো রেনকোট পরে রয়েছে মানুষটা। মাথাটা রেনকোটের হুড দিয়ে ঢাকা থাকায় মুখ দেখা যাচ্ছে না। গলার স্বর শুনে বুঝলাম, মানুষটা আওয়াজ বদলে কথা বলছে।

"পিঠের ওইটা খুলে মাটিতে নামিয়ে রাখো," আবার নির্দেশ এল।

আমি জানি আমার প্যান্টের ডানদিকে পকেটে মেকানিকাল ডার্টটা রয়েছে। এটা একবার বের করতে পারলে...

"না না, হাত সামনে রাখো। প্যান্টের পকেট থেকে কিছু বের করার চেষ্টা করলেই গুলি চালাব।"

আমি হাতটা সামনে তুলে হঠাৎ শব্দ করে হেসে উঠলাম, "আমায় তুমি মারতেই পারবে না।"

"কেন?"

"তুমি আর যেই হও খুনি নও।" আড়চোখে দেখলাম লাভার্স ব্রিজের ভাঙা পাঁচিল আমার দশ পায়ের মধ্যে। আমি খুব ধীরে সাইড স্টেপ করে সেদিকে এগোতে লাগলাম।

"এটা তোমার ভুল ধারণা। আমি ঠিক গুলি চালিয়ে দেব। কী ভেবেছ ছদ্মবেশে আছ বলে কি চিনতে পারব না তোমায়? কেসটা তাড়াতাড়ি খুলে মাটিতে নামিয়ে রাখো।"

আর পাঁচ পা। কিন্তু আমি নিরুপায়। পিঠ থেকে কেসটা খুলতে খুলতে আমি আরও তিন পা সরে গেলাম রেলিং-এর ভাঙা অংশের দিকে।

"নামাও। মাটিতে নামাও ওটা।" মানুষটা এবার এগিয়ে আসছে আমার দিকে। রেনকোটের হুডটা কপালের অনেকখানি নীচে অবধি নামানো। কে এই লোকটা? হাঁটা দেখে চেনা মনে হচ্ছে। আমি আরও

সরে গেলাম রেলিং-এর ভাঙা অংশের দিকে। নীচে বৃষ্টি বুকে নিয়ে ছুটে চলেছে নদী।

"দাও", লোকটার গলা এবার হিংস্র। আমি আচমকা লাফিয়ে রেলিং-এর উপর উঠে হাতের লম্বা কেসটা বাড়িয়ে ধরলাম নদীর উপর। বললাম, "নাও চালাও গুলি, আমি নদীতে ফেলে দেব এটা।"

"না!" চিৎকার করে উঠল লোকটা, "কুকুর, তোকে কুকুরের মতো গুলি করে মারব। দে, হাতের ওটা দে।" লোকটা এগিয়ে এসে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার উপর। টাল সামলাতে না পেরে আমি পড়ে গেলাম। আমার অর্ধেক শরীর ঝুলে রইল ভাঙা রেলিং-এর নীচে। লোকটা প্রায় ঝুঁকে পড়ে এক হাতে বিপজ্জনকভাবে বন্দুক দোলাচ্ছে আমার দিকে। আর অন্য হাতে লম্বা কেসটা টানছে। ধস্তাধস্তিতে খুলে পড়েছে আমার নকল চুল। মুখের নকল চামড়া। কিন্তু কে এই মানুষটা? বৃষ্টি, অল্প আলো আর ধস্তাধস্তিতে বুঝতে পারছি না ঠিক। তবে এভাবে চললে আমি পড়ে যাব এবার। মৃত্যু নিশ্চিত। আমি আচমকা পা গুটিয়ে লাথি চালালাম। ভোঁতা শব্দ করে লোকটা গড়িয়ে গেল পাশে। আমি সেই সুযোগে উঠতে যাব, কিন্তু তার আগেই লোকটা বন্দুক তাক করল আবার। হিসহিসে গলায় বলল, "এবার মর।"

আমি স্থির হয়ে গেলাম। লোকটার মাথার আবরণ খসে গিয়েছে। চাঁ-রঙা আলোর আবছা দ্যুতি এসে পড়ছে ওর মুখে। আর সেই আলোয় আমি চিনতে পারলাম মানুষটাকে।

"তমোনাশ রয়!" আমি আপনা থেকেই বললাম।

"হ্যাঁ, আমি। এবার দে ওটা, নইলে..."

"না..." আর একটা শব্দ, সঙ্গে পায়ের আওয়াজ। বৃষ্টির ভিতর এসে উপস্থিত হয়েছে আর একজন। তমোনাশ থমকাল। আর আমার দমবন্ধ হয়ে এল। এই গলার স্বরটা আমার চেনা।

"প্লিজ়, ওকে মারবেন না," বৃষ্টির চাদর ভেদ করে এগিয়ে এল কুমু।

তমোনাশ বিভ্রান্ত গলায় বলল, "দে, দে কেসটা, না হলে এবার..." আমি ওই বিভ্রান্তিটুকুর জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। আচমকা মোচড় মেরে উঠে আমি তমোনাশের হাত ধরে টান মারলাম। ও টাল সামলাতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়ল আমার উপর। হাতের বন্দুকটা কানফাটা শব্দে গুলি ওগরালেও, ওর হাত থেকে ছিটকে ভাঙা রেলিং দিয়ে পড়ে গেল নীচের নদীতে। আমি তমোনাশকে জাপটে ধরে হাতের কেসটা ছুড়ে দিয়ে বললাম, "কুমু, এটা নিয়ে পালাও।"

কুমুদ্বতী উড়ন্ত কেসটাকে মুঠো বন্দি করল। আমি আবার বললাম, "পালাও, তমোনাশকে আমি ধরে রেখেছি।"

কুমু কেসটাকে পিঠে ঝুলিয়ে বলল, "সরি নীল, তমোনাশকে ছেড়ে দাও।"

আমার হাত আলগা হয়ে খসে পড়ল তমোনাশের শরীর থেকে। দেখলাম কুমু পিস্তল তাক করে রয়েছে আমার দিকে।

তমোনাশ উঠে দাঁড়িয়ে লাথি মারল আমায়। ভোঁতা বুট এসে আছড়ে পড়ল পেটে। আমি যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গেলাম। শুনলাম কুমু বলছে, "ওভার কনফিডেন্স খুব খারাপ। তোমায় প্রথমে আমি সন্দেহ করিনি। কিন্তু পূরবকে ধাক্কা মেরে যেই গোকুল মিশ্রর চশমা ভাঙলে, অমনই সন্দেহ হল আমার। আর সেটা গাঢ় হল, যখন তুমি পূরবকে বললে কে ধাক্কা মেরেছে সেটা তুমি দ্যাখোনি। ছবি পালটে দিলে সেটা যে, গোকুল মিশ্রর ধরে ফেলার এক পার্সেন্ট চান্স আছে সেটাও তুমি রাখতে চাওনি, না? গোকুল মিশ্রর কিপটেমির সুযোগ নিয়েছিলে তুমি। তারপর গতকাল রাতেও তুমি যে বেরিয়েছিলে তা আমি দেখেছি। আজ সন্ধেবেলা হিরণ্যকে দেখতে গিয়ে তুমি চাদরে ঢেকে রাখা বাঁ পায়ের দিকেই তাকিয়েছিলে। আজ সারাদিন তো তুমি হিরণ্যকে দ্যাখোইনি, তা হলে জানলে কী করে কোন পা-টা ওর ভেঙেছে। ওভার কনফিডেন্স তোমায় শেষ করল নীলাম্বর।"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "কিন্তু তমোনাশের সঙ্গে তোমার..."

"ডিকয়," কুমু হাসল, "ঝগড়া তো? দ্যাখো তো কেমন বোকা বনলে তোমরা। এখন এই রেমব্রান্ট আমাদের, বুঝেছ?"

আমি অবাক হয়ে কিছু বলার আগেই আচমকা তমোনাশ ধাক্কা মারল আমায়। এবার আমি টাল সামলাতে পারলাম না। রেলিং-এ ঠোক্কর খেয়ে পড়ে গেলাম। এক হাত দিয়ে পাঁচিল ধরার চেষ্টা করলেও তমোনাশ লাথি মারল হাতে। ব্রিজের নীচে পাহাড়ের ঢাল দিয়ে গড়িয়ে পড়ার সময় শুনলাম কুমু বলছে, "গুডবাই।"

ডিগবাজি খেয়ে পা-টা যখন পাথরে লাগল মনে হল বোমা ফাটল বোধহয়। তবে ধাক্কার ফলে পড়ার গতি কমল আর আমি ব্রিজের গায়ে গজিয়ে ওঠা একটা বুনো লতা কোনওমতে ধরে ঝুলে পড়লাম। আমার শরীরের ধাক্কায় দুটো বড় পাথর নীচের নদীতে 'ঝুপ' শব্দে পড়ল। ব্রিজের নীচে ঝুলে রইলাম আমি। পায়ে অসহ্য যন্ত্রণা। হাতের জোরই এখন আমার সম্বল। বৃষ্টির হিজিবিজি শব্দের মাঝে তমোনাশের গলা পেলাম, "আপদটা গেল তা হলে। কুমু ছাতাটা খুলে ফোনটা বের করো। খবরটা দিতে হবে।" আমি দেখতে না পেলেও বুঝলাম কুমু ছাতা খুলল। মোবাইল বের করে কানে লাগাল। এবার কুমুর গলা শোনা গেল, "মিস্টার আইয়ারের ফোনটায় রিং-ই হয়ে যাচ্ছে। কেউ ধরছে না।"

"ধরছে না? অনুপস্যার তো এমন করেন না। উনি তো বললেন, আমাদের কলের জন্য অপেক্ষা করবেন। এখন ফোন ধরছেন না কেন?"

কুমু বলল, "স্ট্রেঞ্জ! কিন্তু এখানে থাকাও তো ঠিক নয়। আর ক্যাম্পাসে ফিরতেও না করেছেন আইয়ার। চলো, টাউনের দিকে যাই। ওখান থেকে না হয় চেষ্টা করব আবার।"

তমোনাশ জিজ্ঞেস করল, "কিন্তু যাবে কীসে?"

"কেন?" নীলের গাড়ি ব্রিজের মুখে রাখা আছে তো! গাড়িটাতে উঠে অনেক প্রেমের অভিনয় করেছি। এবার এটাকে অন্য কাজে লাগানো যাক।"

তমোনাশ বলল, "লেটস গো ডার্লিং।"

আমি ঝুলে রইলাম ব্রিজের নীচে। পা-টার যন্ত্রণা এবার ছড়িয়ে পড়ছে শরীরে। মাথাও অসাড় হয়ে আসছে। নীচে বয়ে চলেছে নদী। হাত ফসকালে মৃত্যু নিশ্চিত। আমি জোর করে মাথাটা পরিষ্কার রাখতে চেষ্টা করলাম। কুমু! শেষ পর্যন্ত কুমু। আমি কি অন্ধ? প্রেমে পড়েছিলাম কি? এটা বুঝতে পারিনি তো! আমি শুনলাম, গাড়ির শব্দ হল। আমার প্রিয় গাড়ি নিয়ে যাচ্ছে ওরা। নিয়ে গেল। সামান্য কেঁপে উঠল ব্রিজ। গাড়িটা বৃষ্টির শব্দ নস্যাৎ করে পাহাড় কাঁপিয়ে চলে গেল টাউনের দিকে। আমি সর্বশক্তি দিয়ে লতা বেয়ে উপরে ওঠার চেষ্টা করলাম। একবার, দু'বার, তিনবার। নাঃ, হাত ফসকাচ্ছে, তবু চেষ্টা ছাড়লাম না। উঠতে আমায় হবেই।

এদিকে বৃষ্টি আরও জোরে এল। ক্রমশ ঝাপসা হয়ে যেতে লাগল উপত্যকা।

॥ ১৩ জুলাই : দীর্ঘতম রাত্রি-৪ ॥

বাঁকের মুখে গাড়ির হেডলাইটটা দেখতে পেল সিজ়ার। এ সময় তো কৃষ্টির দিক থেকে কোনো গাড়ি আসার কথা নয়। তা হলে কি হেঁটে আসছে না লোকটা? গাড়ি করে পালানোর চেষ্টা করছে? কিন্তু ওকে যে ফোনে বলা হয়েছিল লোকটা হেঁটে আসবে। কিন্তু এ তো পালাচ্ছে! আর পালানোর চেষ্টা করলে কী করতে হবে সেটা তো ও জানে। লম্বা ছবি রাখার কেসটা তো আগুন ও বিস্ফোরণ নিরোধক।

ঝাপসা বৃষ্টির ভিতর এগিয়ে আসছে গাড়ি। উজ্জ্বল হেডলাইট চিরে দিচ্ছে অন্ধকার। সিজ়ার চোয়াল শক্ত করল। মানুষ মারতে ভাল লাগে না ওর। কিন্তু ও নিরুপায়। পাশে প্লাস্টিকের আবরণ সরিয়ে আরপিজি-৭ বের করল ও। এই রকেট প্রপেলড গ্রেনেড। বর্তমান বিশ্বে ভীষণ কার্যকরী

এক ক্ষেপণাস্ত্র। টিপ করে ট্রিগার টিপলেই হল। লম্বাটে ছুঁচলো মুখের গ্রেনেড গিয়ে আঘাত করবে লক্ষ্যে।

গাড়িটা ভীষণ জোরে এগিয়ে আসছে। জায়গাটার একপাশে পাহাড় হলেও অন্য পাশে ঢালু বিস্তীর্ণ উপত্যকা। সিজ়ার পাহাড়ের খাঁজে দাঁড়িয়ে আরপিজি-৭ তুলে তার নাইট ভিশন ভিউ ফাইন্ডারে চোখ রাখল। কালো কাচে ঢাকা গাড়ি। ছোট্ট, কিন্তু খরগোশের মতো ক্ষিপ্র। গতি দেখে নিশ্চিত হল, লোকটা পালাচ্ছে। সিজ়ার ট্রিগারে হাত দিল। বৃষ্টি হয়েই চলেছে। তাই ঝাপসা দৃশ্যের ভেতর নিশানা ঠিক রাখার জন্য গাড়িটাকে আরও একটু কাছে আসতে দিল ও। ডানদিকে বাঁক নিল গাড়িটা। দূরত্ব এবার ১০০ মিটার। কালো কাচে ঢাকা গাড়িটা গতি কমাচ্ছে না। না, আর নয়, এবার সময় হয়েছে। ট্রিগারটা টিপে পাথরের আড়ালে বসে পড়ল সিজ়ার।

বিস্ফোরণের প্রতিধ্বনিতে কেঁপে উঠল পাহাড়। গাড়িটা দোতলা বাড়ির সমান ছিটকে উঠে গড়িয়ে গেল ঢালু জমিতে। আগুনের বল পাকিয়ে উঠল আকাশে।

কিছুক্ষণ পরে সিজ়ার হাতে টর্চ নিয়ে বৃষ্টি ভেদ করে এগিয়ে গেল ঢালু জমির দিকে। হাতের টর্চ ঘুরিয়ে খুঁজল কিছু। তবে বেশিক্ষণ খুঁজতে হল না। পাথরের খাঁজে ওই তো পড়ে রয়েছে কালো হয়ে যাওয়া লম্বাটে কেসটা। সিজ়ার হাসল। কেসটা তুলে ও গুঁজে নিল পিঠের ব্যাগে।

তারপর এগিয়ে গেল দূরে অন্ধকারে দাঁড় করানো মোটরবাইকের দিকে। আজ সিজ়ার নিশ্চিন্ত। জব ওয়েল ডান। ও নিশ্চিত, সুধীর বেদী খুশি হবে খুব।

॥ ১৫ জুলাই : টাইটাস ॥

শেষ বিকেলের আলোয় গোলাপি হয়ে আছে উপত্যকা। তার ভিতরে কৃষ্টি আর্ট অ্যান্ড কালচারাল সোসাইটির ক্যাম্পাস আজ সেজে উঠেছে।

কারণ, আজ ১৫ জুলাই। রেমব্রান্ট হারমেনসজুন ভন রাইনের চারশোতম জন্মদিন। কৃষ্টির ক্যাম্পাসে আজ ছোটখাটো মেলা বসেছে। দেশি-বিদেশি নানা মানুষের ভিড় সেখানে। রাস্তা দিয়ে আরও মানুষ আসছে। গতরাতের বৃষ্টির পর আজ আবহাওয়া শুকনো। সন্ধের দিকে ভিড় আরও বাড়বে, বলল কফিশপের মালিক। নীল ঘড়ি দেখল। ছবির উন্মোচন হবে সন্ধে সাতটায়। তার আগে আছে ছোটখাটো কিছু অনুষ্ঠান। সেন্ট্রাল থেকে মিনিস্টারও এসেছেন। সিকিয়োরিটির ভীষণ কড়াকড়ি। তার মধ্যে দুটো এমন ঘটনা ঘটে গিয়েছে।

নীল কফির কাপে চুমুক দিল। তমোনাশ আর কুমুদ্বতী যদি ওকে ব্রিজ থেকে ফেলে না দিত, তা হলে এই মিষ্টি ঠান্ডার ভিতর বসে ওকে আর কফি খেতে হত না। ওর সেই গাড়ি করেই তো পালিয়েছিল দু'জন। বিস্ফোরণের পর কত দূরে পড়েছিল ওদের দেহ? পুলিশের কথা অনুযায়ী পোড়া মাংসের টুকরো পাওয়া গিয়েছে কিছু। আর গাড়িটাও প্লাস্টিকের বোতলের মতো তুবড়ে গিয়েছে। গাড়িটার জন্য একটু মনখারাপ হচ্ছে নীলের। কালো কাচ লাগানো গাড়িটা খুবই সুন্দর ছিল। তবে ওর জীবনটা তো বেঁচেছে! এস বি ছবি নেওয়ার নাম করে মৃত্যু ফাঁদ পেতেছিল ওর জন্য। তাই ছবিটা আগুন ও বিস্ফোরণরোধী কেসে ভরে আনতে বলেছিল। কিন্তু মৃত্যু এখনও দূরে। বিপজ্জনকভাবে বেঁচে থাকলেও, বেঁচে আছে ও।

এর মধ্যে আবার কৃষ্টির ম্যানেজিং কমেটির দুই সদস্য মারা গিয়েছে। সুধীর বেদীর বাড়িতে তার নিজের লাশের সঙ্গে পাওয়া গেছে অনুপ আইয়ারের লাশও। অনুপ আইয়ারের সঙ্গে তমোনাশকে কথা বলতে শুনেছিল নীল। আর অনুপের সঙ্গেই তো পাওয়া গিয়েছে সুধীর বেদীকে। সুধীর বেদী। এস বি?

তবে এই পরপর দুটো ঘটনার পুলিশ ভীষণভাবে নড়েচড়ে বসেছে। সেন্ট্রাল থেকে ইনভেস্টিগেশন টিমও এসেছে। চারদিকে বিপুল নিরাপত্তা আর চেকিং চলছে। তবু কৃষ্টির অনুষ্ঠান বাতিল হয়নি। ছবি উদ্বোধন

পিছোনো সম্ভব নয়। রেমব্রান্টের চারশো বছর উপলক্ষে তাঁর আঁকা পুত্র টাইটাসের অজানা ছবি মানুষের সামনে আনার এ এক অনন্য সুযোগ। নীল জানে, মনীশ উপাধ্যায় এই সুযোগ ছাড়বে না। এমন ছবি এক শতাব্দীতে বার বার খুঁজে পাওয়া যায় না। ছবি। হাসল নীল। কোন ছবি দেখবে মানুষ? চারশো বছর উপলক্ষে কার ছবি প্রদর্শিত হচ্ছে? রেমব্রান্টের না রাইকারের? ফাদার ফ্রান্সিস বলেন, "মানুষকে বিশ্বাস করো। তার উপর আস্থা রাখো।" কিন্তু জীবন অন্যরকম শিখিয়েছে নীলকে। শিখিয়েছে, স্বার্থের জন্য মানুষ সবকিছু করতে পারে। তাই এস বি-কে বিশ্বাস করেনি ও। নীল জানত এস বি ওকে ঠকাবেই। তাই দ্বিতীয় একটা ছবি নিয়ে এসেছিল ও। না, কুমুকে সন্দেহ করেনি ও। কুমুর প্রতি তো দুর্বল হয়ে পড়েছিল নীল। ওই মুখের দিকে তাকালে তো সব হিসেব উলট-পালট হয়ে যেত। আর তাই অসাবধানও হয়েছিল। যার খেসারত দিতে গিয়ে প্রায় প্রাণটাই চলে যাচ্ছিল। তবে একটা ভুল করেছিল কুমু। ভুল করেছিল তমোনাশ। সুধীর বেদী। সকলে।

কফিশপের দরজার ঘণ্টিটা নড়ে উঠল। তার শব্দে মুখ তুলল নীল। বাঁ পায়ের প্লাস্টার নিয়েও উঠে দাঁড়াল ও।

"তোমাকে তো চেনাই যাচ্ছে না। ভাগ্যিস বলেছিলে বাঁ পায়ে প্লাস্টার আছে। এটা না দেখলে তো বুঝতেই পারতাম না। দারুণ ছদ্মবেশ নিয়েছ তো। তা, এই নাও তোমার জিনিস।"

ব্রাউন পেপারে মোড়া লম্বাটে জিনিসটা ধরল নীল। বলল, "ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বরটা? টাকাটা ট্রান্সফার করতে হবে তো।"

"টাকা? দাও।" গলায় খুশি ঝরে পড়ল।

নীল ল্যাপটপটা খুলে ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইটে ঢুকল। কয়েকটা ক্লিক করে ঘুরিয়ে দিল ল্যাপটপ। বলল, "প্লিজ়, টাইপ ইয়োর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নাম্বার।"

"ইয়েস।" খটখট শব্দে নম্বর টাইপ হয়ে গেল। নীল এন্টার টিপে বলল, "টাকা চলে গেল। ইট ইজ় অল ইয়োর্স।"

"আমি আসি। বেস্ট অব লাক। তবে সাবধান, বাইরে পুলিশ থিকথিক করছে।"

আবার দরজা খোলায় টুংটাং শব্দে নড়ে উঠল ঘন্টিটা। কফিশপের চারদিকে চোখ বোলাল নীল। না, কেউ নেই। ও সাবধানে ব্রাউন পেপারের র‍্যাপারটা খুলল। তারপর মেলে ধরল সামনে। ৭৭ × ৬৩ সেন্টিমিটারে ধরে রাখা হয়েছে এক পিতার স্নেহ। নিজের সন্তানের ছবি তিনি এঁকে রেখেছেন পরম মমতায়। ছবির উপর আলতো করে আঙুল বোলাল নীল। ভাবল, একদিন এখানেও আঙুল ছুঁইয়েছিলেন সেই গম পেষাই কলের মালিকের ছেলেটিও।

নীল মুখ তুলল। কফিশপের কাচের জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে তাঁকে। ভিড়ের ভিতর ঈষৎ ঝুঁকে তিনি হাঁটছেন। তিনি না থাকলে, তিনি সঙ্গে করে না আনলে, এই ছবি পৌঁছোত না ওর কাছে। এ ছবি ওই পাহারার ভিতর থেকে বের করতে পারত না নীল যদি না তিনি সাহায্য করতেন। ওই চলে যাচ্ছেন তিনি। তিনি, গোকুল মিশ্র।

অ্যামস্টারডাম থেকে ছবি নিয়ে সোজা এই কৃষ্টিতে চলে এসেছিল নীল। প্রৌঢ়ের ছদ্মবেশে ঘুরে দেখেছিল কৃষ্টির ক্যাম্পাস। ঘুরে দেখেছিল আশেপাশের পাহাড়, কৃষ্টির ইলেকট্রিক্যাল জ়োন আর গ্র্যান্ড গ্যালারি। এইখানেই যে রেমব্রান্টকে টাঙানো হবে। সেই সময়েই গ্র্যান্ড গ্যালারি দেখে ও বুঝেছিল একে ভেদ করা সম্ভব নয়। তার উপর ওই লেজ়ার বিম দিয়ে ব্লক করা কাচের দেওয়াল। এ দুর্ভেদ্য। তখনই ওর মাথায় আইডিয়াটা আসে। গোকুল মিশ্রর জীবনী লিখবে বলে ও অ্যাপ্রোচ করে প্রোফেসরকে। বলে, এর জন্য পাবলিশার টাকাও দেবে। টাকা, গোকুল মিশ্রর একমাত্র দুর্বলতা। রাজি হয়ে যান প্রোফেসর। এক লাখ টাকা আগেভাগেই ধরিয়ে দেয় নীল।

এদিকে ছবি বদলের সময় এগিয়ে আসছিল। নীল বুঝতে পারছিল, গোকুল মিশ্রকে বলার সময় হয়েছে। কিন্তু সংশয়ও ছিল। প্রোফেসর যদি রাজি না হন?

প্রস্তাব শুনে একটুও অবাক হননি গোকুল মিশ্র। মিটিমিটি হেসে বলেছিলেন, "এক কোটি টাকা দিলে কাজ হয়ে যাবে।"

"দেব," পালটা হেসেছিল নীল, "তবে ছবি পাওয়ার পর।"

"কিন্তু ছবিটা পালটাব কী করে? ছবির সঙ্গে আমি তো একা হতেই পারি না। চারদিকে গার্ড থাকে।"

"তার দায়িত্ব আমার।" নীল শান্ত গলায় বলেছিল, "সকলের সামনেই আপনি ছবিটা বদলে দেবেন। কিন্তু কেউ আপনাকে ধরতে পারবে না।"

ডিকয়। যা করব না, তা করার ভান। তাতেই ভুলেছিল হিরণ্য, কুমু, এমনকী এসবি-ও। একটা জিনিস নীল লাগিয়েছিল ট্রান্সফরমার রুমে, তবে তা পিঞ্জার নয় মোটেই। যদি কেউ পিছু নেয়, তাকে ভুল পথে চালিত করার জন্যই এটা করেছিল নীল। ও জানত, হিরণ্যের মুখ দিয়ে ছবি চুরির ঘটনাটা ছড়াবেই। কিন্তু ও তো ছবি চুরির চেষ্টাই করেনি। হিরণ্যকে আহত করে গ্র্যান্ড গ্যালারির ধারে পাশেও যায়নি সে রাতে। ওর লক্ষ্য ছিল ছবি চুরির ব্যাপারে হিরণ্যকে কনভিন্স করানো। ওর উপর হামলায় হিরণ্য কনভিন্সড হয়েছিল। তাই সহজ হয়েছিল কাজটা। নার্সিংহোমে দেখতে যাওয়ার সেই রাতে কাজটা আরও সহজ করে দিয়েছিল হিরণ্যর বাবা। কুমুকে গাড়িতে বসতে বলে ও ফিরে গিয়েছিল বৃদ্ধের কাছে। বলেছিল, "ছেলের চাকরির চিন্তা করবেন না। আপনাকে আর কিছু পরে একটা জিনিস দিয়ে যাব আমি। হিরণ্যকে দিয়ে দেবেন। ওর ভাল হবে।"

এস বি-র সঙ্গে কথা বলে বেরোনোর সময় নার্সিংহোমে গিয়েছিল নীল। রাইকারের আঁকা প্রথম হুবহু নকল ছবিটা যত্ন করে গুটিয়ে একটা চিঠির সঙ্গে দিয়েছিল বৃদ্ধকে। বলেছিল, "এটা সাবধানে পৌঁছে দেবেন হিরণ্যকে।" চিঠিতে ও লিখেছিল—

"হিরণ্য,

ছবিটা চুরি করলেও এখন বুঝেছি অন্যায় হয়েছে। তাই ফেরত দিলাম। তবে খুব সাবধানে এই জিনিসটা নিয়ে যাবে গোকুলস্যারের কাছে।

জানাজানি হলে কৃষ্টির সঙ্গে তোমারও বদনাম হবে। গোকুলস্যারকে বোলো, মনীশ উপাধ্যায়কেও বোলো। ওরা আমার বদলে দেওয়া নকল ছবিটা খুলে তার জায়গায় লাগিয়ে দেবে এই আসল ছবিকে। তুমি বাঁচবে, কৃষ্টি বাঁচবে, দেশের সম্মানও বাঁচবে। পারলে আমায় ক্ষমা কোরো।

ইতি—

তোমার বন্ধু।”

বন্ধু! কে কার বন্ধু? হিরণ্য হাতে স্বর্গ পেয়েছিল নিশ্চয়ই। চুপিচুপি ছবিটা নিয়ে গিয়েছিল গোকুল মিশ্র ও মনীশ উপাধ্যায়ের কাছে। সকলের সামনে আসল ছবিটা খুলে রাইকারের আঁকা হুবহু এক দেখতে নকল ছবিটা লাগিয়েছিলেন গোকুল মিশ্র। আর আসলটা বাতিল করে রেখে দিয়েছিলেন নিজের কাছে। যেটা এখন নীলের হাতে। আর রাইকারের আঁকা দ্বিতীয় নকল ছবিটা এস বি-র লোককে পৌঁছে দিতে গিয়ে তাই নিয়ে মারামারি করে কতজনই না মারা গেল! ভাগ্যিস দ্বিতীয় ছবিটা বুদ্ধি করে আঁকিয়ে রেখেছিল ও। নীল হাতের লাঠিতে ভর করে উঠল। প্লাস্টার করা বাঁ পা-টা টেনে টেনে দাঁড়াল বাইরে এসে। ওই দূরে কৃষ্টি দেখা যাচ্ছে। সূর্যাস্তের শেষ আলোয় চকচক করছে ছ'তলার কাচের দেওয়াল। তার ভিতরে নানা মানুষ জড়ো হচ্ছে। একটু পরে মাননীয় মন্ত্রী উদ্বোধন করবেন ছবির। ছবির রেস্টোরেশনের জন্য বাহবা কুড়োবেন গোকুল মিশ্র, প্রদর্শনীর জন্য প্রশংসা পাবেন মনীশ উপাধ্যায়।

আর নীল? না অদম্য সেন? নাকি অ্যাডাম। আসলে কে ও? কী ওর নাম? পরিচয়ই বা কী? ও কেউ নয়। ও অদৃশ্য মানুষ। এই ছবি নিয়ে এবার ওকে উড়ে যেতে হবে ফিজি। সেখানে একজন অনেক অনেক টাকা নিয়ে অপেক্ষা করছে। টাকা। অর্থ। চারটে অনাথাশ্রমকে ফান্ডিং করতে হয় ওকে। ক্ষুধার্ত শিশুরা ছবি বোঝে না, শিল্প বোঝে না। কেবল বাঁচার লড়াই বোঝে। ছোটবেলায় বাবার কাছে শোনা রবিনহুড ছিল ওর প্রিয় চরিত্র। ফাদার ফ্রান্সিস বলেন, “রবিনহুড হওয়ার চেষ্টা করিস না।”

ও চেষ্টা করেও না। শুধু বাবার কথা মনে রাখে। বুকের কাছে রেখে দেয় বাবার তোলা জানলার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা ওর ছবি। টাইটাসের ছবি।

ও হাতের দিকে তাকাল, কোথায় যেন রেমব্রান্ট আর ওর সামান্য বাবা, এক। না, বাবা যতদিন আছে ওর সঙ্গে, ও একা নয়। কৃষ্টির দিকে এগোনো মানুষের ভিড় ভেঙে উলটোদিকে হাঁটতে লাগল ও। মনে পড়ল বাবার শেষ কথা, "তুই, একা হবি না কোনওদিন, জানবি আমি আছি তোর সঙ্গে।"

ও গুনগুন করে গাইতে লাগল,

Walk on, walk on, with hope in your heart.
And you'll never walk alone
You'll never walk alone...

টোপ

কলিং বেলের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল গর্ডনের। মাথাটা টনটন করছে। গতরাতে অনেক দেরিতে ঘুমিয়েছিল। আজ এখন চোখ খুলেই বুঝল, শরীর আরও ঘুম চায়। শরীর তার সমস্ত আঙুল দিয়ে আঁকড়ে ধরতে চায় বিছানাকে। আরও কিছুক্ষণ মিশে থাকতে চায় ঘুমের সঙ্গে। কিন্তু সে উপায় কি আছে? বেল যখন বেজেছে, দরজা তো খুলতেই হবে।

বিছানায় বসে মাথার কাছে রাখা ডোনাল্ড ডাকের মুখ আঁকা টি-শার্টটা গলিয়ে নিল গর্ডন। এমন টি-শার্ট ওর অনেকগুলো রয়েছে। প্রাগের একটা মেলার থেকে কেনা। সবক'টা একই ডোনাল্ডের ছবি, শুধু নাগরা জুতোর মতো ঠোঁটের রংটা এক-একটা টি-শার্টে এক-এক রকম। আজ হলুদ ঠোঁটের ডোনাল্ড পরেছে ও।

ডিজিট্যাল দেওয়াল ঘড়িতে এখন সাতটা বেয়াল্লিশ। এমন সকালে কে এল? খবর কাগজওলা আর দুধওলা তো দরজার কাছে কাগজ আর দুধ নামিয়ে রেখে যায়। ওরা তো বেল বাজায় না! গতকালও এমন সময় বেল বেজেছিল, আজও বাজল। লেট রাইজ়ার হিসেবে গর্ডনের নাম আছে পরিচিত মহলে। এই পৌনে আটটার সকাল তো ওর কাছে ভোর। মানুষজন কি রোজ এমন সময়েই আসবে? কেউ কি ওকে ঘুমোতে দেবে না?

এই পাড়াটা খুব নির্জন। তাই এখানে ছোট্ট বাড়িটা নিয়েছে গর্ডন। এই

সকালে চারিদিক এতটা নিস্তব্ধ হয়ে আছে যে, মনে হচ্ছে বন্ধুর সেই পাহাড়তলির নির্জন কটেজেই রয়েছে যেন!

হলঘর পেরিয়ে বাইরের আই হোলে চোখ রাখল গর্ডন। ও, এ তো পরিচিত মানুষ। মনটা ভাল হয়ে গেল গর্ডনের। হাত দিয়ে এলোমেলো চুলটা ঠিক করে মুখে হাসি নিয়ে দরজা খুলল ও, "গুড মর্নিং। প্লিজ় কাম ইন। হঠাৎ এত সকালে?"

দরজার বাইরের মানুষটি হাসল শুধু। তারপর আচমকা কোটের পকেট থেকে সাইলেন্সর লাগানো পিস্তল বের করে গর্ডনের বুক লক্ষ্য করে ট্রিগার টিপল। ফট ফট শব্দ হল দুটো। গরম লোহা শরীরের ভিতর গিয়ে পাক মারল। মাংস, মেদ আর হাড় জড়িয়ে গেল একে অপরের সঙ্গে। তীব্র যন্ত্রণা নিমেষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল শরীরে। দৃশ্য ঝাপসা হয়ে গেল একদম। কিছু বোঝার আগেই গর্ডন লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। ডোনাল্ড ডাকের মাথা ফুটো করে ঢুকে যাওয়া গুলির পথ ধরে রক্তের দাগ লম্বা হয়ে নেমে এল মাটিতে।

দরজার সামনে পড়ে থাকা নিস্পন্দ দেহটাকে দেখে পাখি-ভাষায় উত্তেজনা প্রকাশ করল বাইরের বাগানে এসে বসা বসন্তের দুটো ছোট্ট সোয়ালো।

দশ দিন পর: ভারতবর্ষের কোনও এক জায়গায়

"বসন্তে ফুলের চাষ না করে এরা পপির চাষ করে কী করে?" চিফ ভুরু কুঁচকে মাটির দিকে তাকালেন। লোকটা যে দিলীপকুমারের অন্ধ ভক্ত, এই ভঙ্গি দেখলেই বোঝা যায়। গর্গ ঠোঁট টিপে হাসি চাপল অনেক কষ্টে। চিফ মাঝে মাঝে একটু নাটুকে হয়ে যান।

চিফ বললেন, "চিন্তা করতে পারো চেতন, ইউনাইটেড নেশনসের রিপোর্ট বলছে যে, সারা পৃথিবীতে নাকি ড্রাগ ট্রেডের পরিমাণ বছরে

চারশো বিলিয়ন ডলার! আর এর বেশিরভাগটাই টেররিজ়মকে প্রোমোট আর সাপোর্ট করতে খরচ করতে হয়। তুমি বুঝতে পারছ পৃথিবী কোনদিকে যাচ্ছে?” চিফ এবার রাজেন্দ্রকুমার।

চেতন গর্গ টেব্‌ল থেকে আর-একটা কাগজ তুলে নিলেন হাতে। দ্য অফিস অফ ন্যাশনাল ড্রাগ কন্ট্রোল পলিসির বিজ্ঞাপন এটা। বলা হচ্ছে যে, যারা ড্রাগস কিনছে, তারা এই দুনিয়াজোড়া সন্ত্রাসে অর্থ দিয়ে সাহায্য করছে। অবশ্য এমন অনেক কিছুই গর্গের মুখস্থ আছে। ও জানে যে, এই ড্রাগ সারা পৃথিবীতে প্রায় দেড় কোটি মানুষের কাছে পৌঁছোয়, যার ভিতর এক লক্ষ মানুষ প্রতি বছর মারা যায়। আজকের মিটিং-এ এইসব নিয়েই কথা হয়েছে। তবু মিটিং ভেঙে যাওয়ার পর চিফ গর্গকে বসিয়ে রেখেছেন। ও জানে, চিফ যতই নাটক করে যান না কেন ড্রাগ নিয়ে চিফ যা বলতে চান, সেই ব্যাপারটা সিরিয়াস। ওদের এই হাইলি ক্লাসিফায়েড সংস্থাটির একদম ইনার সার্কেলে বসে রোজ টেররিজ়ম আর ড্রাগসের নেক্সাসের চাপ বুঝতে পারে গর্গ। ভারতবর্ষের মতো একটা দেশ যে কীভাবে দক্ষিণ এশিয়ায় টিকে আছে, তা ভাবলেই গায়ে কাঁটা দেয় ওর। এর চারিদিকে এত শত্রু! তারা যেন-তেন প্রকারে দেশটাকে কামড়ে, আঁচড়ে, ছিঁড়ে ফেলতে চায়। আর এ ব্যাপারে ড্রাগস মাফিয়াদের টাকা প্রত্যক্ষভাবে ইন্ধন জোগায়। তবু দেশটাকে সঙ্ঘবদ্ধভাবে টিকিয়ে রাখার জন্যই গর্গরা নিরন্তর চেষ্টা করে। অ্যান্টি-টেররিজ়মের বিরুদ্ধে ভারতের লজিস্টিকের মেরুদণ্ড হল গর্গদের সংস্থা আর সেই সূত্রে ড্রাগসের থেকে আসা স্পনসরশিপ বন্ধ করাও ওদের কাজের মধ্যে পড়ে।

চিফ বললেন, “তুমি তো জানোই, গত দশ দিন আগে আমাদের ‘মোল’কে মেরে ফেলা হয়েছে। ফলে আমরা কিন্তু অনেকটাই রাডারলেস জাহাজের মতো হয়ে পড়েছি। নেক্সট দু’সপ্তাহের ভিতর বারো হাজার টন ড্রাগস, প্রধানত হেরোইনের একটা ডিল হতে যাচ্ছে। আমাদের এই সাউথ-ইস্ট এশিয়ার সবচেয়ে কুখ্যাত ড্রাগ চোরাচালানকারী সংস্থা সান

কার্টেল পরের তিন বছরে মোট বারো হাজার টন হেরোইন হ্যান্ডেল করবে।

বুঝতে পারছ, এর থেকে এরা কী পরিমাণ মানুষ মারবে? টেররিজ়মকে ফান্ডিং করে এরা সামনের তিন বছরে একটা বিরাট পরিবর্তন আনতে চাইছে এই অঞ্চলে। 'মোল'-এর থেকে এই খবরটা পাওয়ার পর দিনই 'মোল'-কে মেরে ফেলা হয়। কিন্তু তা হলে তো আমাদের থেমে থাকলে চলবে না। না?

"ইয়েস স্যর," গর্গ মাথা নাড়ল।

'মোল' অর্থাৎ গর্গদের হয়ে কাজ করা একজন গুপ্তচর। সে সান কার্টেলের ভিতরের খবর গর্গদের পৌঁছে দিত। বোধহয় কার্টেলের লোকরা বুঝে গিয়েছিল যে, এ লোকটা ভারত সরকারের গুপ্তচর! তাই তাকে খুন করা হয়েছে। ইংল্যান্ডের স্যরের একটা বাড়িতে দশদিন আগের এক সকালবেলা খুব কাছ থেকে গুলি করা হয়েছিল লোকটাকে। ইনস্ট্যান্ট ডেথ। পুলিশ এসে তদন্ত, পোস্টমর্টেম ইত্যাদি করলেও ধরতে পারেনি। আর লোকটার ক্রিমিনাল রেকর্ড ছিল বলেই বোধহয় পুলিশ অত গা করেনি। এটা গর্গদের কাছে একটা খুব বড় ধাক্কা।

চিফ বললেন, "প্ল্যান 'এ' তো অসম্পূর্ণ রয়ে গেল। তা তোমার প্ল্যান 'বি' বলে কি কিছু আছে? একজন মারা গিয়েছে বলে তো আর আমাদের থামলে হবে না। শুধু তো ড্রাগস সিজ় করা নয়। বরং সেই সূত্রে ড্রাগসের থেকে আসা স্পনসরশিপ বন্ধ করাও আমাদের কাজের মধ্যে পড়ে। ঠিকভাবে বললে ওটাই আমাদের প্রায়োরিটি। মনে রেখো আমারও বাপ রয়েছে, তারা তো আমায় শান্তিতে ঘুমোতেও দিচ্ছে না!

"স্যর, আমরা তো জানি যে পরমজিৎ অরোরা, পুরুষোত্তম স্বামী আর নবীন সুদ হল সান কার্টেলের তিন মাথা। তো এদের ধরলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়," গর্গ চিফের দিকে সহজ সমাধান দিয়ে তাকাল।

"তোমার মাথা", চিফ এমনভাবে বললেন যেন গর্গের 'ওটি' নেই, "শোনো, সব জানলেও প্রমাণ কিছু করতে পারবে? এরা সমাজের কাছে সবাই সম্মানীয় ব্যবসায়ী। বেশিরভাগ সময়ই এরা বিদেশে থাকে। তুমি যদি এঁদের ধরো, নানান কেষ্ট-বিষ্টুরা তাদের পেশি ফুলিয়ে এদের ছাড়াবার জন্য নেমে পড়বে। আর তুমিই কিচ্ছু প্রমাণ করতে পারবে না। ফলে এদের ধরার প্রশ্ন নেই। জাস্ট এলিমিনেট দেম। একসঙ্গে সব মাথারা কাটা গেলে, গোটা কার্টেল থতমত খেয়ে যাবে। আর ওই বারো হাজার টনের ডিলটাও পিছিয়ে যাবে। আমরাও সময় পেয়ে যাব এই কনফিউশনের মধ্যে ওদের ঘিরে ফেলতে। বুঝেছ?"

"স্যর, এটা আমিও ভেবেছিলাম। আর আপনি যখন বলছেন তখন এটাই আমাদের প্ল্যান 'বি' হোক," গর্গ ঠোঁট কামড়াল।

চিফ চশমা খুলে তাকালেন, "গুড, দেন ডিপ্লয় ইয়োর মেন। কাজটা এখুনিই শুরু করতে হবে।"

গর্গ জানে এসব অ্যাসাসিনেশনের কাজ ঠিক নিয়মকানুনের মধ্যে পড়ে না। কিন্তু যুদ্ধে জিততে হলে কে কবে রুল বুক ফলো করেছে? তবে গর্গরা নিজেরা এইসব কাজ করে না। এই জন্যই 'মোল টু' কার্টেলের ভিতরে তৈরি করেই রেখেছিল গর্গ। তবে 'মোল টু' এতদিন ঘুমন্ত ছিল, কারণ কীভাবে তা ব্যবহার করা হবে সে বিষয়ে ঠিক ধারণা ছিল না। কিন্তু এবার তাকে জাগাবার সময় হয়েছে। চিফের প্ল্যান অনুযায়ী তাকে কাজে লাগাবার সময় হয়েছে।

গর্গ মোবাইলটা বের করে একটা নম্বর ডায়াল করল। আর ভারতবর্ষের সীমানার বাইরে, বহুদূরে ইয়োরোপের ছোট্ট একটা দেশে ইলেকট্রনিক সিগন্যাল পেয়ে কোকিলের মতো শিস দিয়ে জেগে উঠল আর একটা মোবাইল। বোঝা গেল হানাহানির ভিতরেও বসন্ত সত্যিই আগত!

ফোনটা বন্ধ করে জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল রুপিন। জানলার বাইরে বিরাট পাহাড়টা দেখা যাচ্ছে। সবুজ চাদরে ঢাকা একটা পাহাড়। তার পায়ের কাছে নানা রঙের ফুল ফুটে রয়েছে। শান্ত মাঠ ছড়িয়ে রয়েছে চারিদিকে। তার পাশে এই ছোট্ট কাঠের বাড়িটা কেমন যেন দেশলাই বক্সের মতো লাগে দূর থেকে। মনে হয় কেউ যেন অযত্নে ফেলে দিয়ে গিয়েছে। কেন যে অ্যাডাম এতদূরে এমন একটা নির্জন বাড়িতে থাকে! ওকে খুঁজে পেলে তো ওরা খুব সহজে মেরে দেবে। এর আগেও তো চারবার মারার চেষ্টা করেছে। তবু...

রুপিন সামনে বসা অ্যাডামের দিকে তাকাল। খুবই অল্প বয়স। দোহারা চেহারা। দেখতেও খুব সাধারণ। কিন্তু ভিতরের আগুনটা অ্যাডামের চোখ দুটো দেখলে বোঝা যায়।

"বলো, হঠাৎ এভাবে এলে কেন?" অ্যাডাম অন্যমনস্ক গলায় জিজ্ঞেস করল।

"চারবার, চার-চার বার তোকে ওরা মারার চেষ্টা করল কিন্তু..."

"ওরা তো বলছে যে ওরা চেষ্টা করেনি অন্য কেউ করেছে।"

"তুই বিশ্বাস করছিস?" রুপিন উত্তেজিত হল সামান্য, "তুই কার্টেল ছাড়ার সময় ওরা তোকে বলেনি যে, সান কার্টেল ছাড়লে তাকে এই পৃথিবী ছাড়তে হবে? তারপর মিলান, প্রাগ, ব্রাসেলস আর মাদ্রিদ, চারবার তোর ওপর অ্যাটেম্পট হল। আর তুই... দেখলি তো তোর বন্ধু গর্ডনকে কীভাবে মারল ওরা?"

"ওরা মেরেছে?" অ্যাডাম সোজা হয়ে বসল।

"আমার কাছে প্রমাণ আছে। অরোরা, স্বামী আর সুদ!"

"ওরা নিজেরা? কিন্তু লোক দিয়েই তো মারাতে পারত।"

"ডোন্ট বি সো নাইভ। কিছু কাজ ওরা নিজেরা করতে ভালবাসে, কারণ

গর্ডনের কাছ থেকে কিছু পেপার্স ওদের নেওয়ার ছিল, যা অন্য কারও হাতে পড়লে বিপদ হত! তাই ওরা নিজেরাই... বিশ্বাস হচ্ছে না? আচ্ছা, এই দ্যাখ।" রুপিন একটা খাম অ্যাডামের পাশের ওক কাঠের টেব্‌লে ছুড়ে রাখল।

অ্যাডাম খামটা খুলল। দুটো ছবি আর একটা নেগেটিভ।

"ভাল করে দ্যাখ," রুপিন চেয়ার থেকে উঠে এসে দাঁড়াল অ্যাডামের চেয়ারের পিছনে। রুপিনের পায়ের চাপে কাঠের মেঝেটা মড়মড় করে উঠল।

অ্যাডাম দেখল বড় করে প্রিন্ট করা একটা ছবি। তাতে দেখা যাচ্ছে গর্ডন দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে। পরনে পাজামা আর গোল গলার টি-শার্ট। দরজার পায়ের কাছে দুটো দুধের বোতল আর খবর কাগজ রাখা। এ ছাড়াও ছবিতে আরও তিনজনকে দেখা যাচ্ছে সুদ, অরোরা আর স্বামী। তিনজনেই দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বোঝা যাচ্ছে যে, ওরা এসেছিল বলেই গর্ডন দরজা খুলে দাঁড়িয়েছিল। ছবিটা দূর থেকে টেলিফোটোয় নেওয়া।

অ্যাডাম বলল, "দেখলাম। তো?"

"ইউ আর লুজ়িং ইট," রুপিন মাথা নেড়ে হাঁটু ভাঁজ করে অ্যাডামের পাশে বসল, "তোর রিফ্লেক্স নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ভাল করে দ্যাখ। ছবিটা তোলা হয়েছে গর্ডনের মৃত্যুর দিন।"

"মানে?" অ্যাডাম ঘুরে বসল।

রুপিন বলল, "মানে, পোস্টমর্টেম অনুযায়ী, মৃত্যু হয়েছিল সকাল সাড়ে সাতটা থেকে আটটার ভিতর মার্চের পনেরো তারিখ। এই দ্যাখ, ছবির কোনায় সেল্‌ফ প্রিন্ট ক্যামেরার তারিখ প্রিন্ট করা, ফিফটিন্থ মার্চ। আর এই দ্যাখ," রুপিন এবার দ্বিতীয় ছবিটা বের করল, "সুদের হাতের ক্লোজ় আপ। নেগেটিভ থেকে বড় করিয়েছি। কবজির ঘড়িটা দ্যাখ, সাতটা চল্লিশ বাজে। হল? বিশ্বাস হল?"

অ্যাডাম ভুরু কুঁচকে বলল, "ডেটটা যে প্রিন্ট হয়েছে, সেটা তো

ম্যানিপুলেটেডও হতে পারে। মানে ক্যামেরায় তো সেটা সেট করা যায়।” “জানি, সেইজন্য এই নে দ্যাখ, এটা ফিল্মে তোলা ছবি। পাতি ডিজিট্যাল ক্যামেরায় নয়। এই যে নেগেটিভ। তা ছাড়া মেনে নিলাম যে ডেটটা বানানো, কিন্তু গর্ডনের টি-শার্টটা? এই যে ডোনাল্ড ডাক আঁকা রয়েছে বুকের কাছে। সেটা? মনে নেই, বডি দেখে বেরোবার সময় একজিবিট হিসেবে রেখে দেওয়া গুলির ফুটোওয়ালা টি-শার্টটা? মনে নেই ডোনাল্ড ডাকের মুখটা প্রিন্ট করা ছিল টি-শার্টে? সত্যিই অ্যাডাম, তুই এই নির্জনতায় থাকতে থাকতে কেমন যেন ভোঁতা হয়ে যাচ্ছিস। ইউ আর লুজ়িং ইট।”

“ছবিটা তুমি তুলেছ?” অ্যাডামের গলা আবছা হয়ে গেল আবার।

চোখ দুটো ছবির দিকে থাকলেও কেমন যেন অন্যমনস্ক।

“আই হ্যাভ মাই মেন।”

“কেন? তুমি তো ওদের সঙ্গেই...”

“কাজ করি?” রুপিন হাসল, “সময়মতো বলব তোকে। এখনও বলার সময় আসেনি। তবে শোন, ওদের মরতে হবে। চারজনকেই। এই ড্রাগস আর তার পয়সায় ইন্ডিয়ান সাব-কন্টিনেন্টে বাড়তে থাকা টেররিজ়ম বন্ধ করতে হবে।”

“সরি,” অ্যাডাম ভুরু কোঁচকাল, “সুদ, স্বামী, অরোরা তিনজন। চারজন হল কী করে?”

“ওরা তিনজন সামনে থাকে। তবে আরও একজন আছে। যদিও জানি না সে কে, কিন্তু আছে। তবে তুই আগে এই তিনজনকে মার। তার মধ্যে চতুর্থজনের খবর নিয়ে এসে দিচ্ছি তোকে।”

অ্যাডাম ছবিটা হাতে মাথা নিচু করে রইল। গর্ডন, ওর বন্ধু। কতবার গর্ডন পুলিশের থেকে বাঁচিয়েছে ওকে! কতবার ওকে মৃত্যু থেকে রক্ষা করেছে? তাকে সুদরা মারল?

অ্যাডাম ছবিটার দিকে তাকাল আবার। জিজ্ঞেস করল, “সুদরা মারল কেন ওকে?”

“হি ওয়জ় আ মোল। ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের ইনফরমার ছিল ও। সুদদের বিপক্ষে তথ্য জোগান দিচ্ছিল। তুই তো ড্রাগসের ব্যবসায় জড়াবি না বলে কার্টেল ছাড়লি, কিন্তু গর্ডন তোর মতো পালায়নি। ও কার্টেলের ভিতরে থেকে তাকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল। ডোন্ট বি অ্যান এসকেপিস্ট র‍্যাট। ফাইট ফর ইয়োর ফ্রেন্ড, ইয়োর ডিগনিটি। শোন, আমি জানি তুই তিন-চারটে অরফ্যানেজকে টাকা দিস। জানি ফাদার ফ্রান্সিস বলে একজনের অরফ্যানেজের মেন ফাইনানসারও তুই, মানে অদম্য সেন। সুদরা তোকে না মারতে পেরে যদি ওই অনাথ বাচ্চাগুলোর ওপর হামলা করে? বাচ্চাগুলো যদি মারা পড়ে? তুই এটা কি হতে দিতে পারিস? আমি তোর মতো কমপিটেন্ট নই। এদের ভিতরে থেকে এদের দুর্বল জায়গাগুলো দেখিয়ে দিতে পারি মাত্র। কিন্তু কিচ্ছু করার মতো ক্ষমতা আমার নেই। থাকলে তোকে বলতাম না।”

“কিন্তু কীভাবে?” অ্যাডাম মুখ তুলে তাকাল রুপিনের দিকে।

“একসঙ্গে মারতে হবে ওদের। আলাদা আলাদা করে মারতে গেলে সতর্ক হয়ে যাবে ওরা। ওদের কোনও নির্জন জায়গায় একসঙ্গে ডাক। তারপর...” রুপিন হাসল, “এটা খুব দরকার। সারা পৃথিবীতে যুদ্ধে যত না লোক মারা যায়, ড্রাগের জন্য তার চেয়েও বেশি! তা ছাড়া টেররিজ়মকে ফান্ডিং তো আছেই। তুই ড্রাগসের সঙ্গে জড়াবি না বলে কার্টেল ছাড়লি। কিন্তু যদি কার্টেল তোকে না ছাড়ে? থিঙ্ক অফ দোজ় লিট্‌ল চিলড্রেন। তোর বন্ধুর কথাও ভাব। অর্ধেক কাজ করে এই নির্জনতায় লুকিয়ে থাকিস না। বি আ ম্যান অ্যাডাম। কিল দেম।”

চারদিন পরে এক সকালবেলায়

লেকের ধারের এই বাড়িটাও কাঠের। দেখলে মনে হয় খেলনা-বাড়ি। আশপাশে আর কোনও বসতি নেই। একটা রাস্তা এঁকেবেঁকে সাদা

ওড়নার মতো পড়ে রয়েছে মাঠে। আর মাঠটাও উঁচু-নিচু হতে হতে উঠে গিয়েছে পাহাড়ে। সেই পাহাড়ের ছায়া বিরাট বড় লেকের গায়ে পড়েছে। প্রায় এক কিলোমিটার দূর থেকে গোটা দৃশ্যপটকেই মনে হচ্ছে ক্যালেন্ডার থেকে ছিঁড়ে নেওয়া ছবি। এমন জায়গায় আগুন, ধোঁয়া আর রক্ত কি মানায়?

কিন্তু কত কিছুই তো মানায় না জীবনে, তা বলে কি সেসব হয় না? ছোট বয়সে মা-বাবাকে হারানো কি মানায়? অরফ্যানেজ হোমের অকথ্য অত্যাচার সহ্য করা কি মানায়? ক্রমশ অন্ধকার জীবনে ঢুকে পড়াও কি মানায়? বা এই সান কার্টেল যদি ফাদার ফ্রান্সিস আর তাঁর অরফ্যানেজের বাচ্চাদের উপর আক্রমণ করে অ্যাডামের কার্টেল ছাড়ার শোধ নেয়, তাও কি মানায়? অ্যাডাম এখন বোঝে মানানো বা না-মানানোর, এই ধারণাটাই পেটি রোম্যান্টিসিজ়ম। বাস্তবের সঙ্গে কোনও মিল নেই।

"ওই দ্যাখ, তিনটে গাড়িই এসেছে," রুপিনের কথায় সংবিৎ ফিরল অ্যাডামের। ও চোখ রাখল সামনের ট্রাইপডের উপর রাখা দূরবিনে। তিনটে লম্বা গাড়ি এতদূর থেকেও রোদে ঝলসাচ্ছে। ওদের তিনজনকে আলাদা আলাদা ভাবে তো একাই দেহরক্ষী ছাড়া আসতে বলেছিল, ওরা কি একা এসেছে? না...

না, কেবল তিনজন তিনটে গাড়ি থেকে বেরোল। নিজেদের মধ্যে কথা বলল কীসব, তারপর ঢুকে গেল কাঠের বাড়ির ভিতর।

রুপিন উত্তেজিতভাবে অ্যাডামের কাঁধ খামচে ধরল। বলল, "সব ঠিকমতো বলেছিস তো? ওরা আবার সন্দেহ করবে না তো? ইস, চতুর্থ মাথাটা যে কে, সেটা যদি জানতে পারতাম তা হলে সবক'টাকে একসঙ্গে নিকেশ করা যেত!"

"সব বলেছি, টেনশন কোরো না। বলেছি, এমন কিছু ডকুমেন্টস ওদের আজ দেব, যা বাইরে থাকলে বা অন্যের হাতে পড়লে ওদের সর্বনাশ হবে। তবে টাকার বিনিময়ে অবশ্যই। আর বলেছি সঙ্গে করে কাউকে আনলে

ওরা তো জানেই কী হতে পারে,” অ্যাডাম কথা শেষ করে রুপিনের দিকে তাকাল, “ঠিক না? ওদের আমায় ভয় পাওয়া উচিত কিনা, বলো?”

রুপিন হাসল, “তোকে এই লাইনে ভয় পায় না এমন কেউ আছে? যদিও তোকে দেখলে কিচ্ছু মনে হয় না, তবু তোর নামে ভয় পায় না, এমন কেউ নেই।”

“রাইট,” অ্যাডাম পাশের সুটকেস থেকে ছোট্ট রিমোটটা বের করল, “গোটা বাড়ির নীচেই এক্সপ্লোসিভ লাগানো আছে। জাস্ট এই বোতামটা টিপলেই...”

“ওয়েট করছিস কেন? ঘরে ঢুকে তোকে না দেখলে প্যানিক করবে ওরা। পালাতেও পারে। তাড়াতাড়ি কর।” রুপিন উত্তেজিত হল।

“ওরা জানে আমি থাকব না। একটু পরে আসব। দে উইল ওয়েট। ডকুমেন্টসগুলো এ দেশের অ্যান্টি নারকোটিক ব্রাঞ্চের হাতে পড়লে ওরা জানে, ওদের কী অবস্থা হবে! তাই আমার জন্য ওরা অপেক্ষা করবেই।”

“তাও, দেরি করছিস কেন? দশ মিনিট তো হল ওরা ঢুকেছে। এবার ওড়া ওদের। উড়িয়ে দে,” রুপিন উত্তেজিত গলায় বলল।

অ্যাডাম রিমোটটা রুপিনের হাতে দিয়ে বলল, “ইউ প্রেস ইট। তুমি বলেছিলে তোমার ক্ষমতা নেই ওদের মারার। নাও, তোমার হাতে ক্ষমতা তুলে দিচ্ছি। ডু দ্য নিডফুল।”

“আমি?” রুপিন থতমত খেল একটু, তারপর দু'সেকেন্ড সময় নিল চিন্তা করতে, বলল, “ঠিক আছে। লেট মি... এরা এক-একটা শয়তান। এদের মারার জন্যই আমি জয়েন করেছি এখানে। আজ আমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিন।”

বিকট শব্দ করে যখন বাড়িটা প্রায় শূন্যে উড়ল অ্যাডাম অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়েছিল। শব্দটা লেক পেরিয়ে দূরের পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে ভেঙে ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। কিছু টুকরো ফিরে এল, কিছু মিলিয়ে গেল। অ্যাডাম দেখল লেকের জলে বসা পাখিরা ভীষণ ভয় পেয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে উড়ল

খানিক। ডুবল খানিক। খানিক চিৎকার শুরু করল। মানুষ আর কতভাবে এদের ভয় দেখাবে?

রুপিন বলল, "রইল বাকি এক। দু'দিনের ভিতরে তোর ওই লোনলি কটেজে গিয়ে চতুর্থজনের নাম বলে আসব। তাকে মেরে সান কার্টেলকে সারা জীবনের জন্য অস্তে পাঠিয় দে দেখি। এক নতুন সূর্যাস্ত হোক।"

দু'দিনের মাথায়

কাঠের টেব্‌লের উপর টিভির রিমোটটা নামিয়ে রেখে দরজার দিকে তাকাল অ্যাডাম। রুপিন দাঁড়িয়ে রয়েছে দরজায়। পকেটে হাত, মুখে হাসি, "কী রে, জানলাগুলো সব বন্ধ করে রেখেছিস কেন? তার উপর ঘরের আলোটা এত ডিম করে রেখেছিস? ব্যাপার কী? এরকম একটা খুশির দিনে এমন আবছা আলোয় বসে রয়েছিস কেন?"

"খুশির দিন?" অ্যাডাম ক্লান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল।

"চতুর্থ মাথার নামটা পাওয়া গিয়েছে," রুপিন দরজা দিয়ে এসে দাঁড়াল ঘরের মাঝখানে, "কী রে, এই অ্যাডাম, আমার কথা কানে যাচ্ছে না?" রুপিন আবার বলল।

অ্যাডাম এতক্ষণ মেঝের দিকে তাকিয়ে ছিল, এবার রুপিনের কথায় যেন জোর করেই মাথা তুলল, "চতুর্থজন?"

"ইয়েস। তুই ভুলে গেলি?" রুপিন হাসল, "এবার তাকে মরতে হবে। সেও তো গর্ডনের মৃত্যুর জন্য সমান দায়ী, না?"

"সমান নয়, একমাত্র দায়ী," ক্লান্ত গলায় বলল অ্যাডাম।

"একমাত্র, মানে?" রুপিন অবাক হল, "কী বলছিস? স্পষ্ট করে বল। চতুর্থজন একমাত্র দায়ী?"

"চতুর্থজন যে কিনা প্রথমজন বা একমাত্রজন, মানে একজন।"

অ্যাডাম রুপিনের দিকে তাকাল। রুপিন বলল, "কী বলছিস তুই? এ কেমন ধাঁধা?"

"অরোরা, স্বামী বা সুদ নয়, গর্ডনকে মেরেছে..." অ্যাডাম মাথা নামিয়ে নিল, "কেন এমন হল? গর্ডন তো কোনও দোষ করেনি! তা হলে কেন তাকে মারলে তুমি?"

"না হলে অ্যাডাম ইনভল্‌ভড হত কী করে?" রুপিনের গলার স্বরে এমন কিছু ছিল যাতে অ্যাডাম চোখ তুলে তাকাল। দেখল, রুপিনের হাত আর পকেটে নেই। বরং তা সামনে সোজা হয়ে আছে। আর তাতে ধরা আছে একটা স্বয়ংক্রিয় পিস্তল, "ওকে না মারলে কি তুই সুদদের মারতে রাজি হতিস? ও তো জাস্ট একটা ডিসপোজ়েবল অ্যাকসেসরি। একটা টোপ। গর্ডন গিয়েছে। সুদ, স্বামী আর অরোরাও গিয়েছে। এবার লাস্ট পেরেকটা হলি তুই। তোকে না মারলে বারো হাজার টন ড্রাগসের যে কন্ট্রোল সেটা তো সম্পূর্ণভাবে নেওয়া যাবে না। কী বল?" রুপিন হাসল।

"তুমি শিয়োর যে আমি শেষ পেরেক?" অ্যাডাম আবছা গলায় বলল।

"ইয়েস," কনফিডেন্ট গলায় বলল রুপিন, "তুই একটা বোকা, 'ড্রাগসের লাইনে কাজ করব না,' এমন কেউ বলে? শোন, সামনের পৃথিবী কন্ট্রোল করবে, তেল নয়, ড্রাগস। আর সেখানে আমি তার অধিকার না নিয়ে সুদ, স্বামী, অরোরার লেজ হয়ে কাজ করব? তবে তোকে মারার আগে একটা কথা বলতেই হবে, তুই ঠিক ধরেছিস ব্যাপারটা। আমি যে গর্ডনকে মেরেছি, সেটা ঠিক ধরেছিস। কী করে ধরলি বল তো?" রুপিন কৌতূহলী বাচ্চার গলায় জিজ্ঞেস করল।

"কঠিন কিছু নয়। নেগেটিভ। আর ডোনাল্ড ডাকের ঠোঁট," অ্যাডাম ক্লান্ত গলায় বলল।

"মানে?" রুপিন একটু থমকাল।

অ্যাডাম মাথা নাড়ল, "কেন আমায় ছবি ব্লো-আপ করার আইডিয়া দিলে? ছবিটা তো পনেরোই মার্চ তোলা নয়। চোদ্দোয় তোলা। শুধু ছবির ডেট আর হাত ঘড়ির ব্লো-আপ দেখালেই হবে? ছবির অন্য কোণে যে খবরের কাগজ পড়ে ছিল সেটা ভুলে গেলে? আমি সেই অংশটা এনলার্জ করে দেখেছি। পেপারে ডেট থাকে। ওটাতেও ছিল। চোদ্দোই মার্চ। ফোটোয় যে প্রিন্ট ডেট ছিল তা বদলানোই যায়, কিন্তু এটা বদলাবে কী করে?. আর ডোনাল্ড ডাকের ঠোঁট? চোদ্দোই মার্চ যে টি-শার্ট পরেছিল গর্ডন, সেই ডোনাল্ড ডাক ছাপা টি-শার্টের ডাকটির ঠোঁট ছিল লাল রঙের। আর মৃত্যুর দিন অর্থাৎ পনেরো তারিখ যে টি-শার্ট পরেছিল, তাতে ছাপা ডাকটির ঠোঁটের রং ছিল হলুদ। এটা খেয়াল করোনি? খুব ছোট্ট ভুল, কিন্তু পরিণাম বিরাট বড়। তুমি কী ভেবেছ? তুমি কি ভেবেছ আমি সত্যি ভোঁতা হয়ে গিয়েছি? তুমি ছবি দেখিয়ে যা বলবে, তাই আমি বিশ্বাস করে নেব? অ্যাম আই রিয়েলি লুজ়িং ইট?"

রুপিন বন্দুকটা বিপজ্জনকভাবে নাচিয়ে হেসে বলল, "ইয়েস ইউ আর লুজ়িং ইট ডিয়ার। বিশ্বাস তো করেছিস। না হলে অরোরাদের মারতিস?"

"মনে আছে, ওরা সেই কাঠের বাড়িতে ঢোকার পর আমি দশ মিনিটেরও বেশি সময় নিয়েছিলাম ব্লাস্টটা করাতে? তুমি আমায় তাড়া দিচ্ছিলে? মনে আছে? আসলে, আই ওয়জ় বাইং টাইম। বাড়ির পিছনেই ছিল লেক। আর বাড়ির পিছনের দরজা দিয়ে লেকে নামবার চমৎকার বন্দোবস্ত ছিল। সেখানে তিনটে ডাইভার'স কিট রাখা ছিল। জলের তলায় অনায়াসে আধ ঘণ্টা কাটানো যায়, এমন অক্সিজেনের বন্দোবস্ত করাই ছিল। বোমায় বাড়িটা উড়ে যায়, কিন্তু..."

"তুই, জানোয়ার, সন অফ..." অবস্থা বুঝে হঠাৎ রুপিন বন্দুক হাতে হিংস্রভাবে এগিয়ে আসতে গেল, কিন্তু তার আগেই অ্যাডাম চকিতে উঠে দাঁড়িয়ে হাতের মুঠোয় লুকোনো ছোট্ট একটা রিমোটের বোতাম টিপে

বলল, "নোড়ো না, তা হলে মারা যাবে। তোমার পায়ের চাপে প্রাইমারি অ্যাক্টিভেশন হয়ে গিয়েছিল কাঠের মেঝের নীচে রাখা বোমটার। এবার সেটাকে সম্পূর্ণ আর্ম করলাম। এটা প্রেশার অ্যাকটিভেটেড ক্লিনটার মাইন। কাঠের মেঝের থেকে পা ওঠালেই, ফিউজ়টা উড়ে যাবে আর বিস্ফোরণে তোমার শরীরের নীচের অংশটা জাস্ট 'নেই' হয়ে যাবে। আর বন্দুক তুললে এই বোতাম টিপে এখনই বোমা ফাটিয়ে দেব। ওই দ্যাখো, তোমার পায়ের নীচের কাঠের পাটাতন পাতা মেঝের ফাঁক দিয়ে আর্মড বোমের ছোট্ট লাল আলোটা দেখা যাচ্ছে।"

"তুই, তুই, সুদদের..." রুপিন কথা শেষ করতে পারল না, পাশের ঘরের দরজা ঠেলে বেরিয়ে এল পরমজিৎ অরোরা, পুরুষোত্তম স্বামী আর নবীন সুদ। তিনজনের বন্দুকই রুপিনের দিকে তাগ করা।

দরজাটা বন্ধ করে রাস্তায় পা দিল অ্যাডাম। রুপিনকে ঘিরে ধরে তিনজন বন্দুকবাজ কী করবে, তা ও জানে। ঘর থেকে বেরোবার আগে ও শুনছিল রুপিন শেষ চেষ্টা করছে বোঝাবার, বলছে, "গর্ডন ইন্ডিয়ান ইন্টেলিজেন্সের চর ছিল। ওকে না মারলে সান কার্টেলকে বাঁচানো যেত না। আর অ্যাডাম তো লাইন ছেড়ে সব ফাঁস করে দিত বলেই..." অ্যাডাম জানে, মৃত্যু খুব বড় মোটিভেশন। আর প্রতিশোধ তার চেয়েও বড়। ও পিছনে তাকাল।

বড় পাহাড়ের পায়ের কাছে দেশলাই বাক্সের মতো পড়ে আছে বাড়িটা। তবে খালি নয়, বারুদ ঠাসা বাক্স। তার উপর দরজা জানলা সব বন্ধ। ভিতরে সান কার্টেলের তিনজন মাথা, সঙ্গে মাথা হতে চাওয়া রুপিন। গোটা সাউথ এশিয়ার ড্রাগ লিঙ্কটাই জড়ো হয়ে রয়েছে কাঠের বাড়ির ভিতরে।

ড্রাগ, যা গোটা একটা জেনারেশনকে শেষ করে দিচ্ছে।

ড্রাগ, যা সন্ত্রাসবাদকে তার রসদ জুগিয়ে যাচ্ছে আর তার তাপে কখনও মুম্বই, কখনও লাহোর, কখনও বালি বা মাদ্রিদে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে

নির্দোষ, সাধারণ মানুষ। এই শান্ত সুন্দর পৃথিবীতে ফাদার ফ্রান্সিসের পাশাপাশি এমন নরখাদকরাও থাকে!

হ্যাঁ, এরা নরখাদক, মুখোশের আড়ালে নরমাংসভোজী!

পকেট থেকে সেই ছোট্ট যন্ত্রটা আবার বের করল অ্যাডাম। লাল বোতামটায় আঙুল রাখল তারপর আলতোভাবে টিপে দিল বোতামটা। দরজা জানলা বন্ধ বাড়িটার ভিতরে বোমা ফেটে, পুরো বাড়িটাকে বেলুনের মতো ফাটিয়ে দিল। রুপিন যদি বুঝত কেন জানলাগুলো বন্ধ করে রেখেছিল অ্যাডাম! প্রেশারাইজ জায়গায় বোমা অনেক বেশি কার্যকর।

টোপ। ঠিকই বলেছে রুপিন। তবে ঘটনাটা বোঝেনি। সুদ, স্বামী আর অরোরা ছিল রুপিনের টোপ আর রুপিন টোপ ছিল ওদের। কারণ, রুপিনের গন্ডগোলের কথা সুদদের জানালে আর রুপিনকে এর জন্য ওদের হাতে তুলে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি না দিলে সুদরা তিনজনে রাজি হত না, একসঙ্গে ওই লেকের ধারের বাড়িতে আসতে। রাজি হত না সেই বাড়িটার বিস্ফোরণের প্ল্যানের অংশ হতে। এইভাবে ওদের অপরের বিরুদ্ধে লড়াতে না পারলে কার্টেলকে শেষ করার অন্য কোনও উপায় ছিল না।

পকেট থেকে মোবাইলটা বের করল অ্যাডাম। নম্বর ডায়াল করে কানে লাগাল, "হ্যালো, মিস্টার গর্গ? আমার টাকাটা কি জমা পড়েছে?"

গর্গ বলল, "হ্যাঁ, আর ওরা?"

"সান হ্যাজ় সেট।"

"ফ্যানটাসটিক," গর্গের গলায় আনন্দ, "শোনো আর একটা কাজ আছে। ওই বারো হাজার টন ড্রাগের জন্য কলম্বিয়ান আর রাশিয়ান দুটো গ্রুপ ঝাঁপাচ্ছে। ওই ড্রাগের ফার্স্ট কনসাইনমেন্ট যাওয়ার কথা আজ থেকে ঠিক একমাস পরে। আফগানিস্তান রাশিয়ান বর্ডারে। প্রথম লটে প্রায় দেড় হাজার টন মাল যাবে। গোটাটাকে ধ্বংস করতে হবে। মানি উইল বি

গুড। শোনো, কাজটা কবে থেকে শুরু করবে? হ্যালো... শুনতে পাচ্ছ? হ্যালো... হ্যালো...”

মোবাইলটা কান থেকে নামিয়ে কানেকশন কেটে রাস্তার পাশের লম্বা লম্বা ঘাসের ভিতরে ফেলে দিল অ্যাডাম। তারপর এগিয়ে গেল। ও এখন ক্লান্ত। ওর যুদ্ধ শেষ।

এবার অন্যরা আসুক। অন্যরা চেষ্টা করুক। তারপর তারা না পারলে তখন... নাঃ, আর ভাবতে ভাল লাগছে না ওর। অ্যাডাম শুনতে পেল ঝোপের মধ্যে পড়ে থাকা মোবাইল থেকে প্রাণপণে ডেকে চলেছে কোকিল। কিন্তু আর সাড়া দেবে না অ্যাডাম। এই নির্জন উপত্যকা ছেড়ে যাওয়ার সময় হল ওর। ফাদার ফ্রান্সিসের অরফ্যানেজে ওর ছোট্ট ঘরটায় ফিরতে হবে ওকে।

সেখানে ও অ্যাডাম নয়, অদম্য সেন। ফাদার এখন ফুলের চাষ করেন। সেখানে হাত লাগাবে ও। সারাদিন কাদা-মাটি মেখে ফুল বের করে আনবে কুঁড়ি থেকে। শান্তি বের করে আনবে জীবন থেকে। বসন্তের ফুল ফোটানো ছাড়া আর কী কাজ থাকতে পারে মানুষের?

হাতির গল্প

ছেলেটা পড়ে আছে। বাঁ হাতটা রক্তাক্ত। ছেলেটা ওকে বাঁচাতে না এলে দালির আজই হয়তো শেষদিন হত পৃথিবীতে। নাইটক্লাবের সামনে এত ভিড় যে, কে গুলিটা চালাল তা বোঝা যায়নি! দালি তবুও এদিক-ওদিক তাকাল। না, তেমন কেউ নেই। বরং গুলি লেগেছে বলে আহত ছেলেটির চারদিকে ভিড় বাড়ছে। দালি হাঁটু গেড়ে বসল ছেলেটির সামনে। যন্ত্রণায় নীল হয়ে আছে ছেলেটার মুখ। রোগা, ফরসা নরম মুখের একটা ছেলে। ওকে বাঁচাতে সামনে চলে এল? কে এই ছেলেটা? দালি ছেলেটার সামনে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করল, "কী নাম তোমার?"

এক বছর পরে

পিটের কথা

অরেঞ্জ জুসের ছোট্ট পেট বোতলের ঢাকনাটা খুলে গলায় ঢালল দালি। তারপর হাতের উলটো পিঠ দিয়ে মুখটা মুছে বলল, "দুটো ট্রাক গিয়েছে, আর দুটো বাকি আছে। ক্যামোফ্লেজ র‍্যালিতে সময়টা বড্ড নষ্ট হয়।"

পিট হাসল, "দ্যাখো, ওই দুটো ট্রাকের একটায় না আবার জিনিসটা বেরিয়ে যায়!"

দালি গাড়ির সামনের সিট থেকে পিছন ফিরল, "তুমি নিজেই তো

মিটার দিয়ে প্রথম দুটো ট্রাকের টায়ারের ডায়ামিটার মাপলে। দুটোই এক। নরম্যাল। লোড ছাড়া। জানো না যে, ট্রাকের ভিতরে লোড বেশি হলে টায়ারের উপর প্রেশার পড়ে আর তাতে টায়ারের ডায়ামিটার কমে যায়? প্রথম দুটো ট্রাকের চাকার তেমন কোনও ডিসটরশন তো ছিল না। তবে?”

পিট ফের হাসল, “তা ঠিক,” তারপর নিজেই আবার হাতের লম্বা দূরবিনের মতো যন্ত্রটাকে দেখিয়ে বলল, “এটা একটা গ্রেট ইনভেনশন, দূর থেকে সবকিছু মেপে দেয়।”

দালি হাসল, “সব কি আর মাপতে পারে? পারে না। মানুষের মনের ভিতরটা মাপা সহজ নয়!”

পিট কিছু না বলে পিছনে একটু হেলিয়ে বসল, তারপর সামনের সিটে দালির পাশে বসা অল্প বয়সি ছেলেটির দিকে তাকাল। রোগা, সামান্য বেঁটে, আর ভিতু ভিতু মুখের এই ছেলেটাকে দালি কেন যে এই কাজটায় ঢোকাল! আসলে যে-কোনও ক্রাইমের মূল হল মন্ত্রগুপ্তি, যত বেশি সেই ঘটনার কথা লোকে জানবে, তত বেশি কাজটা পণ্ড হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হবে। যাক গে। ওর কী দরকার! সুস্থমতো কাজটা সেরে মালের ভাগ নিয়ে চম্পট দেবে। সোজা হিসেব।

ঘড়ি দেখল পিট। দুটো ট্রাকের মধ্যে সময়ের গ্যাপ পনেরো মিনিটের মতো। দ্বিতীয় ট্রাকটা গিয়েছে মিনিট নয়েক হয়েছে। আরও একটু সময় আছে। গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে রাস্তাটা দেখল ও। শুনশান রাস্তা। ইয়োরোপের দেশগুলোর এই এক মজা। এত লোকজন কম! শহর থেকে দূরের এই হাইওয়েগুলো একদম নির্জন থাকে। তাই তো এমন একটা কাজ করার জন্য এই স্পটটাকেই ওরা বেছেছে।

আসলে বেছেছে ফ্রেডি। ফ্রেডেরিখ লামহ্। ওদের প্ল্যানের পাণ্ডা। লোকটি জার্মান। রোগা পাকানো চেহারা। ‘ডি গ্যালাক্সি’ নামে একটা ডায়মন্ড মার্চেন্ট কোম্পানির ডিরেক্টর। ওই জোগাড় করেছে এই টিম।

ওই বলেছে নানা মাপের হিরে মিলিয়ে প্রায় দু'হাজার ক্যারেটের মতো ফিনিশড ডায়মন্ড, পোর্ট থেকে ডি গ্যালাক্সির ট্রেজ়ারিতে যায় এই পথ দিয়ে। আসলে যায় চারটে ট্রাক। যার একটায় থাকে হিরে আর চারজন সিকিয়োরিটি অফিসার। বাকি তিনটে ট্রাক ক্যামোফ্লেজ। কিন্তু ওই চারটে ট্রাকের কোনটায় যে হিরে যাবে তা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কোম্পানির ম্যানেজিং পার্টনার ছাড়া আর-কেউ জানতে পারে না। কিন্তু কোন পথে ট্রাক যাবে, সেটা ডিরেক্টর লেভেলের লোকজনই শুধু জানে। তাই ফ্রেডিও সেটা জেনে যায়। ফ্রেডি কেন নিজের কোম্পানির মাল লুঠ করতে চায়, সেটা শুনে প্রথমে তাজ্জব হয়েছিল পিট। ফ্রেডির প্রাপ্য প্রোমোশন নাকি দু'-দু'বার দিয়ে দেওয়া হয়েছে ওর সহকর্মী ভিটরকে। তাই তার বদলা নিতে চায় ও। এই ডায়মন্ড নিয়ে যাওয়ার সেফ প্যাসেজের পুরো প্ল্যানটা নাকি ভিটরের। তাই হিরে লুঠ করে ও দেখিয়ে দিতে চায় যে, ভিটর কতটা ইনকম্পিটেন্ট! ওর প্ল্যানটা কতটা ফালতু!

ফ্রেডি ওদের জোগাড় করে গোটা কাজটার ক্যাপ্টেন করে দিয়েছে দালিকে। দালি একজন স্প্যানিশ। চুপচাপ, শান্ত। কিন্তু মাথাটা খুব পরিষ্কার। ও-ই চারটে ট্রাকের থেকে কোন ট্রাকে রক্ষীসমেত হিরে আছে, সেটা বোঝার জন্য এই অদ্ভুত যন্ত্রটা নিয়ে এসেছে। দূরবিনের মতো দেখতে যন্ত্রটা দিয়ে দূর থেকে কোনওকিছুর মাপ বোঝা যায়।

"ওই আসছে," সামনের অল্পবয়সি ছেলেটা বলে উঠল হঠাৎ। আর সকলে একসঙ্গে নড়েচড়ে বসল। পিট বুঝল এই আসল সময়।

"দ্যাখ তাড়াতাড়ি," পিটের পাশে এতক্ষণ চোখ বন্ধ করে বসে থাকা ফ্রেডি সোজা হয়ে বসল হঠাৎ। বল, "যন্ত্রটা চোখে লাগাও। টায়ার দ্যাখো পিট, টায়ার।"

যন্ত্রটা চোখে লাগিয়ে পিট দূরবিনের চোঙের মতো অংশটার পাশে লাগানো একটা বোতাম চেপে যন্ত্রটা চালু করল। গাড়ির সামনে ড্যাশ

বোর্ডের কাছে একটা এলসিডি স্ক্রিনে ফুটে উঠল ছবি। যন্ত্রটাতে যা দেখা যায় তা এই স্ক্রিনেও ফুটে ওঠে। সকলে স্ক্রিনের উপর ঝুঁকে পড়ল একসঙ্গে। দালি শান্ত গলায় বলল, "পিছনের চাকার উপর ফোকাস রাখো।"

পিট আঙুল দিয়ে একটা নব ঘুরিয়ে কথামতো ফোকাস ঠিক করল। স্ক্রিনে তাও ফুটে উঠল স্পষ্টভাবে। এবার দালি স্ক্রিনের ফোকাস্‌ড অংশটাতে স্পর্শ করামাত্র একটা মেনু ফুটে উঠল। সেখান থেকে 'মেজ়ার ডায়ামিটার' কথাটা সিলেক্ট করল। সকলে আরও ঝুঁকে এল সামনে।

"ইয়েস," দালি শিস দিয়ে উঠল, "আওয়ার টার্গেট। লেটস মুভ।"

পিট বুঝল এই গাড়িতেই আছে ওদের লক্ষ্যবস্তু। কারণ গাড়ির পিছনের টায়ারটার যে অবস্থায় থাকার কথা, তার চেয়ে সাড়ে চার সেমি বসে আছে।

রাস্তাটা নির্জন এখনও। দু'পাশে বড় ফাঁকা মাঠ আর মাঝে মাঝে বড় বড় গাছ। পিট জানে ওকে কী করতে হবে। ও দ্রুত গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াল। তারপর পিছনের ডিকি থেকে বের করল লম্বামতো জিনিসটা। এটা ইজ়রায়েল থেকে আনা। পোর্টেবল রকেট প্রপেল্ড গ্রেনেড বা আরপিজি। অস্ত্রটাকে কাঁধে তুলে তার টার্গেট ফাইন্ডারে চোখ রেখে ট্রিগারে আঙুল রাখল পিট। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে চারদিকে ঢাকা, বাক্সের মতো লাইট আরমার্ড ট্রাকটাকে। পিট জানে, এই আরপিজি ট্রাকের গায়ে আঁচড়ও কাটতে পারবে না। ট্রাকগুলো এমনভাবেই তৈরি। কিন্তু এই ট্রাকেরও দুর্বলতা রয়েছে। পিট চোখ রাখল সেই দুর্বলতায়। তারপর ট্রাকটা নির্দিষ্ট দূরত্বে আসামাত্র ট্রিগারে চাপ দিল। গ্রেনেডটা দ্রুতবেগে বেরিয়ে গিয়ে আছড়ে পড়ল ট্রাকের সামনের চাকার পাশে। নিমেষে ট্রাকটার সামনের অংশটা মাটি ছেড়ে ছিটকে উঠল। তারপর বিকট শব্দে কাত হয়ে পড়ে গেল এবং কিছুটা ঘষটে গেল রাস্তায়।

পিট এবং অন্যরা এবার দৌড়োল ট্রাকটার দিকে। দেরি করা যাবে না। সময় খুব কম। মাত্র পনেরো মিনিট। কারণ তারপর আরও একটা ক্যামোফ্লাজড এসে পড়বে।

কাত হয়ে পড়া ট্রাকের পিছনের দরজাটা ভিতর থেকে খুলে গেল এবার। পিট দেখল তিনজন রক্ষী পড়ে আছে অচৈতন্য অবস্থায়। শুধু একজন প্রায় অক্ষত!

"এই তিনটেকে নিয়ে আর-কিছু করতে হবে না," ফ্রেডি গম্ভীরভাবে বলল। তারপর চতুর্থ রক্ষীটির দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমার বিশেষ লাগেনি তো মুসা?"

দশদিন আগে। ইন্টারপোল চিফের অফিস

একটা পেপার নিজের সেক্রেটারির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে চিফ বললেন, "এত হিরে আফ্রিকা থেকে বেরিয়ে এল আর তোমরা কেউ ব্যবস্থা নিলে না? এসব কনফ্লিক্ট ডায়মন্ডগুলো সস্তায় কিনে বড় বড় হিরে ব্যবসায়ীরা টেররিস্টদের হাতে ডলার তুলে দিচ্ছে। আর তাই দিয়ে ওরা সারা পৃথিবীতে যা খুশি তাই করে বেড়াচ্ছে। তোমরা ঘুমোচ্ছিলে? সিআইএ এই নিয়ে চারবার নোটিশ পাঠাল। কেন আগে এর ব্যবস্থা নাওনি?"

সেক্রেটারি ছেলেটির নাম স্যামুয়েল। ও পেশাদার গোয়েন্দা নয়। আগে অ্যানালিস্ট ছিল আর এখন চিফের সেক্রেটারি পদে কাজ করছে। ও থতমত খেল একটু। তারপর বলল, "আগের তিনবার স্যার ইনফরমেশন ভুল ছিল। তাই..."

"ফালতু কথা বোলো না। জানো, কনফ্লিক্ট ডায়মন্ড কী? আফ্রিকার হিরের খনি থেকে ওখানকার ওয়ার লর্ডরা বেআইনিভাবে জোর করে মানুষদের দিয়ে হিরে তোলায়। তারপর তা বাজার মূল্যের চেয়ে কম দামে বিক্রি করে সেই টাকা দিয়ে ড্রাগস আর অস্ত্র কেনে। যা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। সাদা বাজারে এই হিরে কেনা অপরাধ। কিন্তু তবু কিছু হিরে ব্যবসায়ী বেশি লাভের আশায় কালোবাজার থেকে কম দামে এসব হিরে কেনে। এমনই একটা কনসাইনমেন্ট আসছে

বেলজিয়ামে। সেটাকে থামাতেই হবে। আমি জানি, যে কোম্পানি এটা নিয়ে আসছে, সে বেশ প্রভাবশালী। সে এটাকে পেপারে ক্লিন ডায়মন্ড হিসেবে দেখিয়ে আনছে। কিন্তু তা তো আর সত্যি নয়। এটাকে আমাদের আটকাতেই হবে।"

স্যামুয়েল আমতা আমতা করে বলল, "তা, মানে... স্যার আসলে... লিগ্যালি তো আটকানো যাবে না। তাই ভাবছিলাম কীভাবে..."

চিফ ভুরু কুঁচকে বললেন, "ছোটবেলায় শুনেছিলাম, কুকুরের লেজ যদি সোজা না করতে পারো, তা হলে লেজটা কেটে বাদ দিয়ে দাও। বুঝেছ?"

স্যামুয়েল হাসল এবার। বলল, "ইয়েস স্যার, বুঝেছি। তা হলে কী করব?"

চিফ অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, "এটাও বলতে হবে? কুকুরের লেজ কাটতে হলে কী করতে হয়? বিশেষ করে কুকুরটা যদি পাগলা হয়?"

ফ্রেডির কথা

ওয়্যারহাউসটা বড় আর পুরনো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এটা একটা হ্যাঙার ছিল। পরে ওয়্যারহাউস হয়। এখন এটা একটা ভাঙাচোরা পরিত্যক্ত গুদাম ছাড়া আর-কিছুই নয়। ফ্রেডি এটা খুঁজে রেখেছিল আগেই। এখন এখানে এসে হিরে ভরতি ব্যাগটা রেখে ওর মনে হল, এর চেয়ে ভাল জায়গা আর-কিছু হতে পারে না।

যাক, প্রথম ধাপের কাজ শেষ। হিরেগুলো ঠিকঠাক ভাবে হাতে এসে গিয়েছে। এবার দ্বিতীয় ধাপের কাজ শুরু করতে হবে। ফ্রেডি সামনের প্যাকিং বক্সের উপর বসা দালি, পিট, মুসা আর অল্প বয়সি কিডোকে দেখল। মুসা প্রথম থেকেই ওর দলে। আর পিট কোনও সমস্যা নয়। ওর

মূল লক্ষ্য হল দালি। দালি লোকটা দাগি আসামি। পৃথিবীর ছ'টা দেশে ওর বডি-ওয়ারেন্ট আছে। ইন্টারপোর্ট ওর নামে রেড কর্নার নোটিশ জারি করেছে। মানুষ মারতে দালির হাত কাঁপে না। কিন্তু কাজের ব্যাপারে খুব বিশ্বস্ত ও। তাই ফ্রেডি দালিকে মিশর থেকে যোগাযোগ করে এই কাজের জন্য এখানে এনেছে। কিন্তু এখন দালির সামনে থেকে ওর ভাগের মাল না দিয়ে ওকে কাটিয়ে বেরিয়ে যাওয়াটাই হবে আসল কাজ। ফ্রেডি মুসার দিকে তাকাল একবার। লোকটার বিশাল চেহারা। যেন ওক গাছ!

ট্রাক উলটে যাওয়াতে কিছু হয়নি ওর। আর সেকথা ভেবেই রক্ষী সাজিয়ে ওকে ট্রাকের ভিতরে প্ল্যান্ট করেছিল ফ্রেডি। কারণ ভিতর থেকে দরজাটা খুলে দেওয়ার জন্য একজনকে প্রয়োজন ছিল। ভিতরের রক্ষীদের বন্দুক ছাড়া আর-কিছু রাখা নিষেধ। মানে কোনওরকম ফোন বা ওয়াকি-টকি, কিচ্ছু রাখা যাবে না। যাতে ভিতরের কেউ বাইরের কাউকে ট্রাক সম্বন্ধে খবর না দিতে পারে, সেটা খুব ভাল করে লক্ষ রাখে কোম্পানি। তাই মুসাকে বলে দেওয়া হয়েছিল যে, যখন-তখন ট্রাকের উপর হামলা করবে ওরা। ও যেন সবদিক থেকে সচেতন থাকে।

ফ্রেডির দিকে তাকিয়ে মুসা আলতো করে মাথা নাড়ল। ফ্রেডি হাসল সামান্য। কারণ মুসাকে ও আগেই নিজের দিকে নিয়ে নিয়েছে। দালির সঙ্গে পেরে উঠতে গেলে মুসাকে ওর দরকার।

ফ্রেডি নিজে একটা প্যাকিং বক্সের উপরে বসে এবার দালির দিকে তাকাল, "তা দালি, আমাদের কি সেলিব্রেট করা উচিত নয়? তুমি বলেছিলে শ্যাম্পেন আনবে? এনেছ?"

দালি হাসল মৃদু। বলল, "নিশ্চয়ই। আমরা অবশ্যই সেলিব্রেট করব," তারপর অল্পবয়সি ছেলেটার দিকে তাকিয়ে বলল, "কিডো, ব্যাকপ্যাক থেকে শ্যাম্পেনের বোতলটা বের করো।"

ফ্রেডি হাসল, "গ্রেট। নাও খোলো তবে। আগে চুমুক দিই। তারপর না হয় কাজের কথায় আসা যাবে।"

অল্পবয়সি ছেলেটা বোতলটা খুলে তিনটে গেলাস বের করে পাশের একটা প্যাকিং বক্সের উপর সাজিয়ে তাতে সোনালি তরলটা ঢেলে দিল।

"এ কী, তিনটে গেলাস কেন?" ফ্রেডি হেসে জিজ্ঞেস করল।

"কিডো এসব খায় না। আর আমার তো অরেঞ্জ জুস হলেই হয়। কিডোর ব্যাগে আমার জুস থাকে সবসময়," দালি শান্তভাবে উত্তর দিল।

ফ্রেডি হাসল, তারপর ধীরে ধীরে কেটে কেটে বলল, "জানো দালি, একটা আফশোস হচ্ছে। তুমি শ্যাম্পেনের টেস্ট না জেনেই পৃথিবী থেকে চলে যাবে!"

"মানে?" দালি অবাক হয়ে উঠে দাঁড়াল।

"মানে? এইটা..." ফ্রেডি নিমেষে নিজের লেদারের জ্যাকেটের ভিতর থেকে একটা 'স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন' পিস্তল বের করে সোজা তাগ করল দালির দিকে। একইসঙ্গে মুসাও একটা পিস্তল বের করে তাগ করল কিডোকে।

"এসবের মানে কী?" দালি বিভ্রান্ত মুখে তাকাল ফ্রেডির দিকে।

ফ্রেডি বলল, "মানেটা খুব সোজা। তোমার কাজ ফুরিয়েছে। এবার তোমায় এই রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে যেতে হবে বন্ধু। তবে আফশোস এই যে, কিডোর মতো একটা বাচ্চা ছেলেকেও তোমার সঙ্গে চলে যেতে হবে। তখনই বলেছিলাম ওকে নিয়ো না। তোমার জুস ক্যারি করা ছাড়া আর কি কোনও কাজ আছে ওর?"

দালি স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ফ্রেডির দিকে। ফ্রেডি দেখল অবস্থা খারাপ বুঝে পিটও এসে দাঁড়িয়েছে মুসার সঙ্গে। এটাই হয়। মনে মনে হাসল ফ্রেডি। অপরাধ জগতে দালির যতই নাম থাকুক না কেন, এই খেলায় দালির হার নিশ্চিত। তাই পিট নিজের থেকেই এসে গিয়েছে ওর দিকে। দালি শান্ত গলায় বলল, "এটা কি ঠিক হচ্ছে?" ফ্রেডি একহাতে

শ্যাম্পেনের গেলাস তুলে নিয়ে অন্যহাতে পিস্তলটা ধরে বলল, “ভুল বলে কিছু হয় না বন্ধু। সবই আমাদের ধারণা মাত্র। আগে শ্যাম্পেন তারপর তুমি আর কিডো। কেমন?”

মুসা আর পিটও ফ্রেডির দেখাদেখি গেলাস তুলে নিল।

ফ্রেডি বাঁহাত দিয়ে গেলাসটা উপরের দিকে তুলে হাসল। তারপর বলল, ‘চিয়ার্স টু দ্য টিয়ার্স অফ ইয়োর হার্ট।”

ইন্টারপোলের অফিস। সাতদিন আগে।

স্যামুয়েল অবাক হয়ে চিফের দিকে তাকাল। ফরসা, মোটা মানুষটাকে ওরা সকলে পিছনে হাতি বলে ডাকে। তবু সকলে, বিশেষ করে স্যামুয়েল ওঁকে শ্রদ্ধা করে খুব। ইন্টারপোলের নতুন প্যানোপটিকোন সারভাইল্যান্সের ব্যাপারটা চিফেরই কীর্তি। ‘নজর না রেখেও নজর রাখছি’ এই ভয় যে মানুষের ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, তা এই দশকে নতুন করে বের করেছেন চিফ। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের পুরনো থিয়োরিকেই নতুন করে ইন্টারপোল ইন্টেলিজেন্সে কাজে লাগিয়েছেন চিফ। আর সেই মানুষটা এমন একটা কাজ করলেন! দালির মতো ইন্টারপোলের রেড কর্নার নোটিশ পাওয়া ক্রিমিন্যালকে যোগাযোগ করলেন ব্লাড ডায়মন্ডের পিছনে লাগানোর জন্য। ইন্টারপোল জানে, যাকে নিজেরা অ্যারেস্ট করতে পারছে না, তাকে এমনভাবে যোগাযোগ করাটা বেআইনি। তবু এই কাজ করলেন চিফ!

গতবছর তেল আভিনব-এ দালিকে ধরতে গিয়ে ইন্টারপোলের দু’জন খুন হয়েছিল। সন্দেহ করা হয় যে, দালিই আসলে এই খুনের পিছনে আছে। যদিও প্রমাণ নেই, তবু ওরা জানে যে, দালিই আসল লোক। আর সেই দালিকেই কাজে লাগাচ্ছে ইন্টারপোল! তাও কিনা এই আশ্বাস দিয়ে যে, দালিকে অ্যারেস্ট করা যাবে না! মানে ধরার চেষ্টা চলছে দেখানো হবে খাতায় কলমে, কিন্তু ধরা হবে না! তবে দালিকেও ক্রাইমের থেকে

দূরে রাখতে হবে। দালি মেনে নিয়েছে এই শর্ত। আর তা মানবে না-ই বা কেন? ও নিজেও তো জানে যে, খুন, ড্রাগ, অস্ত্র ব্যাবসা থেকে আরও নানা যেসব কাণ্ড ও করে বেড়িয়েছে তাতে মৃত্যুদণ্ড ছাড়া আর-কিছু সাজা হতেই পারে না। তাই ইন্টারপোলের সঙ্গে তলায় তলায় হাত মেলালে ওর লাভ বই ক্ষতি নেই। কিন্তু চিফ এটা কী করলেন! যে দালিকে ধরা যাচ্ছে না, তাকে একেবারে ফোন করে এমন একটা কাজ দিলেন!

স্যামুয়েল চোয়াল শক্ত করে চায়ের কাপটা চিফের সামনে রেখে সরে এল। আজ ওর হাতির দিকে তাকানোর ইচ্ছে নেই। একদম নেই। মানুষটার সম্বন্ধে ওর শ্রদ্ধা আজ টলে গিয়েছে।

"কী স্যাম, রাগ হচ্ছে?" চিফ হেসে চায়ের কাপটা তুলে নিলেন।

"স্যার, আমরা যা তিনদিনে পারলাম না, সেটা আপনি করে দিলেন! দালিকে খুঁজে বের করে এই কাজে লাগালেন! ও তো ক্রিমিন্যাল!"

চিফ ভুরু কুঁচকে তাকালেন স্যামুয়েলের দিকে, "তুমি আমায় প্রশ্ন করছ?"

স্যামুয়েল মাথা নিচু করল বটে, কিন্তু প্রশ্ন করা যে ভুল হয়েছে তা মানল না।

"ইনসাবরডিনেশন কাকে বলে জানো?" চিফ তাকিয়ে রইলেন স্যামুয়েলের দিকে।

"জানি স্যার," ছোট্ট করে বলল স্যামুয়েল, "কিন্তু ও স্যার দাগি আসামি। ওর ফোন নম্বর আপনার কাছে আছে। কিন্তু তবু আমরা ওকে ধরতে পারছি না কেন? আমাদের লোককে ও খুন করেছে। আর সেখানে ওকে কাজের বিনিময়ে সেফ প্যাসেজ অফার করা হচ্ছে!"

চিফ এবার হাসলেন। স্যামুয়েলের বয়স অল্প। চিফ পছন্দও করেন ছেলেটাকে। তিনি বললেন, "দালি যে দেশে আছে সেখান থেকে ওকে ধরে আনা সম্ভব নয়। তাই ভাবলাম ওকে ধরা যখন যাচ্ছে না, তখন কাঁটা দিয়ে কাঁটাই তুলি।"

"কিন্তু স্যার..." স্যামুয়েল আরও কিছু বলতে গেল।

চিফ হাত তুলে বাধা দিলেন, "আমায় তোমরা কী বলে ডাকো আমার পিছনে?"

"অ্যাঁ!" স্যামুয়েল ঘাবড়ে গেল।

"কী বলে ডাকো আমায়?" চিফ স্থির হয়ে তাকিয়ে রইলেন স্যামুয়েলের দিকে, "ভয় পেয়ো না, বলো।"

স্যামুয়েল কিছু না বলে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

"হাতি। আমি জানি," চিফ হাসলেন, "তা হাতির সম্বন্ধে সেই কথাটা জানো না?"

"কোন কথাটা স্যার?" স্যামুয়েল অবাক হল।

চিফ এবার সারা শরীর কাঁপিয়ে হাসলেন। তারপর বললেন, "সময় হলেই জানবে।"

দালির কথা

দালি স্থির চোখে তাকিয়ে রইল ফ্রেডি, পিট আর মুসার দিকে। তিনজনের চোখেই খুন দেখছে ও। দালি আড়চোখে কিডোকে দেখল। ছেলেটার মুখ-চোখ লাল হয়ে আছে ভয়ে। ঝড়ে গাছের পাতার মতো কাঁপছে ও। তবে কি... দালির চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। কিডো ভুল করেনি তো? ছেলেটা ভাল। বছরখানেক আগে নেপলসে দালির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল কিডোর। না, কোনও ফরম্যাল আলাপ নয়, একটা নাইট ক্লাবের সামনে রীতিমতো নিজের শরীরে গুলি খেয়ে ওকে বাঁচিয়েছিল কিডো। ইন্টারপোলের দু'জন প্রায় সাবাড় করেই দিয়েছিল ওকে। কিডো যে কোথা থেকে এসে বাঁচিয়েছিল কে জানে! সেই থেকে কিডো ওর ছায়াসঙ্গী।

তবে ইন্টারপোলের সেই লোক দুটোকে দালি ছেড়ে দেয়নি। পরে তেল আভিভ-এ ওই দু'জনকেই মেরেছিল দালি। শত্রুর শেষ যে রাখতে নেই

তা ও জানে। তবে ইন্টারপোলের চিফের সন্ধি প্রস্তাব একরকম মেনেই নিয়েছে ও। কিন্তু সবই গন্ডগোল হয়ে যাবে যদি কিডো ভুল করে। কিডোকে খোলা পিস্তলের সামনে ঘাবড়ে যেতে দেখে ঠিক ভরসা পেল না দালি। মনে হল, কিডো কি তবে ঠিকমতো কাজটা করেনি? দালি চোয়াল শক্ত করে তাকাল ফ্রেডির দিকে, "আমায় তুমি মারতে চাও?"

ফ্রেডি গেলাসটা ঠোঁটের কাছে নিল। হেসে, চোখ টিপে বলল, "এনি ডাউট?" তারপর পিট আর মুসার দিকে তাকিয়ে বলল, "লেটস ফিনিশ দিস ড্রিঙ্ক অ্যান্ড দেন ফিনিশ দেম। চিয়ার্স।"

"চিয়ার্স!" বলে দালির চোখের সামনে তিনজনে একসঙ্গে গেলাস উপুড় করল গলায়। শেষ। দালি জোরে শ্বাস নিয়ে চোখ বন্ধ করল। গুলির শব্দ কি আসবে এবার? নাকি...

ধপ, ধপ, ধপ। পরপর তিনটে ভোঁতা শব্দ হল একসঙ্গে। পিস্তলে সাইলেন্সর লাগানো ছিল কি? তবে কি ফ্রেডি কিডোকে মারল প্রথমে? চট করে চোখ খুলল দালি। আর সঙ্গে সঙ্গে অবাক হয়ে গেল নিমেষের জন্য। ফ্রেডি, পিট আর মুসা পড়ে আছে ছেঁড়া পুতুলের মতো। চোখ স্থির! মুখ খোলা! সাড় নেই শরীরে। দেখলেই বোঝা যায়, তারা মৃত।

দালি হাসল, তারপর মুখ ঘুরিয়ে কিডোকে বলল, "গুড জব ব্রো। এবার স্কুটারটা বের করো।"

কিডো হাসল একমুখ। পিঠের ব্যাগটা সামলে নিয়ে সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল। তারপর দৌড়ে গেল দরজার দিকে।

চারদিন আগে। দালির আস্তানায়।

"তোমার ভয় লাগছে না তো কিডো?" দালি জিজ্ঞেস করল।

"না তো," কিডো হাসল।

দালি দেখল ওকে। কত বয়স হবে ছেলেটার? বড়জোর একুশ বা বাইশ!

রোগা, বেঁটে। দেখতেও খুব সাধারণ। কিন্তু মনটা খুব ভাল। না হলে কেউ নিজের জীবন বিপন্ন করে অন্যের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে? দালি ফের জিজ্ঞেস করল, "ভেবে দ্যাখো, আমার সঙ্গে কাজ করলে কিন্তু খুব সমস্যায় পড়তে হতে পারে। জীবনও বিপন্ন হবে। ভাল করে আর-একবার ভেবে নাও।" কিডো হাত নাড়িয়ে যেন মাছি তাড়াল, "ধুর, এসব নিয়ে আমি ভাবি না। তুমি যা করতে বললে আমি ঠিক করতে পারব দেখে নিয়ো। শুধু সায়ানাইডটা ঠিক কাজ করবে তো? মানে শ্যাম্পেনের কর্কের ভিতর দিয়ে ওটাকে ইনজেক্ট তো করে দেব তরলে, কিন্তু ভেজাল হয় যদি? যদি খেয়ে না মরে?"

কিডোর বলার ভঙ্গি দেখে হাসি পেল দালির। সত্যিই বাচ্চা ছেলে! দালি বলল, "সেসব তুমি ভেবো না। তুমি মিশিয়ে রেখো, আর যখন বলব বের করে দেবে। আর হ্যাঁ, একটা স্কুটার লুকিয়ে রেখো আশপাশে। কাজে আসবে।"

কিডো মাথা নাড়ল। বলল, "আমার কেমন যেন এক্সাইটমেন্ট হচ্ছে!"

দালি হাসল, নরম গলায় বলল, "আসল সময়ের জন্য জমিয়ে রাখো ওটা। কাজে দেবে। কেমন?"

কিডোর কথা

স্কুটারটা একটা ভাঙা শেডের ভিতরে প্লাস্টিক দিয়ে ঢাকা ছিল। সেটা বের করে এনে সামনে রাখল কিডো। জায়গাটা শহর থেকে একটু দূরে আর খুবই নির্জন। তবু তাড়াতাড়ি করতে হবে। কিডো জানে নষ্ট করার মতো সময় ওর হাতে নেই। দালি ওয়্যার হাউসটা থেকে বেরিয়ে এল। কিডো দেখল ওর হাতে ওই ব্যাগটা। দালিকে দেখলে কখনওই মনে হয় না যে, ও এতটা নিষ্ঠুর হতে পারে! শান্ত ভদ্র দেখতে মানুষটা! কিন্তু দালি কোন ধাতুতে গড়া সেটা কিডো জানে।

দালি কাছে এসে বলল, "আর সময় নষ্ট করব না। ব্যাগটাকে চিফের

কথামতো আসল জায়গায় পৌঁছে দিয়ে বেরিয়ে পড়ব। কখন কে এসে যাবে কে জানে!”

“এক মিনিট,” কিডো হাত তুলল, “আমি একটা জিনিস বুঝতে পারছি না, ফ্রেডি আমাদের মারার মতো ভুল করতে যাচ্ছিল কেন? ও তো তোমার সঙ্গে এমন করার রিস্কটা না-ই নিতে পারত। হিরে তো পেয়েই গিয়েছিল। তবে?”

দালি হেসে কিডোর মাথার চুলটা ঘেঁটে দিল, “বোকা ছেলে। আরে, ও হিরে চুরি করেছিল কি বিক্রি করার জন্য নাকি? আর হিরেটাতে তো আমাদেরও শেয়ার ছিল! আমাদের শেয়ারটা দিতে চায়নি ও। এটা ব্লাড ডায়মন্ড। যদিও লিগ্যাল করে নেওয়া হয়েছিল কারচুপি করে। আর অনেক টাকার ইনশিয়োরেন্স করা ছিল এই হিরেগুলোর। ইনশিয়োরেন্সের টাকাটা কোম্পানিকে পাইয়ে দেওয়া আর হিরেগুলো নিয়ে কোম্পানির শ্যাডো ফান্ডে ফেরত দেওয়া... এই দুটো কাজ করতে চেয়েছিল ফ্রেডি। কোম্পানির কাছে টাকাও এল আবার হিরেটাও ফেরত পেয়ে গেল। ফ্রেডির প্রোমোশন কে আটকায়? আমাদের মারার পর ও পিট আর মুসাকেও মারত। কিন্তু ও বুঝতে পারেনি যে, দালিকে ওর দলে নেওয়া ঠিক হয়নি। একদম ঠিক হয়নি। তার উপর আমার শ্যাম্পেনটা খাওয়াও ওর মস্ত বড় ভুল হয়েছে। এই লাইনে কাউকে বিশ্বাস করতে নেই। বিশ্বাস মানেই এখানে মৃত্যু।”

কিডো হেসে ব্যাগ থেকে অরেঞ্জ জুসের বোতলটা বের করল। দালির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, “নাও অনেক চাপ গিয়েছে। এবার তোমার ড্রিঙ্কসটা খেয়ে, চলো, এই জায়গাটা ছেড়ে চলে যাই। কেউ যদি এসে পড়ে!”

দালি হেসে বোতলটা নিল। ঢাকনার প্যাঁচ খুলে বলল, “ডোন্ট ওরি, কেউ আসবে না। এটা গড ফরসেকেন প্লেস। তুমি স্কুটারটায় স্টার্ট দাও।”

কিডো পকেট থেকে চাবি বের করে স্কুটারের ইগনিশনে ঢুকিয়ে ঘোরাতে

ঘোরাতে দেখল দালি গলায় ঢালল জুসটা। লম্বা শ্বাস নিয়ে চোখ বন্ধ করল কিডো।

ধপ।

কিডো পিছনে ফিরল এবার। আকাশের দিকে স্থির চোখ করে মাটিতে পড়ে রয়েছে দালির নিথর দেহ। হাতের জুসের বোতলটা কাত হয়ে সায়ানাইড মেশানো জুস কমলা নদীর মতো বয়ে যাচ্ছে মাটিতে।

কিডো মাথা নাড়ল। মৃত্যু ভাল লাগে না ওর। কিন্তু উপায়ও নেই। দালির মতো মানুষকে বাঁচতে দেওয়া যায় না। অনেক কষ্ট করে এক বছর আগে দালির বিশ্বাস অর্জন করেছিল ও। কারণ দালিকে সরাতে হলে দালির ছায়া না হলে যে হবে না, সেটা ও বুঝেছিল।

বিশ্বাস! বিশ্বাস মানেই এখানেই মৃত্যু। দালি কেন যে এত বিশ্বাস করত কিডোকে! দালি বুঝতেই পারেনি যে, হিরে লুঠের সময় গাড়ির ভিতরে যে অরেঞ্জ জুসের বোতলটা বের করেছিল কিডো, ঠিক সেরকম আর একটা বোতলও ও সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল। শুধু পার্থক্য বলতে দ্বিতীয় বোতলটায় ছিল মৃত্যু!

কিডো দালির পাশ থেকে ব্যাগটা তুলে পকেট থেকে মোবাইলটা বের করল। তারপর একটা নম্বর ডায়াল করে কানে লাগাল।

ঘটনার দিন। চিফের ঘর।

ফোনটা বন্ধ করে হাসলেন চিফ। স্যামুয়েলের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আজ আর চা নয়। ব্রিং মি সাম ওয়াইন। উই শুড সেলিব্রেট।"

"মানে?" স্যামুয়েল থতমত খেয়ে গেল একটু। চিফকে এমন মুডে দেখা যায় না খুব-একটা। চিফ চা ছাড়া বিশেষ কিছুই খান না। আর আজ সেখানে ওয়াইন?

"মানেটা বুঝতে পারছ না? ওই ব্লাড ডায়মন্ডগুলো আসছে এবার

আমাদের হাতে। আমার ছেলেটি ভাল কাজ করেছে,” চিফ উঠে দাঁড়ালেন।

“ও,” স্যামুয়েল বিষণ্ণ মুখে তাকাল চিফের দিকে, “দালি তা হলে ছাড়াই পেয়ে যাবে একরকম? আমাদের লোককে মেরেও পার পেয়ে যাবে? কয়েকটা হিরের বিনিময়ে ওর মতো এমন এক ক্রিমিন্যাল পার পেয়ে যাবে?”

চিফ এবার সোজা তাকালেন স্যামুয়েলের দিকে, “তোমায় কি আমি বেশি মাথায় তুলে ফেলেছি?”

স্যামুয়েল থমকে গেল, “সরি স্যার। কিন্তু যা মনে হল...”

“আমাদের দু'জনকে দালি মেরেছে, সেটা আমি ভুলে গিয়েছি কে বলল তোমায়? আমার ছেলেদের কেউ মারবে আর তাকে আমি ছেড়ে দেব?”

“মানে?” স্যামুয়েল থতমত খেয়ে গেল।

“দালি ইজ় ডেড। আর হিরেও চলে এসেছে হাতে। আমি আর-একজন ছেলে ফিট করেছিলাম ওর সঙ্গে। একবছর আগে ওকে দালির কাছে প্ল্যান্ট করেছিলাম আমি। একটা ফেক অ্যাটাক করা হয়েছিল দালিকে। আর সেটার থেকে ওই ছেলেটাই বাঁচিয়েছিল দালিকে। দালি ওকে বিশ্বাস করত খুব। আর সেই সুযোগ নিয়ে ও-ই দালিকে সরিয়ে দিয়েছে,” চিফ স্যামুয়েলের দিকে তাকিয়ে হাসলেন।

“আর-একজন? এটা তো জানতাম না স্যার,” স্যামুয়েল অবাক হল।

“হাতি দেখেছ, সত্যিকারের হাতি? দেখলে জানতে ওদের দেখানোর দাঁত একরকম, কিন্তু খাওয়ার দাঁত অন্যরকম। আমায় যারা হাতি বলে তারা কিন্তু শুধু আমার এই শরীরের জন্য বলে না। সিনিয়র লোকজন আসলে হাতির গল্পটা জানে। তাই আমায় এমন নাম দিয়েছে। বুঝেছ?”

স্কুটারটা একটা স্ট্যান্ডে দাঁড় করিয়ে পাশের ময়লা ফেলার জায়গায় চাবিটা ফেলে দিল কিডো। এটার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। এটা ব্যবহার করা আর সেফ নয়। এবার পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ব্যবহার করবে ও। ওই শুনশান জায়গাটা থেকে শহরে আসতে প্রায় আধ ঘণ্টা মতো সময় লেগেছে কিডোর। ও ঘড়ি দেখল। চিফ, মিউজ়িয়ামের সামনে লোক পাঠাবেন ব্যাগটা তুলে নেওয়ার জন্য। আর দশ মিনিটের মতো সময় আছে।

কিডো দেখল সামনের বাসস্ট্যান্ডে একটা বাস এসে থামল। ওই দরজাটা খুলেছে। নম্বর দেখে বুঝল এটা মিউজ়িয়াম হয়েই যাবে। কপাল ভাল বাসটা ঠিক সময়ে এসে গিয়েছে। কিডো দৌড়ে গেল বাসটার দিকে। ড্রাইভার হাতল টেনে দরজাটা বন্ধ করে দিচ্ছিল প্রায় কিন্তু তার ফাঁকেই রোগা পাতলা চেহারাটা নিয়ে দরজা গলে বাসে ঢুকে পড়ল ও। তারপর একদম পিছনে গিয়ে ধপ করে বসে পড়ল একটা হিসপানিক মেয়ের পাশে। তারপর একদম নিজের মনেই কিডো বলল, "ওঃ, খুবজোর পেয়ে গেলাম বাসটা, বাব্বা।"

পাশের হিসপানিক দেখতে মেয়েটা ভুরু কুঁচকে তাকাল কিডোর দিকে তারপর পরিষ্কার বাংলায় বলল, "আপনি বাঙালি?"

কিডো চমকে উঠল, এখানেও বাঙালি! ও বলল, "আপনিও বাঙালি! আমি তো ভাবলাম হিসপানিক!"

মেয়েটা খিলখিল করে হেসে বলল, "ওঃ, এমন হঠাৎ করে বিদেশে বাঙালিদের দেখলে যে কী ভাল লাগে! বাই দ্য ওয়ে, আমার নাম পারুল। পারুল রয়। এখানে এক্সচেঞ্জ স্টুডেন্ট হিসেবে এসেছি। আপনি?

"কিডো," ও হাসল।

পারুল বলল, "সে তো ডাকনাম। আপনার ভাল নাম কী?"

"ভাল নাম?" কিডো দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাসল সামান্য। তারপর নরম স্বরে বলল, "আমার নাম, সেন, অদম্য সেন।"

হীরকখচিত

ইগর ডিমিট্রি সানগ্লাসটা মাথার উপর তুলে তাকাল লোকটার দিকে। কী বলছে লোকটা! মাথা ঠিক আছে তো? পনেরো পারসেন্ট? নব্বই মিলিয়ন ইউরোর পনেরো পারসেন্ট মানে সাড়ে তেরো মিলিয়ন ইউরো! কী ভেবেছে, যা খুশি তাই বলবে আর ওরা মেনে নেবে?

ইগর বলল, "দ্যাখো, আমরা সামান্য ক্যারিয়ার মাত্র। আমাদের সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই। আসল লোকদের সঙ্গে কথা বললে তোমার লাভ হবে। তবে আমি জানি, এত ইউরো কিছুতেই দেওয়া যাবে না।"

"তাই?" লোকটা হেসে ক্যাম্প চেয়ারে আর-একটু এলিয়ে বসল, "তোমরা নব্বই মিলিয়ন কামাবে আর আমি চোখ বন্ধ করে তোমাদের সেফ প্যাসেজ দেব! আবদারটা বাড়াবাড়ি হয়ে গেল না? এমআইসিক্স কি অন্ধ নাকি? গোটা মেক্যানিজ়মকে সামলাতে হবে আমার। সাড়ে তেরো মিলিয়ন ইউরো কি আমি একা খাব ভেবেছ? আই হ্যাভ টু ফিড সো মেনি মাউথস!"

"কিন্তু আমি তো..."

ইগরকে শেষ করতে দিল না লোকটা। বলল, "তোমরা যারা এক্স-স্টাজ়ি, তাদের এই এক প্রবলেম। বড্ড মিথ্যে কথা বলো তোমরা। আরে ক্যারিয়ার তো তোমার সঙ্গে টমাস এসপারসন। তুমি তার সঙ্গে থাকবে ওয়াচ হিসেবে। তোমাদের টিমের তুমি তিন নম্বর লোক। তুমি কথা দিতে পারছ না?"

ইগর চুপ করে থাকল কিছুক্ষণ। সত্যি, এদের থেকে কিছুই লুকিয়ে রাখা যাবে না। বলল, "প্লিজ়, মেক ইট টেন। তবে আমি কিছু করতে পারব।"

"টেন?" লোকটা হাসল। দূরের নদীর দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, "নামিবিয়ার এই অরেঞ্জ রিভারের বৈশিষ্ট্য জানো? এর পাড়ের ডায়মন্ড জোনের যে-কোনও পাথরই নাকি হিরে হতে পারে। তাই নামিবিয়ান সরকার সকলকে বারণ করে এখানে কোনও পাথর কুড়োতে। ভাবো, ইগর, তুমি হিরের মধ্যে বসে এমন ছোট কথা বলছ! টেন পারসেন্ট! আরে লাইফ হবে ডায়মন্ড-স্টাডেড, হীরকখচিত! আর তুমি এত ছোট কথা বলছ!"

ইগরের চৌকো মুখটা শক্ত হয়ে উঠল, "ওসব কাব্যি বাদ দাও। টেন হলেই শুধু কথা দিতে পারি।"

"ও কে," হাসল লোকটা, "তোমরা সেফ প্যাসেজ পাবে। টেন ইজ় ফাইন। তবে সেভেনটি পারসেন্ট পেমেন্ট আগে দিয়ে দিতে হবে। চলবে?"

"কোনও ডাবল গেম খেলবে না তো?" ইগর তাকাল লোকটার দিকে।

"বসে বসে টাকা পাব। গেম খেলে সেটা আমি নষ্ট করব কেন? তোমরা রাশিয়ানরা এত সন্দেহপ্রবণ হও!"

"আমি হাফ রাশিয়ান, হাফ জার্মান। ইস্ট জার্মানিতে বড় হয়েছি। আমি রাশিয়ান নই," ইগর শুধরে দিল।

লোকটা উঠল। পকেট থেকে নীল সানগ্লাসটা বের করে চোখে দিয়ে বলল, "সরি, ভুলে গিয়েছিলাম, ইস্ট জার্মান সিক্রেট পুলিশ, স্টাজ়ি-তে ছিলে তুমি। যাই হোক, আমার সুইস অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করে দিয়ো মানি। ট্রান্সফার কোড আমি দিয়ে দেব।"

ইগর দেখল, কথা শেষ করে লোকটা চলে যাচ্ছে। ও পকেট থেকে ফোনটা বের করল। নেটওয়ার্ক নেই। বিরক্ত লাগল ইগরের। একটা ফোন করা খুব জরুরি ছিল এইসময়!

১

জুরিখের এই লিম্মাত নদীর পাড় থেকে লোকদুটোকে ফলো করা শুরু করেছিল অদম্য। একজন লম্বা, প্রায় সাড়ে ছ'ফিট। ছোট করে কাটা সোনালি চুল আর চৌকো চোয়াল। ইগর ডিমিট্রিকে একহাজার লোকের মধ্যেও চেনা যায় ওর ওই দানবের মতো চেহারার জন্য। ওর সঙ্গের টমাস এসপারসন আবার ঠিক ওর বিপরীত। ছোটখাটো, রোগা চেহারা। মাথায় পাট করে আঁচড়ানো বাদামি চুল। সরু তরোয়ালের মতো গোঁফ। দেখলে মনে হয়, চল্লিশের হলিউড ফিল্ম থেকে নেমে এসেছে মাটিতে।

দু'জন হাঁটছে কাছাকাছি। টমাসের কাঁধে আড়াআড়ি ঝোলানো ব্যাগটা নড়ছে ওদের হাঁটার তালে। ব্যাগটা বাদামি রঙের। সামান্য লেদারের তৈরি। কিন্তু ওর পেটের ভিতরেই যে সাতরাজার ধন আছে, তা জানে অদম্য।

রাস্তায় ভিড় আছে বেশ। ইগররা হাঁটছেও খুব জোরে। লোকের সঙ্গে কোলিশন বাঁচিয়ে অদম্যও তাল মিলিয়ে চলেছে। সামনেই বড় হোটেল, লিম্মাত ভিউ। সেখানেই যাবে ওরা, অদম্য জানে। তাও চোখের আড়াল করা যাবে না। কখন যে এরা কী করবে, সেটা কেউ জানে না। অদম্যর হাতে সময় বেশি নেই। ওই ব্যাগটায় আছে নব্বই মিলিয়ন ইউরোর ব্লু ডায়মন্ড। মোট চল্লিশটা। এক-একটার দাম প্রায় আড়াই মিলিয়ন ইউরো। ওটা সরাতে হবে অদম্যকে। তারপর তুলে নিতে হবে ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স এসআইএস বা যাকে এমআইসিক্স বলে, তাদের হাতে। ওদের ডিরেক্টর ক্রিস্টোফার মে বা কিট চান কাজটা অদম্য করে দেয়। তার পরিবর্তে ও পাবে এক লাখ ইউরো।

টাকাটা দরকার অদম্যর। ফাদার ফ্রান্সিস, ছোটদের একটা ক্যান্সার ট্রিটমেন্ট ইন্সটিটিউট খুলেছেন। সেখানে ফান্ডের শর্টেজ হয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি অনেক টাকা লাগবে। তাই অদম্য নিয়েছে এই কাজটা। সামান্য চুরি হলেও এক লক্ষ ইউরো দেবে এই কাজ। তাই 'না' করতে পারেনি।

ছোট ছোট বাচ্চাদের মুখগুলো দেখলে খুব কষ্ট হয় ওর। মনে হয়, যেভাবে হোক এদের জন্য কিছু করতেই হবে।

লিম্মাত ভিউ হোটেলটা বেশ বড়। রিসেপশনের মেহগনি কাঠের কাউন্টারে দাঁড়ানো ইগরদের চেয়ে একটু দূরে দাঁড়াল অদম্য। দেখল, ওরা রিসেপশন থেকে ডিজিট্যাল কি নিচ্ছে। কালকেই এই জুরিখ শহর থেকে লন্ডনের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়বে ওরা। তার আগে কাজটা সারতে হবে অদম্যকে।

পকেটের ফোনটা সাইলেন্ট মোডেই নড়েচড়ে উঠল।

"ইয়েস," ফোনটা কানে লাগাল অদম্য। ওপাশে ক্রিস্টোফারের গলা শোনা গেল, "ওদের সঙ্গে আছ তো?"

"হ্যাঁ," ছোট্ট করে বলল অদম্য।

"তোমার উপর আমি নির্ভর করছি, অ্যাডাম। মনে রেখো, আমি বিশ্বাস করি তোমায়।"

কিটের ফোনটা কেটে পকেটে রাখল অদম্য। হাসি পেল ওর। বিশ্বাস! এমআইসিক্স ওকে বিশ্বাস করে! জোক অফ দ্য সেঞ্চুরি। কারণ, ও ঘাড় না ঘুরিয়েও বুঝতে পারছে, ওর চেয়ে কুড়ি ফিট দূরে দু'জন টুরিস্টের মতো দেখতে লোক ওর দিকে না তাকিয়েও, ওর দিকেই তাকিয়ে রয়েছে সবসময়।

২

"জন ডান! জানো তো, এই নামে একজন মেটাফিজ়িক্যাল পোয়েট ছিলেন," ক্রিস্টোফার মে ফোনটা কেটে, টেবলের উপর রেখে উলটোদিকে বসা জনের দিকে তাকাল।

জনের বয়স সাতাশ। এরই মধ্যে যথেষ্ট উন্নতি করেছে ছেলেটা। কিটের ভাল লাগে জনকে। মনে হয়, একদিন ওর মতো জনও এই এমআইসিক্স-এর

ডিরেক্টর হবে। জন মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ, স্যার, আমার তো ইংলিশে মেজর ছিল। ওঁর 'দ্য গুড-মরো' আমি পড়েছি। বাই দ্য ওয়ে, আপনি কেন একটা ক্রিমিনালকে অ্যাপয়েন্ট করলেন এই কাজটার জন্য?"

"ক্রিমিনাল? ইউ মিন অদম্য সেন, মানে অ্যাডাম?" হাসল কিট, "আমার সোনার চুল কি এমনি এমনি রুপো হয়েছে? শোনো, কিছু কাজ আছে যাতে আমাদের সরাসরি জড়িয়ে পড়তে নেই। কিন্তু কাজটাও করাতে হবে। তাই ওকে বলা। আমাদের কাজে লিগাল আর ইললিগালের বর্ডার লাইনটা খুব সূক্ষ্ম। সবসময় বোঝাও যায় না। নব্বই মিলিয়ন ইউরোর কনফ্লিক্ট ডায়মন্ড ইয়োরোপ হয়ে এশিয়ায় ঢুকবে সন্ত্রাসবাদীদের হাতে ওঠার জন্য। সেই দিয়ে ওরা অস্ত্র কিনবে। নাশকতা চালাবে। কিন্তু হিরেগুলো যে বেআইনি, তা আমাদের প্রমাণ করার উপায় নেই। সব নকল কাগজপত্র তৈরি করেছে ওরা। দে আর ভেরি ক্লেভার। তাই সহজ উপায়ে তো আর আমরা ওটা সরাতে পারব না। আমাদের এমন একজনকে চাই, যে ওটা ওদের নাকের ডগা দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে যাবে। চোরের উপর বাটপাড়ি। আর এই কাজে ওই বেঙ্গলি সো কলড ক্রিমিনালটাই আমাদের বাজি।"

"স্যার," জন বলল, ওর উপর ভরসা করা যায়? মানে, যদি ও নিজেই মেরে দেয় গোটাটা?"

"আমার দু'জন ওকে ওয়াচ করছে, জন। খুব সহজ নয় আমায় মেরে বেরোনো। তুমি তো রিসেন্টলি নামিবিয়ায় গিয়েছিলে। ওখানকার আর টোগো, বেনিন, সিয়েরা লিয়ন, কঙ্গো ইত্যাদি জায়গার খনিগুলো থেকে ছোটদের দিয়ে জোর করে হিরে তোলানো হয়। সে সব কেমন, তুমি দ্যাখোনি? ওদের ওয়ারলর্ডদের সঙ্গে সারা পৃথিবীর টেররিস্ট নেটওয়র্ক ভাঙতে না পারলে আমাদের খুব বিপদ। এত টাকার হিরে এই নেটওয়র্ককেই শক্তিশালী করবে। তাই এটাকে আটকাতেই হবে। তা ছাড়া দীর্ঘদিন ধরে এরা এসব চালাচ্ছে। কীভাবে যে এরা সেফ প্যাসেজ পাচ্ছে, কে জানে! এসব বন্ধ করতেই হবে আমাদের।"

জন চুপ করে মাথা নাড়ল। জানে, ও সবটাই জানে। খনি থেকে আসা হিরেগুলোকে আন্তর্জাতিক ছাড়পত্র বা 'কিম্বার্লি প্রসেস সার্টিফিকেশন স্কিম' নিতে হয় এটা প্রমাণ করার জন্য যে, ওগুলো সরকারি খনি থেকে সঠিক বয়সের ও মজুরির শ্রমিকদের দিয়ে তোলানো। কিন্তু এটাও ফুলপ্রুফ নয়। ঘুষ দিয়ে এই সার্টিফিকেট আকছার বের করা হচ্ছে। গোটা পশ্চিম আফ্রিকা জুড়েই বাচ্চা আর জোর করে ধরে আনা লোকদের হিরের খনির শ্রমিক বানিয়ে বেআইনিভাবে হিরে তোলানো একটা বড় ব্যাবসা। এসব করে ওখানকার ওয়ারলর্ডরা। যারা দেশের সরকারকে না মেনে এক-একটা জায়গা দখল করে নিয়ে বন্দুকের জোরে মাফিয়া রাজ চালায়। এভাবে আসা হিরেকে বলে ব্লাড ডায়মন্ড বা কনফ্লিক্ট ডায়মন্ড। সারা পৃথিবী জুড়ে এর চাহিদা আর যাতায়াত। জন জানে অন্যান্য রাষ্ট্রীয় সংস্থার মতো এমআইসিক্স-ও এর শেষ দেখতে চায়। ওদের ডিরেক্টর কিট তাই এর তদন্তের জন্য ওকে পাঠিয়েছিল নামিবিয়ায়। এখন সেই লক্ষ্যেই এই অ্যাডাম নামে লোকটাকেও বাছা হয়েছে।

জন বলল, "লোকটা একা পারবে?"

হাসল কিট, "ও না পারলে আর কেউ পারবে না। অ্যাডামের বয়স অল্প, চেহারাটাও খুব সাধারণ। কিন্তু লুকস আর অলওয়েজ ডিসেপটিভ।"

"ওরা এখন ঠিক কোথায় আছে?" জিজ্ঞেস করল জন।

"সেটা তো বলা যাবে না। এটা ক্লাসিফায়েড। বরং এখন তুমি এসো।"

কিটের ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের মনে হাসল জন। বলবে না! হাস্যকর! ওটা তো এমনি জিজ্ঞেস করেছে জন। ও কি আর জানে না, কোথায় আছে এখন ওরা! ও কি জানে না, লিম্মাত কোথাকার নদী!

টমাস উঠে দাঁড়াল, "সর্বনাশ, ব্যাগটা কোথায়, ইগর?"

"অ্যাঁ!" মুখে সবে এককামড় টিরগ্লেল নিয়েছে ইগর, কিন্তু টমাসের কথায় যেন বিষম খেল। শক্ত, পাতলা আর মিষ্টি ক্রিসমাস বিস্কিটগুলো খুব পছন্দ ইগরের। সুইজ়ারল্যান্ড এলেই এটা ও খায়। আজও কফি আর টিরগ্লেল নিয়ে বসেছিল লিম্মাত ভিউ-এর ক্যাফেটেরিয়ায়। কিন্তু টমাসের কথায় ঘাবড়ে গেল। বলল, "কেন? রুমে আছে।"

"রুমে?" টমাস কোলের ন্যাপকিনটা ছুড়ে টেবলে ফেলে উঠে দাঁড়াল, "এমন বুদ্ধি নিয়ে তোমায় কে রেখেছিল স্টাজ়িতে? তোমাদের ইস্ট জার্মানিতে সিক্রেট পুলিশে কাজ করার মতো লোক ছিল না? এমন দানবের মতো শরীরে হামিং বার্ডের ব্রেন কেন তোমার?"

ইগর মুখ মুছে উঠে দাঁড়াল, "আরে, ভয় নেই। টেন পারসেন্টের কথা তো হয়ে আছে সিক্রেট এজেন্সির সঙ্গে। কোনও প্রবলেম হবে না। আমরা সেফ প্যাসেজ পাব। ডোন্ট ওরি।"

"কিন্তু আমাদের রাইভালরা? তারা বসে থাকবে? আমার কাজ জিনিসটাকে সেফলি পৌঁছে দেওয়া। ইমিডিয়েটলি চলো রুমে। নিজেই ব্যাগটা নিয়ে এখন গুবলেট করছ!"

ইগরের বিরক্ত লাগল, "আরে বলছি ম্যানেজ করা আছে! ফালতু প্যানিক করছ!" টমাস ক্যাফে থেকে বেরিয়ে লাউঞ্জ পেরিয়ে লিফ্‌টের দিকে দৌড়োল। ইগর পকেট থেকে কয়েকটা সুইস ফ্রাঁ টেব্‌লে রেখে পিছু নিল টমাসের। জ্বালাতন!

লিফ্‌ট থেকে ফোর্থ ফ্লোরে নেমে করিডর ধরে এগিয়ে বাঁদিকে বাঁক নিলেই ওদের রুম। সেদিকে বাঁক নিল ওরা। আর নিয়েই চিৎকার করে উঠল টমাস, "ওই দ্যাখো গাধা! কতটা সেফ দ্যাখো!"

ইগর দেখল, রোগা-পাতলা চেহারা একটা এশিয়ান ছেলে হাতে নীল

ভেলভেটের ব্যাগ নিয়ে বেরোচ্ছে ওদের রুম থেকে। সর্বনাশ! ওই তো হিরের থলি। ওটাই তো ব্যাগে ছিল!

"ধরো ওকে। চোর! ধরো," টমাস চিৎকার করে দৌড় দিল এশিয়ান ছেলেটার দিকে। ছেলেটা কাঠবিড়ালীর মতো দ্রুত এদিকে না এসে ওপাশের লিফ্‌টের দিকে দৌড় দিল। এই হোটেলের লিফ্‌টগুলো সুপারফাস্ট। চড়লে, নীচে নামতে অল্প সময় লাগবে। সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে ধরা যাবে না। "ধরো ওকে!" টমাস আবার চেঁচিয়ে উঠল। ইগর দেখল, ওদিকে লিফ্‌টের সামনে একজন লম্বা-চওড়া বেলবয় আসছে। লোকটা হোটেলেই কাজ করে। টমাসের চিৎকার শুনে লোকটা সতর্ক হল। ক্যাচ ধরার মতো করে দাঁড়াল এশিয়ান ছেলেটাকে ধরবে বলে। ছেলেটা কাটাতে চেষ্টা করলেও, পারল না। বেলবয় দু'হাত দিয়ে জাপটে ধরল ছেলেটাকে। দু'জনে গড়িয়ে পড়ল মাটিতে।

"আমরা আসছি। ওকে ছেড়ো না!" টমাস চিৎকার করল আবার। ও দেখল, পড়ে থাকা এশিয়ানটার দু'হাতের মধ্যে লিফ্‌ট। আর সেটার দরজা এবার খুলে গেল। একজন মেয়ে বেরিয়ে এসে করিডরের অবস্থা দেখে ঘাবড়ে গেল খুব।

এশিয়ান ছেলেটা কী করল, কে জানে। বেলবয়টার দুটো হাত হঠাৎ ছেড়ে দিল ছেলেটাকে আর ছেলেটা প্রায় পিছলে লিফ্‌টে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। ঠিক সেই সময় টমাস গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল বন্ধ দরজার উপর, "একটুর জন্য ধরা গেল না!" টমাস বিরক্তি নিয়ে তাকাল বেলবয়টার দিকে। এত বড় চেহারা আর একটা পুঁচকে ছেলেকে ধরতে পারল না!

টমাস কিন্তু দাঁড়াল না। পকেট থেকে ফোন বের করে একটা নম্বর ডায়াল করল দ্রুত। তারপর কানে ধরে বলল, "রোগা এশিয়ান। ব্রাউন কোট, ক্রিম ট্রাউজ়ার। নীচে নেমেছে। হোটেল থেকে বেরোলেই ধরবে। আমরা আসছি।"

ইগর থতমত খেয়ে তাকাল টমাসের দিকে। টমাস বলল, "তুমি কী

ভেবেছ? বাইরে আমার লোককে আমি পাহারায় রাখিনি? আমি বেআইনি মালের ক্যারিয়ার। আমায় সাবধানে কাজ করতেই হয়। বুঝলে, মিস্টার থিকহেড!"

৪

নীল থলিটাকে বুকের কাছে চেপে ধরে সামনে দাঁড়ানো পাহাড়ের মতো লোকদুটোকে দেখল অদম্য। এরা এল কোত্থেকে! মাটি ফুঁড়ে উঠল নাকি দু'জন! আলপ্স তো দূরে। এই দুটো পাহাড় তা হলে কী করে এল এখানে?

জার্মান ভাষায় নিজেদের মধ্যে কথা বলে দু'জন দু'দিক থেকে চেপে ধরল অদম্যকে। তারপর ভাঙা ইংরেজিতে বলল, "দিয়ে দে ওই নীল থলিটা, দে।"

অদম্য তাকাল। জার্মান ভাষায় বলল, "কী দেব? নীল থলিতে তো আমার মায়ের স্মৃতিচিহ্ন আছে।"

"স্মৃতিচিহ্ন? ওটাই দে।'

অদম্য দেখল, দরজা দিয়ে ইগর আর টমাস আসছে ওর দিকে। সর্বনাশ! কী করবে? ঠিক তখনই সাদা সবুজের গাড়িটাকে দেখল অদম্য। ক্যানটনাল পুলিশ। টহল দিচ্ছে। অদম্য দু'জন বিশাল মানুষের মাঝে প্রায় চাপা পড়তে পড়তে চিৎকার করল, "বিটে হেলফেন সি। প্লিজ় হেল্প!"

লোকদুটো ঘাবড়ে গিয়ে তাকাল পুলিশের গাড়ির দিকে। অদম্য দেখল, পুলিশ দেখে ইগররাও দাঁড়িয়ে পড়েছে দূরে।

দু'জন পুলিশ এগিয়ে এল ওদের দিকে, "কী ব্যাপার? কী করছ তোমরা? ওকে ধরেছ কেন?"

অদম্যর বাঁদিকের লোকটা আমতা আমতা করে বলল, "ও আমাদের জিনিস নিয়ে পালাচ্ছে।"

"কী জিনিস?"

অদম্য তাড়াতাড়ি বলল, "আমার মায়ের লকেট, স্যার। ওদের কিছু না। ওরা অন্য কারও সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছে আমায়।"

লোকদুটো কী বলবে বুঝতে না পেরে এ ওর দিকে তাকাল। তারপর ছেড়ে দিল অদম্যকে। পুলিশ বলল, "দেখি, কী আছে ওতে।"

অদম্য থলিটা উপুড় করল হাতের পাতায়। আর পুলিশের সঙ্গে ওই দুটো লোক দেখল, ওর হাতের পাতায় রুপোর একটা বড় লকেট!

"আরে, সত্যি তো," পুলিশ লোকগুলোকে বলল, "এসব কী? ওকে তোমরা হ্যারাস করছ কেন? দেখি, তোমাদের পাসপোর্ট দেখি তো?"

অদম্য বলল, "আমার কাছে পাসপোর্ট আছে, দেব?"

দু'জন পুলিশকর্মী মাথা নাড়ল, "নো, ইউ মে গো।"

অদম্য হাসল। দূরে দাঁড়ানো টমাসের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝোঁকাল সামান্য। তারপর সামনে দিয়ে যাওয়া একটা ট্রলিবাসে উঠে গেল দৌড়ে।

বাসটা চলছে। ভিতরে কয়েকজন মানুষ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে। ও পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল বাসের পিছনদিকে। তারপর একটা কোনার সিট দেখে বসল।

দুটো স্টপেজ পর সোয়েট শার্ট পরা একটা লোক উঠল বাসে। শার্টের হুডটা তার মাথায় দেওয়া। সে শান্ত পায়ে এসে পাশে বসল অদম্যর। তারপর পকেট থেকে একটা প্যাকেট বের করে দিল তাকে। বলল, "এই নাও।"

উঠে দাঁড়িয়ে দেড়হাজার ফ্রাঁ-র একটা গুচ্ছ লোকটার হাতে গুঁজে দিল অদম্য। তারপর হেঁটে দরজার দিকে যেতে যেতে বলল, "হোটেলের করিডরে আমাকে ধরার ভালই অ্যাক্টিং করলে। লিম্মাত ভিউয়ের বেলবয়ের চাকরি ছেড়ে হলিউডে ট্রাই করতে পারো!"

লোকটা হাসল, "তুমিও তো পারো ম্যাজিক দেখাতে। যেভাবে আমার

সঙ্গে মারামারির অভিনয় করতে করতে নীল থলি থেকে দরকারি পুঁটলিটা বের করে আমার পকেটে গুঁজে দিলে... গ্রেট ম্যাজিক!"

৫

"হ্যালো, অ্যাডাম, কাজ হয়েছে?" কিট জিজ্ঞেস করল।

"হয়েছে," বলল অদম্য, "আপনি রেডি?"

কিট হাসল, "অলওয়েজ়। যেমন বলেছি, তেমন চার্চের কাছে থাকব।"

"শিয়োর," অদম্য কেটে দিল ফোনটা। করিডর ধরে হেঁটে অফিসের দিকে চলে গেল ক্রিস্টোফার। আর ঠিক তারপরই প্যাসেজের পাশের ক্লিনার্স রুমের দরজাটা খুলে গেল একটু। দুটো চোখ দেখল কিটের চলে যাওয়া। লোকটা হাসল নিজের মনে। তারপর ফোনটা বের করে ডায়াল করল। এই কলটা ভীষণ জরুরি।

৬

ট্রলিবাস থেকে নেমে ছোট যে গলিটায় ঢুকল অদম্য, সেখানে মানুষের যাতায়াত যে তেমন নেই, তা বেশ বোঝা যায়। বড় একটা গার্বেজ বিনের পাশে ছোট্ট টু-সিটার গাড়িটা রাখা ছিল। সেটার দরজা খুলে ভিতরটা দেখল ও। না, কেউ নেই। এখনই এই হিরে দিয়ে দিতে হবে ক্রিস্টোফার মে-কে। জুরিখ থেকে কিছুটা দূরে একটা গ্রামের পথে বড় চার্চের পাশে দাঁড়িয়ে থাকবে কিট। এক হাতে একলক্ষ ইউরো দেবে, আর অন্য হাতে নিয়ে নেবে ওই হিরে।

অদম্য জানে, এটা নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা বৃথা। এমআইসিক্স-এর হাত খুব লম্বা। তা ছাড়া ওরা দরকার মতো সিআইএ আর ইজ়রায়েলি সিক্রেট সার্ভিস, মোসাদ-এরও সাহায্য নেবে। এতগুলো চোখ ফাঁকি দিয়ে ও এই হিরে হজম করতে পারবে না। তা ছাড়া, ওয়র্ক এথিকস বলেও তো কিছু আছে। যা টাকা নেবে বলেছে, তার বাইরে কিচ্ছু নেবে না।

গাড়ির ভিতরটা দেখে নিয়ে অদম্য গাড়িতে উঠতে যাবে, ঠিক তখনই পিছনে আলতো পায়ের শব্দ পেল ও। ওর ছ'নম্বর ইন্দ্রিয়টা ওকে বিপদের ইঙ্গিত পাঠাল। ড্যাশবোর্ডের স্টিলের পাতে ও দুটো লম্বাটে ছায়া দেখল। তাদের হাতে...

দুম! দুম! দুটো গুলির শব্দ। লম্বাটে ছায়াগুলো এঁকেবেঁকে গেল। তারপর ধপ করে শব্দ হল। পিস্তলটা নামিয়ে নিজের কোটটা দেখল অদম্য। দুটো ফুটো হয়েছে। আসলে পিছনে ঘোরার তো সময় ছিল না। ওই ছায়া দেখেই কোটের ভিতরে হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে, নিজের পিঠের দিক থেকে গুলি করেছে দু'বার। অদম্য পিছন ফিরল। সরু কালচে-লাল রক্তের ধারা লোকদুটোর মাথা থেকে বইছে। গতকাল থেকে এই দুটো লোক ফলো করছে ওকে। মারার ইচ্ছে ছিল না। ওদের পাশে পড়ে থাকা দুটো খোলা পিস্তল দেখে বোঝাই যাচ্ছে, ওরা কী করতে এসেছিল।

অদম্য লাশ দুটোর দিকে তাকিয়ে ভাবল কিছুক্ষণ। তারপর গাড়ির সামনের একটা সিট উঠিয়ে পিছনে রাখা একটা বড় প্যাকেট আর বাক্স বের করল। খেলাটা পালটেছে মনে হচ্ছে। তাই ওকেও প্রস্তুত হতে হবে। চারদিক দেখে অদম্য দ্রুত জামা খুলতে শুরু করল। কেউ এই পথে এসে পড়ার আগেই ওকে কাজ সারতে হবে।

ছোট্ট গাড়িটাকে খুব জোরে ব্রেক কষে দাঁড় করিয়ে দিল অদম্য। কী বিপদ! রাস্তার উপর একপাল ভেড়া যে! হলদেটে ভেড়ার মাঝে হাতে বড় একটা লাঠি নিয়ে বসে রয়েছে মেষপালকটি।

অদম্য জোরে জোরে হর্ন দিল কয়েকবার। সরছে না কিছুতেই। কী বিপদ রে বাবা! ওর যে দেরি হয়ে যাচ্ছে! নাহ, সামনে গিয়ে দেখতে হচ্ছে।

গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে গেল অদম্য। জার্মান ভাষায় বলল, "ওহে, শুনতে পাচ্ছ না? ভেড়াদের হটাও। আমায় যেতে হবে।" লোকটা লাঠিটা নিয়ে ঘুরল। এক মুহূর্ত মাত্র। মেঘভাঙা আলোয় লোকটার হাতে ঝিলিক দিয়ে ওঠা নলটা দেখতে পেল অদম্য। পকেটে হাত দিতে গেল ও। ফট! ফট! রাস্তার পাশে থেকে দূরে ছিটকে পড়ল অদম্য। রক্ত চলকে উঠল ওর বুক আর পেট থেকে। সবুজ ঘাসের উপর চোখ বুজে নিথর হয়ে পড়ে রইল ও। জ্যাকেটের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ল বড় ভেলভেটের থলি। লোকটা এগিয়ে এসে ঝুঁকে বড় থলিটাকে বের করে নিল। তারপর পা দিয়ে অল্প নাড়িয়ে দেখল অদম্যকে। হ্যাঁ, নিথর শরীর। হাসল লোকটা। কাজ হয়েছে। টেন পারসেন্ট! নাইন মিলিয়ান ইউরো! হুঁঃ, যখন গোটাটাই পাবে, তখন কে নেবে টেন পারসেন্ট?

গাড়িটার দিকে এগিয়ে গেল লোকটা। দরজা খুলে ভিতরে বসে অল্প ফাঁক করল প্যাকেটটা। ঝলমল করছে হিরে, ওর জীবন! সত্যি তো, জীবন হবে হীরকখচিত! লোকটা গাড়ির দরজা বন্ধ করে স্টার্ট করল ইঞ্জিন। তারপর পাশের মাঠের মধ্যে দিয়ে চালিয়ে ভেড়াগুলোকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল।

গাড়িটা যাচ্ছে। ওই যাচ্ছে। নিথর দেহটা নড়ে উঠল হঠাৎ। তারপর লম্বা করে শ্বাস টেনে ঘাসের উপর উঠে বসল অদম্য। হাতে চটচট করছে কৃত্রিম রক্ত। এবার গায়ের বড় জ্যাকেট আর জামার ভিতরের বুলেটপ্রুফ ভেস্টটা টেনে খুলল ও। তার ভিতর থেকে বের করে আনল একটা ছোট্ট মোবাইলের মতো দেখতে রিমোট। রিমোটের স্ক্রিনে লাল আলো দপদপ করছে। আর দেখাচ্ছে কতদূরে সরে যাচ্ছে গাড়িটা।

হাসল অদম্য। গুলি করে সবসময় ভাল করে চেক করতে হয়। কখনও নেড়ে দেখে নিশ্চিন্ত হতে নেই। যতই তাড়া থাকুক, চেক করতেই হয়।

অদম্য তাকিয়ে দেখল, নির্জন পথ দিয়ে দ্রুত চলে যাচ্ছে ছোট্ট গাড়ি। খুব তাড়া আছে, না? তবে যা! রিমোটের বোতামটায় আলতো করে চাপ দিল ও।

ছোট্ট গাড়িটা বিস্ফোরণে ছিটকে উঠল মাটি থেকে। তারপর উলটে ডিগবাজি খেয়ে ধাক্কা লাগল পাশের ওক গাছে।

কিছুক্ষণ পর অদম্য গিয়ে দাঁড়াল গাড়ির সামনে। সামনের দরজা খুলে অর্ধেক বের হয়ে আছে লোকটা। নীচের অংশটা যেন কেউ ছিঁড়ে নিয়েছে। তবে সারা শরীরে গেঁথে আছে বোমার শার্পনেল আর হিরে। লাল-কালো ক্ষতের ভিতরে সারা শরীরে লোহার শার্পনেলের সঙ্গে বিঁধে আছে জ্বলজ্বলে চল্লিশটা হিরে।

হাসল অদম্য। ওকে মারার চেষ্টা? এখন কে মারল কাকে? মৃত, ঝলসানো লোকটার দিকে তাকাল অদম্য। বলল, "আপনি না বলতেন, 'জীবন হবে হীরকখচিত!' কিন্তু আপনার মতো বিশ্বাসঘাতকের জন্য আমি হীরকখচিত মৃত্যু দিলাম, বুঝলেন, মিস্টার ক্রিস্টোফার মে! আপনার মৃত্যুই প্রাপ্য ছিল।"

পা দিয়ে মাড়িয়ে সম্পূর্ণ ভেঙে দিল পাশে পড়ে থাকা কিটের অর্ধেক

ভাঙা নীল সানগ্লাসটা। ঠিক সেইসময় পিছনে এসে দাঁড়াল একটা গাড়ি। তার জানলা দিয়ে মুখ বাড়াল একজন। তারপর দরজাটা খুলে দিয়ে অদম্যকে বলল, "কাম, হপ ইন কুইক।"

৯

আলপসের পায়ের কাছে এসে গাড়ি থামাল লোকটা। তারপর বলল, "নাও, এবার তুমি সেফ। যাও।"

লোকটার দিকে তাকিয়ে হাসল অদম্য, "থ্যাঙ্ক ইউ, ইগর।"

ইগর গাড়ি থেকে নেমে জড়িয়ে ধরল ওকে। তারপর হেসে বলল, "সাবধানে যেয়ো।"

"তুমিও," বলল অদম্য, "তোমার এখনও বহু কাজ বাকি।"

গাড়িটা বেরিয়ে যেতে নিজেকে অনেক হালকা লাগল অদম্যর। পকেটের ফোনটা পিঁকপিঁক করে ওঠায় বের করে দেখল, মেসেজ এসেছে। পাঠিয়েছে জন ডান। লিখেছে, জব ওয়েল ডান। টাকা চলে গিয়েছে তোমার অ্যাকাউন্টে। ফোনটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখল অদম্য। খুব বুদ্ধিমান এই জন ছেলেটি। ওদের কাছে খবর ছিল যে, এমআইসিক্স-এরই কেউ এই কনফ্লিক্ট ডায়মন্ডগুলোকে সেফ প্যাসেজ দিচ্ছে। তাই ভিতরে ভিতরে ওরা তদন্ত করছিল। আর এই ব্যাপারে জনকে সাহায্য করছিল ইগর ডিমিট্রি নামে মোসাদের চর, যে হিরের ওই স্মাগলিং র‍্যাকেটের ভিতরে স্পাই হয়ে ঢুকে কাজ করছে। নামিবিয়ায় জনকে পাঠিয়েছিল কিট। কিন্তু তলায় তলায় ও নিজেও গিয়েছিল। সেটা ইগর জানিয়ে দেয় জনকে।

কিট, অদম্যকে যোগাযোগ করলেও, জন অদম্যর সঙ্গে সকলের অলক্ষ্যে আর-একটা সমঝোতা করেছিল। ওকে বরাবর সাহায্য করছিল ইগর। ইগর ইচ্ছে করেই হিরেগুলো ছেড়ে রেখেছিল হোটেলের ঘরে।

ইচ্ছে করেই অদম্য বাসে করে পালাবার পর ওকে আর তাড়া করেনি। শেষমেশ কাজ হয়ে গিয়েছে শুনে জনের ফোন পেয়ে ফলো করেছিল অদম্যকে।

অদম্যও ওই লোকদুটোকে মারার পর বুঝেছিল, কিট শুধু লক্ষ করার জন্য ওদের ওর পিছনে লাগায়নি। মারার জন্যই লাগিয়েছে। তাই গাড়ি থেকে বুলেটপ্রুফ ভেস্ট বের করে পরে নিয়েছিল। তারপর বাক্স থেকে আরডিএক্স আর ডেটোনেটর বের করে তৈরি করেছিল বোমা। যাতে ও লোহার স্পাইকের সঙ্গে শার্পনেল হিসেবে ব্যবহার করেছিল ওই ধারালোভাবে কাটা উজ্জ্বল হিরেগুলোও! টাকা এসে গিয়েছে। তবে ক্যান্সার হাসপাতালের জন্য আরও দরকার। অদম্য ভাবল, ওই হিরের কয়েকটা যদি ও পেত! কিন্তু ওই যে, ওয়র্ক এথিকস! নিজের মনে হাসল অদম্য। সামনে আরও অনেক কাজ করতে হবে। বাচ্চাদের জন্য করতে হবে ওকে, একা। আলপ্‌সের ঠান্ডা হাওয়ায় শীত করে উঠল ওর। হাতদুটোকে জ্যাকেটের পকেটে ঢুকিয়ে নিল ও।

আরে, এটা কী? পকেট থেকে একটা প্যাকেট বের করে দেখল অদম্য। প্যাকেটের মুখটা খুলে হাতের উপর উপুড় করল ও। নরম আলোর ভিতরেও কী অদ্ভুত ঝিলিক দিয়ে উঠল চারটে পাথর! নিখুঁতভাবে কাটা ডায়মন্ড! সঙ্গে একটা ছোট্ট চিরকুট। অদম্য দেখল তাতে লেখা, জীবন হোক হীরকখচিত। শুভেচ্ছা ইগর! পুনশ্চ: এমন ম্যাজিক শুধু তুমিই জানো না। আমিও পারি।

বিস্ফোরণের উৎসবে

ডক ছাড়িয়ে আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে থমকে দাঁড়াল আদিল। এদিকটা শুনশান। দূরে ডকের জাহাজ, আর বড় বড় ক্রেনগুলোকে দৈত্যের হাতের মতো লাগছে। পুজোর রোশনাইয়ের শহরে এই দিকটা কেমন যেন অন্ধকার আর নির্জন। ঝিঁঝির ডাকও এখানে স্পষ্ট। আদিল জানে না, সামনে কী আছে। শুধু জানে ওকে এগোতে হবে। এই শহর আর এই দেশের জন্য ওকে এগোতেই হবে সামনে।

এর কিছুদিন আগে...

১

মুজাফফরাবাদ, পাক অধিকৃত কাশ্মীর

কর্নেল শ্যাঙ ওয়েই সোজা হয়ে বসলেন। সামনের টেবিলে রাখা টুপিটা তুলে নিলেন হাতে। যা কথা হওয়ার হয়ে গিয়েছে। এবার উঠলেই হয়।

"আপনি কি উঠবেন?" আই এস আই কোর কমান্ডার লতিফ শেখ জিজ্ঞেস করলেন, "আমাদের প্রশ্নের উত্তরটা না দিয়েই উঠবেন? গিলগিট-বালটিস্তানে যে রেললাইন তৈরি করছেন আপনারা, তাতে বাইশটা

গোপন সুড়ঙ্গ তৈরি করাচ্ছেন। আমাদের দেশে এই কাজটা করছেন আর আমাদেরই সেখানে ঢুকতে দিচ্ছেন না! কেন করছেন এটা?”

শ্যাঙ ঠান্ডা চোখে তাকালেন লতিফের দিকে। তারপর কেটে কেটে ভাঙা ইংরেজিতে বললেন, “আপনাদের যে কাজটা দিলাম, সেটা করে দিন। কথামতো ডলার পেয়ে যাবেন। ডোন্ট আস্ক ফর মোর।”

লতিফ হাসলেন, “মোর ইজ লেস। আমাদের কী চাই, আমরা জানি। সকলকে আপনারা বলছেন যে, সুড়ঙ্গ আপনারা তৈরি করাচ্ছেন ইরান থেকে পাইপে করে তেল আনাবেন বলে। কিন্তু আমরা জানি, তা নয়। ওতে আপনারা অন্য কিছু করবেন। সম্ভবত, ওতে কোনও নিউক্লিয়ার ওয়্যারহেড রাখবেন। আমাদের সেটার অ্যাকসেস চাই।”

শ্যাঙ ছোট চোখদুটো নামিয়ে টেবিলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। চোয়াল শক্ত। মুজাফফরাবাদের আবহাওয়া এই অক্টোবরে বেশ ঠান্ডা থাকে। মুজাফফরাবাদ হল আজাদ কাশ্মীরের রাজধানী। পাকিস্তানিরা আজাদ কাশ্মীর বললেও ভারতীয়রা কিন্তু বলে পাক অধিকৃত কাশ্মীর। তবে কে কী বলল তাতে বেজিং-এর যে কিচ্ছু এসে যায় না, সেটা কর্নেল শ্যাঙ ওয়েই ভালই জানেন। বেজিং শুধু নিজেরটা বোঝে। বোঝে, সামনের দিনগুলোয় পৃথিবীতে এই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। তাই তাকে মুঠোয় রাখতে পারলে এত জনসংখ্যার ভার নিয়েও চিন নত হয়ে পড়বে না। ফলে যে-কোনও উপায়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে নিজের হাতের মধ্যে রাখতেই হবে বেজিঙকে। আর এই পথে সবচেয়ে বড় বাধা হল ভারত। তাই বেজিং থেকে ‘পিপলস লিবারেশন আর্মি’-র মাথারা একটা দায়িত্ব দিয়েছেন কর্নেল শ্যাঙকে। সেই কাজেই ওঁর আসা লতিফ শেখের কাছে।

“এটা কি ঠিক বিজনেস টার্মস হল?” শ্যাঙ তাকালেন লতিফের দিকে।

লতিফ হাসলেন, “আপনাদের মনের মতো না হলেই কি সেটা ভুল? ডলার প্লাস ইনফো। তবেই কাজ হবে। না হলে...”

শ্যাঙ চোয়াল শক্ত করে বললেন, “আবার টোয়েন্টি সিক্স-ইলেভেন মুম্বইয়ের মতো সব ছড়াবেন না তো? তা হলে কিন্তু....”

লতিফ হাসলেন, “সবটা ছড়াইনি কিন্তু। তবে এবার অনেক ছোট, কিন্তু এফেক্টিভ গ্রুপ নিয়ে কাজ করব। শুধু আপনি আমাদের শর্তে...”

“ওকে। ডান,” শ্যাঙ উঠে হাত বাড়িয়ে দিলেন লতিফের দিকে।

লতিফ হাতটা ঝাঁকিয়ে বললেন, “ব্যস। কাজ হয়ে যাবে। তেওহার কি শহর নয়া রওশনি দেখেগি।”

আই এস আই-এর অফিস থেকে বেরিয়ে কর্নেল শ্যাঙ নিজের মোবাইলটা বের করে একটা নম্বর টিপে স্পিড ডায়াল করলেন। বেজিঙের একটা উঁচু বাড়ির কুড়ি তলায় বেজে উঠল আর-একটা ফোন।

সেলটা কানে লাগিয়ে শ্যাঙ বললেন, “কাজ হয়েছে। দ্য বল ইজ রোলিং।”

২

ফিস, অস্ট্রিয়া

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সাড়ে চার হাজার ফিটেরও বেশি উচ্চতায় অবস্থিত ফিস একটা ছোট্ট অস্ট্রিয়ান গ্রাম। বরফ, পাহাড় আর অদ্ভুত সুন্দর এক পৃথিবী যেন এসে থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছে ফিসে। সাধারণত এটা টুরিস্ট স্পট হিসেবেই লোকে দেখে। স্কিয়িং-এর জন্য ইয়োরোপের নানা প্রান্ত থেকে লোক আসে এই ফিস গ্রামে।

গ্রামটা ছোট্ট। ঢেউ খেলানো পাহাড় আর উপত্যকায় ছড়িয়ে আছে ছোট্ট সুন্দর গ্রামের কাঠের বাড়িগুলো। গ্রামের শেষপ্রান্তে একটা পাহাড়ের ধারে রয়েছে এখানকার একমাত্র ক্যাথলিক চার্চ। সেখানে একটা ছোট্ট

অরফ্যানেজ আর স্কুল আছে। চার্চের মাথায় আটকানো বিশাল ঘণ্টা সন্ধেবেলায় একবার করে বেজে ওঠে আর ফিসের লোকদের জানান দেয় যে, প্রভু যিশুর কথা শোনার সময় হয়ে এল।

বিশাল ঘণ্টার ধ্বনি পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে সারা গ্রামে। আর সন্ধের ঠিক পরেই মানুষেরা হাতে ছোট্ট তেলের কুপি নিয়ে সার বেঁধে চলে আসে চার্চে।

ইয়েনসকেও রোজ মায়ের সঙ্গে যেতে হয় চার্চে। ওর ভাল লাগে না খুব একটা। তবু মা বকবে বলে ও যায়। শুধু রোববারে ওর চার্চে যেতে ভাল লাগে। সেদিন সারমনের পর ফাদার সব বাচ্চাদের পেস্ট্রি দেন।

আজ রোববার। সকাল থেকে মেঘ করে আছে খুব। মেঘলা দিনে ওদের ফিসে সারাদিন খুব হাওয়া বয়। আজও তেমন একটা পাগল হাওয়ার দিন।

মা, আন্ট এম্মালিনার কাছ থেকে সোজা চলে যাবে চার্চে। আর ইয়েনসকে বলে গিয়েছে যেন সময়মতো চলে আসে ওখানে।

আজ বিকেলে ফুটবল ম্যাচ আছে। তাই চার্চের প্রেয়ার সেরেই ইয়েনস চলে যাবে ক্লাবে। খেলার কিট গুছিয়ে বেরোতে বেশ দেরি হয়ে গিয়েছে ওর। চার্চে সময়মতো না পৌঁছোলে মা খুব বকবে।

বড়রাস্তা দিয়ে সাইকেলটা জোরে ছুটিয়ে দিল ইয়েনস। চার্চে সময়মতো পৌঁছোতে হলে একটু জোরেই চালাতে হবে সাইকেল।

আচমকা পিছন থেকে একটা এস ইউ ভি হুড়মুড় করে এসে থামল ওর পাশে। কোনও হর্ন দেয়নি গাড়িটা। ইয়েনস খুব চমকে গিয়েছে। ও সাইকেল থামিয়ে দেখল দু'জন বসে রয়েছে সামনের সিটে।

ড্রাইভারটা পাশে বসা বিশাল চেহারার লোকটাকে বলল, "ব্রুনো, জিজ্ঞেস করো চার্চটা কোথায়?"

ব্রুনো কোনও কথা না বলে ইয়েনসের দিকে তাকিয়ে ভুরু তুলল শুধু।

ইয়েনস বলল, "এই রাস্তায় সোজা গিয়ে বাঁদিকে গেলেই চার্চ।"

লোকগুলো মাথা নাড়িয়ে আবার হুস করে বেরিয়ে গেল। ইয়েনস অবাক হয়ে দেখল, লোকগুলো একটা থ্যাঙ্কস পর্যন্ত জানাল না!

ইয়েনস আবার সাইকেল চালাতে শুরু করল।

চার্চের কাছে এসে দেখল, সেই এস ইউ ভি-টা উলটোদিক দিয়ে ঝড়ের বেগে এসে ওকে পার করে চলে গেল গ্রামের অন্যদিকে। তবে এবার ড্রাইভারটাই আছে একা। পাশের সেই ব্রুনো বলে লোকটা আর নেই।

ইয়েনস পিছন ফিরে গাড়িটাকে দেখল একটু, তারপর আবার ছুটিয়ে দিল সাইকেল। তবে তখনও ও জানে না যে, আজ চার্চে গিয়ে শুনবে প্রেয়ার হবে না। জানে না যে, সানডে পেস্ট্রিটা আজ মিস হয়ে গেল।

৩

কলকাতা, মহাষষ্ঠী

ডোমেস্টিক এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াল ও। রাস্তায় বেশ ভিড়। পুজোর কলকাতা বলে কথা। এমনটা তো হবেই। কত মানুষ ঘরে ফিরছে! নিশ্চিন্তে আনন্দ করতে ফিরছে যে যার প্রিয়জনের কাছে। মানুষগুলোর দিকে ও তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। শরতের রোদে সবটাই কেমন যেন সুন্দর আর নতুন রং করা বাড়ির মতো লাগছে। ও ভাবল, এরা কি জানে ওদের জন্য সামনে কী অপেক্ষা করে রয়েছে? ওরা কি জানে, এই যে ও সকলের মধ্যে মিশে বহুদিন পরে ঘরে ফেরা মানুষের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে, আসলে ও কে!

বহুদিন পরে পুজোর কলকাতায় ফিরল ও। তবে ভাবেনি, এমন অবস্থার মধ্যে ফিরবে। হাতের মুঠোটা শক্ত করে নিল ও। সামনে এখন অনেক কাজ।

দূরে একটা বছর বাইশের ছেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। নীল শার্ট আর জিন্‌স। হাতে একটা প্ল্যাকার্ড। তাতে বড় বড় করে লেখা 'প্রিমো উওমো।' ও এগিয়ে গেল ছেলেটার দিকে।

"আস্‌সালাম ওয়ালেকুম। আমি প্রিমো," ও হাত বাড়িয়ে দিল।

ছেলেটা একটু সন্দেহের চোখে তাকাল। প্রিমো হেসে পকেট থেকে পাসপোর্টটা বাড়িয়ে দিল। ছেলেটা ভাল করে দেখল সেটা, তারপর হেসে ফিরিয়ে দিয়ে বলল, "ওয়ালেকুম আস্‌সালাম। আসুন ভাইয়া। আমি মজিদ।"

দূরে একটা হ্যাচব্যাক দাঁড়িয়ে রয়েছে। মজিদ প্রিমোকে নিয়ে গাড়িতে উঠল। বলল, "ভাইয়া, আপনার সামান?

প্রিমো হেসে বলল, "থাকব তো দু'-একদিন। তার জন্য সামান দরকার হবে কি? আর আমার এই ব্যাগটা তো রয়েছে।"

মজিদ গাড়িটাকে নজরুল ইসলাম সরণিতে তুলে পাশে তাকিয়ে বলল, "আপনার আসলি সামান আমরা রেডি করে রেখেছি। ওখানেই যাবেন তো?"

প্রিমো বাইরের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল অল্প। তারপর বলল, "গোটা শহরটা তো বিয়েবাড়ির মতো সেজেছে! দারুণ ব্যাপার।"

মজিদ হেসে বলল, "বাঙ্গালি লোগ এমনই। কিছু পেলেই একদম জি তোড় হাঙ্গামা করে। তা ভাইয়া আপনার কাজটা কী, বলা যাবে?"

প্রিমো তাকাল মজিদের দিকে। তারপর সামান্য হেসে বলল, "দুর্গাপুজো দেখব। দিওয়ালি রোশনাই করব। আর সম্ভব হলে পরে একটু অঞ্জলিও দেব। বুঝলে মজিদ মিঞা?"

মজিদ কিছু না বুঝেই হাসল। তারপর জোরে গাড়িটা ছুটিয়ে দিল খিদিরপুরের দিকে।

৪

কলকাতা, মহাসপ্তমী

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেক্রেটারি অফ সিভিল ডিফেন্স হৃদয়েশ মোহন কাঁপা হাতে ফোনটা রেখে চুপ করে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। এখন অক্টোবরের শেষ, তার উপর ঘরে এসি চলছে কুড়ি ডিগ্রি সেলসিয়াসে। তবু কপালে যে ঘাম জমছে, বুঝতে পারলেন তিনি। ঘাম জমাটা স্বাভাবিক। কারণ, ফোনের ওপার থেকে কমিশনার অফ পুলিশ পচনন্দাজি এমন একটা খবর দিয়েছেন, যেটা সত্যি হলে ভারতের ইতিহাসের অন্যতম ভয়ংকর অধ্যায় শুরু হতে চলেছে কলকাতায়।

হৃদয়েশ নিজের মোবাইলটা বের করে দ্রুত হাতে চিফ সেক্রেটারি সমর ঘোষকে ফোন করলেন। চারবার রিং হওয়ার পর ফোনটা ধরলেন সমরবাবু।

হৃদয়েশ খুব সংক্ষেপে গুছিয়ে গোটা ব্যাপারটা বললেন। তারপর যোগ করলেন, "স্যার, আমাদের ইমিডিয়েটলি একটা ডিসিশনে পৌঁছোতে হবে।"

সমরবাবু বললেন, "আপনি রাইটার্সে পৌঁছোন, কনসার্নড সকলকে আসতে বলুন। আমি সি এম ম্যাডামকে ফোন করছি।"

সপ্তমীর সকাল আটটার কলকাতা যেন উৎসবের প্রস্তুতি নিচ্ছে। নানা থিমের প্যান্ডেল, মানুষের টুকরো টুকরো ভিড়, আর আনন্দের সব মুখ পেরিয়ে হৃদয়েশজির গাড়ি ছুটছে। পিছনের সিটে বসে গাড়ির ঠান্ডার ভিতরেও ঘামছেন হৃদয়েশজি। ভাবছেন, এত লোক জানেই না কলকাতায় কী সমূহ বিপদ উপস্থিত! এই উৎসবের শহর শ্মশান হতে এক সেকেন্ডও লাগবে না।

টিন্টেড গ্লাস দিয়ে বাইরের রোদটা দেখলেন উনি। এত সুন্দর পরিবেশে কী ভয়ংকর সমস্যা উপস্থিত হল ওদের সামনে!

গাড়িতে উঠেই জরুরি কিছু ফোন করে ফেলেছেন হৃদয়েশজি। সমরবাবুও ফোন করে জানিয়েছেন যে, পচনন্দাজির সঙ্গে ওঁর কথা হয়েছে। ওদিকে সি এম অন দ্য ওয়ে। বাকি মন্ত্রীরাও আসছেন। এমনকী প্রতিরক্ষামন্ত্রী এ কে অ্যান্টনিকে জানানো হয়েছে গোটা ঘটনা। দিল্লি থেকে বিশেষ বিমানে উড়ে আসছেন ডিফেন্স সেক্রেটারি শশীকান্ত শর্মা। হৃদয়েশ যেন দেরি না করেন!

রাইটার্সে ঢোকার আগেই হৃদয়েশ দেখলেন সি এম-এর কালো ছোট্ট হ্যাচব্যাকটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঘাম মুছতে মুছতে নির্দিষ্ট ঘরের দিকে প্রায় দৌড়ে গেলেন হৃদয়েশজি।

ঘরটা বেশ বড়। একটা বিশাল বড় কাঠের টেবিলের চারিদিকে গোল করে সাজানো বেশ কিছু চেয়ার। টেবিলের মাঝে কয়েকটা টেলিফোন, মনিটর, আরও নানা যন্ত্রপাতি। সকালে খবর পাওয়ামাত্রই এই ঘরটাকে একটা কন্ট্রোলরুমে পরিণত করা হয়েছে।

সকলে জায়গায় বসার পর সি এম সমরবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, "লালবাজারে না বসে এখানে জমায়েত করলেন কেন?"

সমরবাবু বললেন, "ম্যাডাম, আপনি রাইটার্সে আসতেই পারেন। সেটা স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু লালবাজারে গেলেই প্রেস হাজারটা প্রশ্ন করবে। তাই মিডিয়ার নজর এড়াতে পচনন্দাজির সঙ্গে আলোচনা করে এখানে আয়োজন করেছি।"

সি এম গম্ভীরভাবে শুনলেন পুরো ঘটনাটা। তারপর বললেন, "ঠিক আছে। তবে আপনি ফোনে যা বললেন, তা কতটা ঠিক? মানে এমন হোক্স কল তো সারা দিনই আসে। তা হলে এটাকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন কেন?"

সমরবাবু সামনে রাখা গ্লাস থেকে জল খেলেন একটু। তারপর শান্ত গলায় বললেন, "আমি সকলের সঙ্গে কথা বলে যতটা জানতে পেরেছি, সেটা আপনাকে বলছি ম্যাডাম। লালবাজারে ফোনটা আসে সকাল ছ'টার

সময়। বলা হয় যে কলকাতার তিনটে পুজো মণ্ডপে বম্ব প্ল্যান্ট করা আছে। যে ফোন করেছে, তার বক্তব্য হল, ওর দাবি না মানলে দুটো পুজোয় বিস্ফোরণ ঘটানো হবে।"

"দুটোতে?" সি এম টেবিলে ভর দিয়ে ঝুঁকে পড়লেন, "আর বাকি একটা?"

এবার পচনন্দাজি বললেন, "সেটা ওই লোকটার হুমকি-প্রুফ ম্যাডাম।"

"প্রুফ?" সকলে ঘুরে তাকালেন কমিশনারের দিকে।

পচনন্দাজি বললেন, "হ্যাঁ, প্রুফ। প্রুফ ফর দ্য ক্লেম। লোকটি আমাদের বলেছে যে, প্রভাতফেরি সঙ্ঘের প্যান্ডেলের কাছে একটা বড় মূর্তি রয়েছে। তার পায়ের ভিতর একটা ছোট্ট বাক্সে আর ডি এক্স প্ল্যান্ট করা আছে। আমরা খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোক পাঠিয়ে দেখেছি যে, সত্যি ওখানে আর ডি এক্স রাখা আছে। তবে তাতে কোনও ডিটোনেটর নেই।"

"আর বাকি দুটো?"

পচনন্দাজি মাথা নাড়লেন, "আমরা কোথায় আছি জানি না ম্যাডাম। যেহেতু লোকটার কথামতো আমরা আর ডি এক্স খুঁজে পেয়েছি, তাই তাকে অবিশ্বাস করার আর জায়গা নেই। আর বাকি দুটো বম্ব খোঁজাও খুব ডিফিকাল্ট। এত এত পুজো চারিদিকে। এত প্যান্ডেল, আলো, এত স্ট্রাকচার। কোথায় খুঁজব! সিচুয়েশন ইজ গ্রেভ ম্যাডাম, ভেরি গ্রেভ।"

সি এম মাথা নাড়লেন, "সত্যি! মানুষ পশু হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। এত অসহায় মানুষের জীবন নিয়ে কেউ এমন করতে পারে! কলকাতায় এত পুজো হয়। এ তো খড়ের গাদায় সুচ খোঁজার মতো ব্যাপার। এত লক্ষ লক্ষ মানুষ, এদের কী হবে? তা, কে করছে এসব জানা গিয়েছে? মানে, বিদেশি কোনও শক্তি না দেশের ভিতরের মিসক্রিয়েন্টস? ফোনের ওপারের লোকটি নিজেকে আইডেনটিফাই করেছে?"

"নট ইয়েট ম্যাডাম," পচনন্দাজি মাথা নাড়লেন।

"আপনারা কী স্টেপ নিচ্ছেন তবে? আমায় ডিফেন্স সেক্রেটারি ফোন করেছিলেন। আর অ্যান্টনিজিও ফোন করেছিলেন। সকলে খুব চিন্তিত। ওঁরা আসছেনও।"

পচনন্দাজি বললেন, "ম্যাডাম, লোকটা প্রথমবার যখন ফোন করেছিল, তখন ওর লোকেশন ট্রেস করেছিলাম মোবাইল দেখে। সেটা ছিল প্রকৃতি পার্কের পুজো মণ্ডপের কাছে। কিন্তু কল শেষ হওয়ার পরে ও মোবাইল সুইচ অফ করে দেয়। কাছেই গড়িয়াহাট থানা। সেখানে বলে আমরা প্যান্ডেলে পুলিশ ডিপ্লয় করেছি।"

সি এম জিজ্ঞেস করলেন, "কোনও ডিম্যান্ড করেছে কি? মানে কীসের জন্য বম্ব প্ল্যান্ট করছে, তার কোনও কারণ বলেছে?"

"না, ম্যাডাম," সমরবাবু মাথা নাড়লেন, "বলেছে ও নাকি সকাল দশটায় ফোন করবে। তখন কথা বলবে। তবে..."

"কী তবে?" সি এম জিজ্ঞেস করলেন।

"তবে শুধু 'র' (RAW)-এর জয়েন্ট ডিরেক্টর, জিডি পাকিস্তান ডেস্ক, মিস্টার জয় কুমারের সঙ্গেই নাকি কথা বলবে লোকটা।"

"জয় কুমার? 'র'-এর? কেন?" সি এম অবাক হলেন, "আর চাইলেই বা পাওয়া যাচ্ছে কোথায় তাঁকে?"

"উনিও আসছেন স্পেশ্যাল ফ্লাইটে," সমরবাবু ছোট করে বললেন।

সি এম টেবিলে রাখা মোবাইলটার দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, "ঠিক আছে। লেট হিম কাম। তবে আমরাও থাকব। আর মিস্টার ঘোষ, আপনি সব পসিবল হেল্‌পের ব্যবস্থা করুন। আমার শহরে কোনও বিপদ আমি ঘটতে দেব না। অ্যাট এনি কস্ট এটা আটকাতেই হবে। জয় কুমারকে সবরকম হেল্‌প করবেন। আর আপনাদের কাকে দরকার বলুন, আমি নিজে পি এম ও-র সঙ্গে কথা বলব। এমনিতেই মনমোহন সিংহজির সঙ্গে কথা বলতে হবেই আমায়। তখন বেস্ট পসিবল হেল্‌পের আমি বন্দোবস্ত করব। আর একটা কথা,

খবরটা যেন কিছুতেই না ছড়ায়। কোনও প্যানিক যেন ক্রিয়েট করা না হয়। আর কিপ মিডিয়া আউট অফ ইট। ব্যাপারটা যেন এই ঘরেই সীমাবদ্ধ থাকে। বুঝলেন?”

সকলে একসঙ্গে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন।

পাশে বসা একজন মন্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, “দিদি, আপনি কি এখানেই থাকবেন এখন? না...”

“এখানেই থাকব,” সি এম প্রশ্ন শেষ হওয়ার আগেই বললেন, “যত সময়ই লাগুক, আমি এখান থেকে যাচ্ছি না। গোটা রাজ্যের ভার আমার উপর। এদের সিকিয়োরিটির দায়িত্ব আমার। অন্য কোথাও যাওয়ার প্রশ্নই নেই।” তারপর পচনন্দাজির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “তা, মিস্টার কুমার তো আসছেন, আর কেউ আসছেন কি? কোনও কম্যান্ডো টিম? ন্যাশনাল সিকিয়োরিটি গার্ড? কেউ আসছে?”

“আসছে ম্যাডাম। তাদের পাঠানো হচ্ছে। কিন্তু যতক্ষণ না লোকটাকে লোকেট করতে পারছি, ততক্ষণ তো কিছুই করা যাবে না। সকলকে স্ট্যান্ড-বাইতে রাখছি। মিস্টার কুমার আমাদের তেমনই বলেছেন। আর...”

পচনন্দাজি থামলেন একটু। তারপর বললেন, “আরেকজন আসছে। ডিফেন্স সেক্রেটারি নিজে রেকমেন্ড করেছেন তাঁকে।”

“কে?” সি এম তাকালেন আগ্রহ নিয়ে।

“আমি জানি না সঠিক। তবে নাম শুনলাম আদিল,” সমরবাবু বললেন।

“আদিল? কে সে? পুরো নাম কী?”

সমরবাবু পচনন্দাজির দিকে তাকালেন। পচনন্দাজি সময় নিলেন একটু। তারপর থেমে থেমে বললেন, “তার ব্যাপারে আমাদের ইনফো লিমিটেড ম্যাডাম। আমরা শুধু জানি, যে আসছে সে একজন মার্কোস।”

আকাশ থেকে শহরটাকে খুব সুন্দর লাগছে। কে বলে কলকাতা ডায়িং সিটি? ব্রকোলির মতো সবুজ গাছের সারি, কালো সাপের মতো রাস্তা আর সব ছাড়িয়ে দেখা যাচ্ছে, নিখুঁত পেস্ট্রির মতো ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল।

এই শহরটাকে খুব ভাল করে চেনে আদিল। ওর জন্ম আর বেড়ে ওঠা তো এখানেই। ক্লাস টুয়েলভ অবধি এখানেই ছিল। পরে ইন্ডিয়ান নেভিতে জয়েন করে। আর সেখান থেকে একদম মার্কোস।

মার্কোস। পুরো কথাটা হল মেরিন কমান্ডোস। আগে এর নাম ছিল, মেরিন কমান্ডো ফোর্স। শুধু ভারতের নয়, পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ হল এই মার্কোস। এরা অ্যামফিবিয়ান কমব্যাট ফোর্স। জলে, মাটিতে, আকাশে সব জায়গায় লড়তে পারে। সবরকম অস্ত্র চালাতে পারে। প্যারাট্রুপিং থেকে ফ্রি-ফল বা আন্ডার ওয়াটার যে-কোনও জায়গায় এরা অপ্রতিরোধ্য।

আদিলের এখনও মনে পড়ে, সিলেকশনের সেই সময়গুলো। দুটো ভাগে হয় মার্কোসের সিলেকশন। প্রথমভাগে তিনদিন ধরে শারীরিক সক্ষমতা, ফিটনেস আর অ্যাপটিটিউড টেস্ট চলে। এতেই পঞ্চাশ শতাংশ ছেলে বাদ পড়ে যায়। আর এর পরে শুরু হয় পাঁচ সপ্তাহ ধরে সিলেকশন টেস্ট। এই পাঁচ সপ্তাহকে বলা হয় 'হেল'স উইক' বা 'নরকের সপ্তাহ'।

এই সপ্তাহগুলোতে ঘুমোতে প্রায় দেওয়াই হয় না অ্যাপ্লিক্যান্টদের। আর তার সঙ্গে চলে চূড়ান্ত শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা।

এতে পাশ করলে তবেই বছর দু'য়েকের মার্কোস হওয়ার ট্রেনিং শুরু হয়। আদিল শুধু পাশই করেনি, ওর র‍্যাঙ্ক উপরের দিকেই ছিল।

ট্রেনিং-এর দিনগুলোর কথা আদিল ভুলতে পারবে না কখনও। যে-কোনও অবস্থা থেকে ০.২৭ সেকেন্ডের রিঅ্যাকশন টাইমে গুলি ছুড়তে হত। তার সঙ্গে মরুভূমি থেকে গভীর সমুদ্র, সব জায়গায় ট্রেনিং হত ওদের। তবে সবচেয়ে সাংঘাতিক ছিল 'ডেথ ক্রল'। থাই অবধি জমে থাকা

কাদায় পঁচিশ কেজি ওজন নিয়ে শুরু হত। তারপর আড়াই কিলোমিটার পর্যন্ত নানা বাধা টপকে এগিয়ে যেতে হত। এর মধ্যে ছিল না-ঘুমোনো। আর সব শেষে সেই অবস্থায় পঁচিশ মিটার দূরে লক্ষ্যভেদ করতে হত বন্দুক দিয়ে। আর টার্গেটের পাশে তখন দাঁড়িয়ে থাকত ওদেরই কোনও কোলিগ!

আদিলের ব্যাচের নব্বই শতাংশ ছেলেই আর কমপ্লিট করতে পারেনি এই ট্রেনিং। শুনেছে এমনটাই হয়। তবে যারা পেরেছে, তারা লোহার তৈরি মানুষ হয়ে গিয়েছে। তারা শিখে গিয়েছে সবরকম কম্যান্ডো কমব্যাট, প্যারা ট্রেনিং, এক্সপ্লোসিভ টেকনোলজি, কাউন্টার টেররিজম, স্কাই ডাইভিং এবং আরও নানারকম যুদ্ধের মন্ত্র।

আদিলের মনে আছে ওদের ট্রেনিং কম্যান্ডার বলতেন, "উই আর মেকিং ওয়ার-মেশিন আউট অফ হিউম্যান।"

নিজেকে আদিলের এখন ওয়ার-মেশিনই মনে হয়।

আজ সকালে যখন কলাইকুন্ডায় ঘুম ভেঙেছিল ওর, তখনও জানত না স্পেশ্যাল কাজে ওকে আসতে হবে কলকাতায়। আসলে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের মার্কোস বেসেই ওর পোস্টিং। তবে অফিসের একটা কাজে ওকে আসতে হয়েছিল কলাইকুন্ডায়। সেখান থেকে ওর কাছে অর্ডার আসে যে, কলকাতায় নাকি হস্টেজ সিচুয়েশন হয়েছে। সেটা কমব্যাট করতে যেতে হবে ওকে। এটা নতুন নয় আদিলের কাছে। মার্কোসদের জীবনে এমন ঘটনা লেগেই থাকে।

কলাইকুন্ডা থেকে হেলিকপ্টারে চড়ে এই এখন কলকাতায় নামল আদিল। দেখল, সরকারি গাড়ি নিতে এসেছে ওকে। অক্টোবরের শেষ। তবে ঠান্ডা নেই তেমন। বরং হাওয়ায় একটা অদ্ভুত আনন্দ ভাসছে। আদিল জানে দুর্গাপুজোর সময় এই শহরটা ডিজনিল্যান্ড হয়ে ওঠে।

ঠিক পৌনে দশটার সময় আদিল এসে পৌঁছোল রাইটার্সে। লাল বাড়িটার ভিতরে ঢোকার সময় দেখল পরিবেশ থমথমে। অবস্থা কতটা

গুরুতর, আদিল জানে না। ওকে বলা হয়েছে এখানেই সব ডিটেল দেওয়া হবে।

আদিল সানগ্লাসটা পকেটে ঢুকিয়ে সঙ্গের এসকর্টটির পাশে পাশে করিডর দিয়ে হাঁটতে লাগল।

আদিল যে ঘরটায় ঢুকল, সেটা বেশ বড়। একটা টেবিলের উপর নানা যন্ত্রপাতি ভরতি হয়ে আছে। ঘরে পুলিশের বেশ কিছু লোকের সঙ্গে আরও কিছু মানুষকে দেখল ও। তবে সি এম ছাড়া আর কাউকেই চিনতে পারল না ঠিক।

পচনন্দাজি এগিয়ে গেলেন আদিলের দিকে। তারপর হ্যান্ডশেক করে নিজের পরিচয় দিলেন। আর ঘরের সকলের সঙ্গে সংক্ষেপে পরিচয় করিয়েও দিলেন। সব শেষে যাঁর সঙ্গে পরিচয় করানো হল, তিনি এতক্ষণ আড়ালে থাকায় তাঁকে দেখতে পায়নি আদিল। এবার দেখে চমকে উঠল। আরে, জয় কুমার স্যার! এত সমস্যার ভিতরেও মনটা ভাল হয়ে গেল আদিলের। নেভির ট্রেনিং-এ ওর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল জয় স্যারের। স্যার এখন 'র'-তে আছে জানত আদিল, কিন্তু এমন করে দেখা হয়ে যাবে, সেটা ভাবতে পারেনি।

"আরে আদিল," জয় এগিয়ে এসে হাতটা ধরল আদিলের।

"স্যার আপ?" আদিল হাসল, "নাইস টু সি ইউ এগেন স্যার। কিন্তু দেখাটা আরও ভাল জায়গায় হতে পারত।"

জয় মাথা নাড়ল, "ঠিক। একটু আগেই এসেছি আমি। যা শুনলাম, তাতে বুঝেছি অবস্থা বেশ খারাপ। হস্টেজ সিচুয়েশন।"

আদিল মাথা নাড়ল। ঠিক কথা। এটা খুব বাজে জিনিস। এই ধরনের ঘটনায় নিরীহ মানুষদের মারা যাওয়ার চান্স বেশি থাকে।

ও জিজ্ঞেস করল, "ক'জন হস্টেজ স্যার?"

"ক'জন হস্টেজ?" জয় সকলের দিকে তাকাল একবার। তারপর গভীর গলায় বলল, "ক'জন নয় আদিল, দুর্গাপুজোর উৎসবে বিভোর এই গোটা শহরটাই এখন হস্টেজ, বন্দি।"

"আই ওয়ন্ট টু টক টু জয় কুমার," প্রিমো কথাটা বলে অপেক্ষা করল একটু।

রাস্তায় বেশ ভিড় এখন। এসপ্ল্যানেডের এই বড় হোটেলের সামনে যে ফুটপাথ থেকে পার্কস্ট্রিটের মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাওয়া ফ্লাইওভারের গোড়া পর্যন্ত লোকে লোকারণ্য। কত লোক যে আনন্দ করতে বেরিয়েছে!

"হ্যাঁ, জয় বলছি," ওপার থেকে ভেসে এল একটা গলা।

"থ্যাঙ্কস ফর রেসপন্ডিং," প্রিমো ভিড়ের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে সময় নিল একটু। তারপর বলল, "হোপ আপনারা আমার কথা রেকর্ড করছেন।"

"তুমি কী চাও?" জয় সময় নষ্ট করল না, "তোমার কল যে হোক্স নয়, তার প্রমাণ কী?"

"আর ডি এক্স প্যান্ডেল থেকে আমার কথামতোই তো খুঁজে পাওয়া গিয়েছে, নাকি?" প্রিমো শব্দ করে হাসল, "তবে ওতে ডিটনেটর গোঁজা ছিল না। আমার কথা না মানলে পরেরগুলোতে ডিটনেটর থাকবে কিন্তু। আর আপনারা নর্থ টু সাউথ ছুটোছুটি করে লাশ কুড়োবেন, কেমন?"

"কাট দ্য ক্র্যাপ। কী চাস বল," জয় সামান্য ধৈর্য হারাল।

"আরে," প্রিমো হালকা গলায় বলল, "গিভ আ লিট্‌ল রেসপেক্ট ম্যান। তুমি থেকে একদম তুই! আমি আপনার সাব-অর্ডিনেট নই। যা বলছি শুনুন। এখন সকাল দশটা বাজে, এখন থেকে প্রতি দু'ঘণ্টা অন্তর ওয়ান মিলিয়ন ডলার করে আপনারা আমার দেওয়া একটা বিদেশি অ্যাকাউন্টে টাকা জমা করবেন। বুঝেছেন?"

জয় বলল, "বলে যাও, আমি শুনছি।"

"ওয়ান মিলিয়ন ডলার। নট আ পেনি লেস। অ্যাকাউন্ট নম্বরটা হল ১১.১৫.১২.১১.১.২০.১। আর ব্যাঙ্কের নাম ব্যাঙ্কা ইয়ানিক, জুরিখ। তবে বুঝতেই পারছেন গোটাটাই কোডেড। ওই ব্যাঙ্কে যোগাযোগ করে কিন্তু

কিছু পাবেন না। ওটা ওখান থেকে অন্য জায়গায় ট্রান্সফার্ড হয়ে যাবে। ওরাও জানবে না।”

“তুমি সত্যি বলছ কি না, সেটা জানব কী করে? কী প্রমাণ আছে তুমি পাগল নও?” জয় গলাটা শক্ত রেখে প্রশ্ন করল।

হাসল প্রিমো। বলল, “একটা গল্প বলছি, শুনুন। মস্কোর দোমোদেদোভো ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের সামনে একটা পাগল রাস্তায় বসে থাকত। আর মাঝে মাঝেই এয়ারপোর্টের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলত, “ওখানে বোমা আছে।” কেউ বিশ্বাস করত না তাকে। বরং সকলে হাসত। টিটকিরি করত। তারপর ২৪ জানুয়ারি ২০১১-র দুপুর থেকে পাগলটা আবার চিৎকার শুরু করল, ‘বোমা আছে, বোমা আছে।’ পুলিশ বিরক্ত হয়ে ওকে চ্যাংদোলা করে সরিয়ে দিল জায়গাটা থেকে। তার কিছু পরেই বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ প্রচণ্ড বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল মানুষজনে ভরতি এয়ারপোর্ট। পঁয়ত্রিশজন মৃত আর একশো তিরিশজন আহত।”

“তো?” জয় পালটা জিজ্ঞেস করল।

“পাগলটার কথা বিশ্বাস করা বা না করা আপনাদের প্রবলেম। আমি শুধু গল্পটা বললাম। শুনুন যদি বারোটার মধ্যে প্রথম কিস্তি জমা না পড়ে, তবে...” প্রিমো কথা শেষ না করে চুপ করে গেল।

“ও কে,” জয় হাসল হালকাভাবে, “টাকা চাই তোর? জাস্ট টাকা! আফটার অল ইউ আর আ পেটি থিফ!”

“আপনি কিন্তু আগে এমন ছিলেন না,” প্রিমো হাসল, “কাশ্মীর ভ্যালিতে জঙ্গিদের সঙ্গে কমব্যাটে আপনি কিন্তু অনেক কুল থাকতেন। এখন আপনি বড্ড তাড়াহুড়ো করছেন! কাশ্মীরে আপনি অনেক ভুগিয়েছেন। এবার আপনার ভোগার পালা। আর আমার কথা শেষ হয়নি কিন্তু। এখন থেকে রাত দশটা অবধি আপনাদের আমি সময় দিলাম। তার মধ্যে ডলার তো জমা দিচ্ছেনই, তার সঙ্গে রাত দশটা নাগাদ আপনারা আমায় আর-একটা জিনিসও দেবেন।”

"আর-একটা জিনিস? কী?"

"আই এন এস চক্র টু-র নিউক্লিয়ার মিসাইলের লঞ্চ কোড।"

"কী?" জয় নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারল না।

"আমি আবার বারোটায় ফোন করব। মনে রাখবেন, ডেড লাইন রাত দশটা।"

কুট করে কলটা কেটে ফোনটা একদম সুইচ অফ করে দিল প্রিমো। দেখল হাঁটতে হাঁটতে ও চলে এসেছে এসপ্ল্যানেড মেট্রোর সামনে। তবে সেখানেও খুব ভিড়। কিন্তু হোক না ভিড়, প্রিমোর তাড়া নেই কোনও। সামনে দু'ঘণ্টা সময়। এই দু'ঘন্টা কিচ্ছু করার নেই ওর। পকেট থেকে আরেকটা মোবাইল বের করল প্রিমো। মরিশাসের একটা নম্বর ডায়াল করে নিচু গলায় কাউকে নির্দেশ দিল কিছু। তারপর কথা শেষ করে ধীরে সুস্থে ঢুকে গেল মেট্রো স্টেশনের মধ্যে।

এদিকে কন্ট্রোল রুমে আদিল তাকিয়ে রইল অ্যাকাউন্ট নম্বরটার দিকে। তারপর বিস্ময়ের গলায় বলল, "দেখেছেন, নম্বরটা যেটা বেছেছে, সেটাকে অ্যালফাবেটে পরিণত করলে কী দাঁড়ায়?"

সকলে একসঙ্গে তাকালেন আদিলের দিকে।

আদিল নম্বরটার দিকে চোখ রেখে অস্ফুটে বলল, "K-O-L-K-A-T-A!"

৭

সকলের চোখের সামনে লাল ডটটা নিভে গেল স্ক্রিনে।

আদিলের কথা শোনার পর স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে ঘরের ভিতর একটা দীর্ঘশ্বাসের কোরাস শোনা গেল।

“লোকটা সুইচ অফ করে দিল!” সি এম উদ্বিগ্ন হয়ে তাকালেন জয় কুমারের দিকে।

জয় মাথা নাড়ল। তারপর মিনিট পনেরো আগে এসে পৌঁছোনো ডিফেন্স সেক্রেটারি মিস্টার শশীকান্ত শর্মার দিকে তাকিয়ে বলল, “স্যার, শুনলেন তো ডিম্যান্ড। এবার কী করবেন?”

শশীকান্তজি ঠোঁট কামড়ে বসে রইলেন একটু। তারপর বললেন, “টেররিস্টদের ডিম্যান্ড মেটানো আমাদের পলিসি বিরুদ্ধ।”

“কিন্তু স্যার আমাদের আর কী করার আছে?”

“তোমরা ট্র্যাক করে ধরতে পারবে না ওকে দু'ঘণ্টার মধ্যে? ওর লোকেশন তো দেখতে পেলে। এসপ্ল্যানেডের কাছে একটা জায়গা থেকে কল করেছিল। কাছের পুলিশ প্যাট্রোলকে বললে ধরা যেত না?”

জয় মাথা নাড়ল, “না স্যার যেত না। কলটা লোকেট করলাম না হয় এসপ্ল্যানেডের ফুটপাথে। কিন্তু পুজোর ভিড়ে কয়েক হাজার লোক ওখানে ঘুরছে। তাতে কয়েকশো লোক হয়তো ফোনে কথা বলছে। কাকে ছেড়ে কাকে অ্যারেস্ট করব আমরা? মাস অ্যারেস্ট করলে কী পরিমাণ প্যানিক ছড়াবে বুঝতে পারছেন? নট পসিবল স্যার। লোকটা খুব চালাক। ভিড়ের মধ্যে থেকে কল করছে যাতে ডেফিনিট করে ট্রেস করা না যায়। তারপর তো দেখলেন! অফ করে দিল মোবাইল।”

শশীকান্তজি সামনের টেবিলে রাখা জল খেলেন একটু। তারপর ভুরু কুঁচকে বসে রইলেন। সি এম বললেন, “আমি মনমোহনজিকে ফোন করছি আবার। মন্ত্রীর মেয়ের জন্য সন্ত্রাসবাদীকে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে, আর সাধারণ নিরীহ লোকদের জন্য টাকা দেওয়া যাবে না? এ কী নিয়ম? গভর্নমেন্ট তো মানুষের জন্য, তা হলে তাদের প্রতি কি দায়বদ্ধতা নেই? টেররিস্টদের সঙ্গে আপস করার কথা নয়, এটা হল জীবন বাঁচানোর কথা।”

শশীকান্তজি মাথা নাড়লেন, “ঠিক বলেছেন ম্যাডাম। কিন্তু প্রোটোকল

বলে একটা ব্যাপার আছে। দু'ঘণ্টার মধ্যে কি এভাবে টাকা ট্রান্সফার করা সম্ভব?"

"স্যার", আদিল এবার কথা বলল, "আয়্যাম সরি টু ইনটারাপ্ট, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে সেকেন্ড ডিম্যান্ডটা বেশি ডিসকাশন দাবি করে।"

শশীকান্তজি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "না, ওটা কোনও ডিসকাশন দাবিই করে না। কারণ ওটা দেওয়া সম্ভব নয়।"

"কোনটা?" সি এম জিজ্ঞেস করলেন।

"নিউক্লিয়ার লঞ্চ কোড," সমরবাবু আস্তে বললেন কথাটা।

শশীকান্তজি বললেন, "ওটা দেওয়া আউট অফ কোয়েশ্চন। তাতে যা হওয়ার হবে।"

"যা হওয়ার হবে?" সি এম বললেন, "পুজোর ভিড়ে যা হওয়ার হবে, মানে বুঝতে পারছেন?"

শশীকান্তজি বললেন, "ম্যাডাম ওটা একটা সামান্য নিউক্লিয়ার লঞ্চ কোড নয়। ওটা আসলে ইন্ডিয়ান ওশনে আমাদের হার্ট।"

সি এম তাকালেন শশীকান্তজির দিকে। তারপর সমরবাবুকে বললেন, "মিস্টার ঘোষ, আপনি বুঝতে পারছেন কী বলছেন উনি?"

সমরবাবু বললেন, "হ্যাঁ ম্যাডাম। ইন্ডিয়ান ওশন এখন পৃথিবীর অন্যতম ইম্পর্ট্যান্ট রিজিয়ন। আমি বুঝতে পারছি ব্যাপারটা। এনার্জি রিসোর্স অর্থাৎ তেল, ন্যাচারাল গ্যাস, কয়লা ইত্যাদি হল পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। আর জানা গিয়েছে, পৃথিবীর জমে থাকা তেলের আশি শতাংশ ভারত মহাসাগরের মাটির তলায় আছে। আর আছে লিকুয়িফায়েড ন্যাচারাল গ্যাসের জমা অংশের সতেরো শতাংশ। তেলের ব্যবহারে চিন পৃথিবীর দ্বিতীয় স্থানে আছে। ওদের রোজ পচাঁশি লক্ষ ব্যারেলের বেশি তেল দরকার হয়। আর এর আশি শতাংশ আসে জাহাজে করে সমুদ্রপথ দিয়ে। আর আমরা সমুদ্র দিয়ে আনি আমাদের ব্যবহারের সত্তর শতাংশ তেল। অর্থাৎ ভারত মহাসাগর হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মেরিটাইম হাইওয়ে।

এটা যে দখল করতে পারবে, তার হাতেই আগামী দুনিয়ার চাবিকাঠি।"

সমরবাবু থামলেন একটু। তারপর আবার শুরু করলেন, "তা ছাড়া আফ্রিকা যখন নিজেদের ছোট দেশগুলোকে শান্ত করে অনেক স্টেবল করে ফেলবে নিজেদের, তখন সেই মহাদেশে যে পরিমাণ ব্যাবসার সুযোগ বাড়বে, তাতে মুখ্য রুট হয়ে উঠবে ভারত মহাসাগর। আমেরিকান ইন্টেলিজেন্সের খবর অনুযায়ী, চিন সামনের পনেরো বছরের মধ্যে এমন এক সেনাবাহিনী গড়ে তুলবে বলে প্রস্তুত হচ্ছে, যা দিয়ে ওরা সামুদ্রিক অঞ্চলগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। আর আমাদের দেশও অনেক টাকা খরচ করছে, যাতে সমুদ্র আর তার উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলোতে আমরাও যে-কোনও শত্রুর মোকাবিলা করতে পারি।"

"সেইখানেই কি হিসেবের মধ্যে আসছে এই আই এন এস চক্র টু?" সি এম জিজ্ঞেস করলেন।

"ইয়েস ম্যাডাম," সমরবাবু মাথা নাড়লেন, "এটা আমাদের একটা নিউক্লিয়ার পাওয়ার্ড সাবমেরিন।"

"নিউক্লিয়ার পাওয়ার্ড?" একজন মন্ত্রী টেবিলের অন্যপ্রান্ত থেকে জিজ্ঞেস করলেন।

"হ্যাঁ," জয় বলল এবার, "সাবমেরিন সাধারণত ডিজেল-ইলেকট্রিক চালিত হয়। এগুলোর প্রধান সমস্যা হল কিছু সময় পর-পরই এগুলোকে ভেসে উঠতে হয় ফুয়েল সংগ্রহ করতে। সেখানে নিউক্লিয়ার পাওয়ার্ড সাবমেরিন বহুদিন জলের তলায় থাকতে পারে। ট্যাকটিক্যাল দিক থেকে দেখতে গেলে এটা একটা বিশাল ব্যাপার। আমাদের হাতে এখন এই ধরনের সাবমেরিন আছে, যা সমুদ্র যুদ্ধ বা প্রতিরক্ষায় ভীষণ এফেক্টিভ। তাই তার নিউক্লিয়ার ওয়্যারহেডের লঞ্চ কোড শত্রুপক্ষ যে চাইবে, তা আর আশ্চর্য কী!"

"এগজ্যাক্টলি", সমরবাবু মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বললেন, "তাই ওই অঞ্চলে ভারতের নিউক্লিয়ার সাবমেরিন নিউক্লিয়ার ওয়্যারহেড বা

মিসাইলের লঞ্চ কোড যে-কোনও দেশ বা সন্ত্রাসবাদী সংগঠন চাইতে পারে । কারণ তাতে যেমন ভারতকে কোণঠাসা করা যাবে, তেমনই ভারত মহসাগরের উপর নিজের আধিপত্যও বজায় রাখা যাবে। তবে আর-একটা কারণও আছে”, সবাই তাকালেন সমরবাবুর দিকে। সমরবাবু বললেন, “আমাদের দেশের চারিদিক দিয়ে সন্ত্রাসবাদীরা ইনফিলট্রেট করতে চায় এবং করেও। ল্যান্ড বর্ডারস দিয়ে যেমন এই ইনফিলট্রেশন হয়, তেমন সি বর্ডারস দিয়েও হয়। যেমন কাসভরা সমুদ্রপথে ঢুকেছিল। এখন নিউক্লিয়ার ওয়্যারহেডের কন্ট্রোল আমাদের শত্রুদের হাতে এসে গেলে ইন্ডিয়ান ওশন দিয়ে ঢুকতে চেষ্টা করা সন্ত্রাসবাদীদের একটা কভার দেওয়াও হতে পারে। তখন আমাদের সেটা ঠেকানো মুশকিল হবে।”

সমরবাবু কথা শেষ করার পর ঘরে কিছুক্ষণ সকলে চুপ করে থাকলেন। তারপর সি এম জিজ্ঞেস করলেন, “তা আমাদের এই লঞ্চ কোড পেতে কে চেষ্টা করছে বলে আপনি অনুমান করছেন?”

“ম্যাডাম”, এবার শশীকান্তজি বলেন “এটা বলা ডিফিকাল্ট। আওয়ার মেরিটাইম রাইভ্যাল ইন দিস জোন ইজ চায়না। কিন্তু পাকিস্তানও আছে, যে সব বিষয়ে বাগড়া দেয়। আবার এও হতে পারে, ইন্ডিয়ার সঙ্গে এদের টেনশন আছে জেনে সেটা অন্য কেউ এনক্যাশ করতে চাইছে। তবে যেই করতে চাইছে, সে চাইছে ইন্ডিয়ান ওশনের উপর আমাদের পাওয়ারটা কমজোর করে দিতে, আমাদের ডিফেন্স সিস্টেমের ক্ষতি করতে।”

সি এম চিন্তিত মুখে ভাবলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, “আপনারা কী সাজেস্ট করছেন?”

সমরবাবু বললেন, “ম্যাডাম, এই মুহূর্তে আমাদের প্রায়রিটি হল ওয়ান মিলিয়ন ডলার জমা করা। সেটা কি করা সম্ভব?”

ডিফেন্স সেক্রেটারি শশীকান্তজি চিন্তিতমুখে বললেন, “আমি পি এম ও-র সঙ্গে কথা বলছি। তবে আর বেশি সময় তো নেই। কিন্তু টেররিস্টদের কাছে আমাদের কি এভাবে আত্মসমর্পণ করা ঠিক হবে? আমার মনে হয়

টাকা দেওয়া যাবে না। আমাদের এখন কী করে এই থ্রেটটার মোকাবিলা করা যায়, সেটাই দেখতে হবে।”

“সরি টু ইন্টারাপ্ট স্যার ,” জয় কুমার চোয়াল শক্ত করে তাকালেন টেবিলের উপর রাখা টেলিফোনটার দিকে, তারপর বললেন, “টাকা দেওয়াটা কিছুতেই ঠিক হবে না। তার চেয়ে রাত দশটার আগে জানোয়ারটাকে ধরে ফেলাটাই একমাত্র সমাধান। এই ব্যাপারে আর দ্বিতীয় কিছু ভাবার প্রয়োজন নেই স্যার, একদম নেই।”

শশীকান্তজি মাথা নাড়লেন, “এত অল্প সময়ে অত টাকা বের করে আনাও পসিবল নয়। সুতরাং ওকে খুঁজে বের করাটাই আমাদের একমাত্র অপশন।”

৮

সত্যনারায়ণ দুবের দিনটা আজ ভালভাবে শুরু হয়নি। সকাল থেকেই নানা ঝামেলা লেগে আছে। আজ সপ্তমী, ট্রেনে প্রচুর ভিড় হবে সারাদিন। তার মধ্যে ওকে বন্দুক কাঁধে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে টিকিট ঘরের সামনের কোলাপসিবল গেটে। আর চোখ রাখতে হবে কেউ সন্দেহজনক কিছু করছে কি না! স্টেশনে ও ছাড়া আরও দু'জন লাইট মেশিনগান নিয়ে পুলিশের লোক আছে। তাও ওকে ওর জায়গা থেকে নড়লে চলবে না।

যদিও ও জানে এটা রুটিন। কিছুই হবে না। সন্ত্রাসবাদীদের তো খেয়েদেয়ে কাজ নেই যে, সারা পৃথিবী পড়ে থাকতে ওরা এই মাঝেরহাট স্টেশনে এসে বোমা বা গুলি মারবে! তাও বেকুবের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে হবে ওকে।

তবে হ্যাঁ, পুজোর ভিড়ে পকেটমার, ছিনতাই বা মেয়েদের হাত ধরে টানাটানি ইত্যাদি চলেই। সেসব হলে ওকে অ্যাক্টিভ হতে হয়। আজও

হবে। তবে সেসব ফালতু কাজ। সত্যনারায়ণের বিরক্ত লাগে। আর আজ তো আরও লাগছে। দিনটাই যে আজ ভালভাবে শুরু হয়নি!

সমস্যার নাম হল বাথরুম।

সত্যনারায়ণ যে মেসে থাকে, সেখানে বাথরুমের ছাদ সকালে ভেঙে পড়েছে। ফলে সেখানে বাথরুম ব্যবহার করতে পারেনি ও। তাড়াতাড়ি স্টেশনে এসেও দেখেছে স্টেশনের বাথরুমও যেন নরক হয়ে আছে। যে জমাদারটা আসে বাথরুম পরিষ্কার করতে, পুজো বলেই কি না কে জানে, আজ ডুব দিয়েছে। তখন থেকে শরীরে একটা অস্বস্তি হয়ে আছে। আর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেটা বাড়ছে, মেজাজও খারাপ হচ্ছে। তার উপর স্টেশনের অল্পবয়সি ফাজিল ছোঁড়াটা পিছনে লাগছে। বলছে, "কিঁউ দুবেজি গেটকে পাস খড়ে হোকে লড়কিয়া তাড় রহে হো?"

শয়তানটা সুযোগ পেলেই ওর পিছনে লাগে। দু'-একবার গালাগালিও দিয়েছে সত্যনারায়ণ, কিন্তু ছেলেটার হুঁশ নেই। খালি হাসে। একটু আগেও সত্যনারায়ণ রেগে যাওয়ায় হাসছিল ছেলেটা। কিন্তু আর সেদিকে মন দিতে পারেনি ও। পেটের ভিতরে যেন রাম-রাবণের যুদ্ধ লেগেছে। একবার বাথরুমে না গেলেই নয়।

সত্যনারায়ণ তাই এখন লোটা হাতে লাইন ধরে হাঁটছে মাঝেরহাট ব্রিজের তলা দিয়ে দূরের ঝোপের দিকে। গ্রামে থাকতে এসব মাঠে যাওয়া অভ্যেস ছিল, কিন্তু এখন কলকাতায় এসে আর এসব নেই। আসলে আজ দিনটাই যে গন্ডগোলের!

সাবধানে দু'দিক দেখে রেল লাইনটা পার করল সত্যনারায়ণ। ব্রিজের এই লাইনটা নিউ আলিপুরের দিকে চলে গিয়েছে। লাইনের মাঝে সামান্য ঝোপ আর সবুজ ঘাস। দূরে মাঝেরহাট স্টেশনটা দেখা যাচ্ছে। একদিকে বজবজ লাইন আর অন্যদিকে চক্ররেলের লাইন।

এই চক্র রেলের লাইনের দিকটা বেশ শুনশান। পাশের খালি লাইনে

একটা ডিজেল ইঞ্জিন সমেত মালগাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। দূর থেকে মনে হচ্ছে যেন একা পড়ে থাকা একটা কেন্নো।

সত্যনারায়ণ দ্রুত পা চালাল। একবার বাঁ হাতের ঘড়িটা দেখে নিল। বারোটা বাজে। ওকে বলা হয়েছে যেন দেরি না করে। আরে বাবা, ও কি আর শখ করে এখানে এই ঝোপের মধ্যে এসেছে!

চারিদিক দেখে নিল সত্যনারায়ণ। না, সাপ খোপ নেই। যাক বাবা! ও হাতের লোটাটা রাখল মাটিতে। তারপর বসতে গেল। কিন্তু বসতে পারল না। চোখের কোণ দিয়ে ওই দূরে দাঁড়ানো মালগাড়িটায় কী যেন একটা ঝলসে উঠল মনে হল, আর সঙ্গে সঙ্গে রিফ্লেক্স অ্যাকশনে ও তাকাল সেই দিকে। আর ভয়ের সঙ্গে দেখল, প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরণ হল একটা। দূরের মালগাড়ির ডিজেল ইঞ্জিনটার তলায় যেন ঝলসে উঠল নরকের আগুন। অত ভারী ইঞ্জিনটা দেশলাই বাক্সের মতো ছিটকে উঠল হাওয়ায়! তারপর বিকট শব্দে আছড়ে পড়ল পিছনে দাঁড়ানো বগিগুলোর উপর।

কী করবে বুঝতে না পেরে ভয়ে থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে রইল সত্যনারায়ণ।

৯

চিফ সেক্রেটারি, ডিফেন্স সেক্রেটারি, সি এম, কয়েকজন মন্ত্রী আর পুলিশ কমিশনার প্রায় দৌড়ে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। বাইরে প্রেস এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এখনই সি এম-এর স্টেটমেন্ট চাই। মাঝেরহাটের কাছে যে বড় বিস্ফোরণটা হয়েছে, তাতে সারা রাজ্য নড়েচড়ে বসেছে। সপ্তমী পুজোর মধ্যে তবে কি জঙ্গি হানা হল কলকাতায়?

সব বাংলা নিউজ চ্যানেলই পুজোর আড্ডা আর গান গল্প থামিয়ে

ঝাঁপিয়ে পড়েছে ব্রেকিং নিউজে। আমেরিকান কনসুলেটের সামনে গুলি চালানোর পরে আবার কি জঙ্গিরা নিশানা করল এই শহরকে?

সি এম দ্রুত প্রেস মিট ডেকেছেন। উনি কী বলবেন মোটামুটি ঠিক হয়ে গিয়েছে এই ঘরেই। বলা হবে যে, এটা শর্ট-সার্কিট থেকে বিস্ফোরণ। জঙ্গি-হানা টানা কিছুই নয়। মানুষের ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আর ডিফেন্স সেক্রেটারি এখন যে কলকাতায় রয়েছেন, সেটা জাস্ট কাকতালীয়। উনি কলকাতায় এসেছেন একটা ব্যক্তিগত কাজে। তাই সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে এসেছেন রাইটার্সে।

আসলে প্যানিক ছড়াতে দেওয়া চলবে না কিছুতেই।

সি এম-এর প্রেস মিটটা জয়, আদিল আর বাকিরা দেখল ঘরের ভিতরের লাইভ টি ভি-তে। সি.এম খুব সহজভাবেই ব্যাপারটা সামলে দিলেন। সামান্য দু'-একটা হাসি ঠাট্টা করে পরিবেশটা সহজও করে দিলেন। তারপর সকলকে পুজোর শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করলেন বক্তব্য। কেউ বুঝতেই পারল না, আসলে কী ঘটতে চলেছে এখন।

বড় ঘরে ফিরেই সি এম প্রশ্ন করলেন "ফোন এসেছিল?"

জয় নীরবে মাথা নেড়ে 'না' বলল। তারপর যোগ করল, "জানি না ম্যাডাম, কেন এখনও ফোন করল না। সাড়ে বারোটা বাজে। এখনও কল এল না কেন, সেটাই ভাবছি!"

শশীকান্তজি বললেন, "এমন পিকিউলিয়ার সিচুয়েশন জীবনে দেখিনি। যদি কিছু জানা যেত! একটা লোক এরকমভাবে একা মুভ করছে, এর কোনও লিঙ্ক পাওয়া যাচ্ছে না কেন? কে লোকটা? কার লোক? কোথা থেকে এল? নাম প্রিমো! এটা কেমন নাম? আর লোকটাই বা আসলে কে? "

একজন পুলিশ অফিসার দ্রুত দরজা ঠেলে ঢুকল ভিতরে। হাতে একগোছা পেপার। সকলে কথা থামিয়ে তাকালেন অফিসারটির দিকে।

পচনন্দাজি বললেন, "কেয়া খবর হ্যায়? কুছ মিলা?"

অফিসারটি সকলের দিকে তাকিয়ে সামান্য নড করে টেবিলে কাগজগুলো ছড়িয়ে দিল। বলল, "কলকাতায় আসার সমস্ত সম্ভাব্য ট্রেন, বাস আর এরোপ্লেনের প্যাসেঞ্জার ইনফো এখানে আছে। তাতে দেখা যাচ্ছে যে প্রিমো উত্তমো বলে একজন প্যাসেঞ্জার গতকাল দমদমে নেমেছে। সিকিয়োরিটি ক্যামেরা থেকে তার ছবিটাও আমরা পেয়েছি।"

অফিসার পেনড্রাইভটা একটা ইউ এস বি পোর্টে গুঁজে দিল। তারপর দেওয়ালের বড় মনিটরে ভেসে উঠল পরপর কয়েকটা থাম্বনেল ছবি। দেখে বোঝাই যাচ্ছে যে, সিকিয়োরিটি ক্যামেরায় তোলা। তবে লোকটার মুখটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। মাথার টুপিতে মুখের কিছুটা ঢাকা।

সি এম অবাক হয়ে বললেন, "আরে এ তো একদম ইয়ং একটা ছেলে। গায়ের রংও ভারতীয়দের মতো। কত বয়স হবে এর? হার্ডলি পঁচিশ! এরই নাম প্রিমো?"

"ইয়েস ম্যাডাম", অফিসার মাথা নাড়ল, "গতকাল সকালে এসেছে ও। কিন্তু তারপর তো মিশে গিয়েছে শহরের ভিড়ে। তাই এখন ট্রেস করে..."

জয় বলল, "হ্যাঁ, ডিফিকাল্ট টু ট্রেস। তাও একটা লিড তো পাওয়া গেল। "

পচনন্দাজি অফিসারকে বললেন, ''তুমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কলকাতার সমস্ত থানায় এই ছবি পাঠিয়ে দাও। কলকাতার রাস্তায় সিভিল ড্রেসে ঘুরে বেড়ানো আমাদের সমস্ত লোকেদের হাতে এর ছবি যেন থাকে। আর তোমাদের যত কনট্যাক্ট আছে সকলকে ট্যাপ করে দেখো, একে চেনে কিনা। মেটিয়াবুরুজ, তিলজলা, খিদিরপুর, নিউমার্কেট, টালিগঞ্জ, বারুইপুর সমস্ত জায়গায় দেখো, কেউ একে চিনতে পারে কি না।"

"ইয়েস স্যার", অফিসার মাথা ঝোঁকাল। তারপর বলল "আমরা স্যার আমাদের রেকর্ড দেখেছি। এমন কারও নাম নেই। আমরা জানি না এ কে।"

"ঠিক আছে," শশীকান্তজি বললেন, "ছবিটা দিল্লিতেও পাঠিয়ে দাও। আমরা সারা পৃথিবীতে খোঁজ করে দেখছি কেউ একে চেনে কিনা বা কোন দলের সঙ্গে লোকটা যুক্ত। আমি নিজে কথা বলছি দিল্লিতে। ইউ শুড হারি আপ। এত লোকের মাঝে কিছু যদি একটা কেলেঙ্কারি ঘটে যায়, তবে আর রক্ষা থাকবে না!"

অফিসার সকলকে স্যালুট করে বেরিয়ে গেলেন বাইরে।

"ক্যাব," ছোট করে হঠাৎ বলে উঠল আদিল। সকলে ঘুরে তাকাল আদিলের দিকে। সমরবাবু জিজ্ঞেস করলেন "মানে?"

"ক্যাব, ট্যাক্সি, হেজেন, মারসিনারি, যে নামেই ডাকুন ব্যাপারটা এক। এই প্রিমো একজন হায়ার্ড গান। টাকা নিয়ে সে কাজ করে। আমার মনে হয় এটাই লোকটার পরিচয়। মনে হয় ও কোনও দলেরই সদস্য নয়। যে ওকে টাকা দেবে, ও তার। ও আসলে ফ্রিলান্সার। তাই ওর রেকর্ড নেই তেমন। এমনকী নামটাও যে ভুয়ো, তা তো বোঝাই যাচ্ছে। লক্ষ করে দেখুন, ও কিন্তু ডোমেস্টিক ফ্লাইটে কলকাতায় এসেছে। এখন খোঁজ নিতে হবে ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইটে এরকম দেখতে কেউ ভারতে ঢুকেছে কি না! ঢুকলে কোন এয়ারপোর্ট দিয়ে ঢুকেছে, সেটা জানতে হবে। যদিও এটা বের করা সময়সাপেক্ষ। আর যদি বেআইনিভাবে বর্ডার ক্রস করে, তবে তো বলাই সম্ভব নয়," আদিল মাথা নাড়ল।

"তবে কি কিছুই করা যায় না?" শশীকান্তজির গলাটা কেমন যেন অসহায় শোনাল।

এবার উত্তর দিল জয় কুমার। বলল, "লোকটার কোনও কানেকশন না পেলে তো খুব সমস্যা। এখন ওয়েট করা ছাড়া তো..."

জয় কুমার কথা শেষ করার আগেই টেবিলে রাখা ফোনটা বেজে উঠল হঠাৎ। জয় হাত তুলে সকলকে চুপ করতে বলল, তারপর স্পিকারটা অন করে এল ই ডি স্ক্রিনে চোখ রাখল। দেখা গেল শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ের কাছে ব্লিঙ্ক করছে মোবাইলের লোকেশন।

জয় হতাশায় মাথা নাড়ল। ও জানে, ওই সময়ে ওইখানে প্রচুর ভিড়। লোকটা খুব বুদ্ধি করে ভিড়ের মধ্যে থেকে ব্যবহার করছে মোবাইল।

"হ্যালো মিস্টার কুমার", হাসল প্রিমো, "নেতাজির ঘোড়াটার মতো তেজ যদি গোটা দেশটার থাকত, তবে আপনারা সব বিষয়ে এমন বোকা বনতেন না।"

জয় কিছু বলার আগেই আদিল বলে উঠল, "ইন্ডিয়ানদের ভদ্রতাকে তাঁদের দুর্বলতা ভাববেন না মিস্টার প্রিমো উত্তমো। "

"প্রিমো উত্তমো!" প্রিমো হাসল, "সো ইউ হ্যাভ ফাউন্ড মি! গ্রেট। আপনারা ভালই কাজ করছেন। যদিও আমার কাজটা হচ্ছে না। এখনও টাকাটা পেলাম না তো! তাই তো ইঞ্জিনটার ওই দশা হল। আপনাদের কোনও লোকাল ট্রেন বা মেট্রোরও এমনটা হতে পারত। কিন্তু ভাবলাম, ওয়ার্নিং-এর জন্য দূরে দাঁড়িয়ে থাকা একা মালগাড়ির ইঞ্জিনই এনাফ। তবে পরেরবার কিন্তু তা হবে না," প্রিমোর গলাটা শক্ত হয়ে এল শেষের কথাগুলো বলার সময়।

"তুমি কী চাও?" সি এম জিজ্ঞেস করলেন।

"আমি তো বলেইছি যে, জয় কুমারের সঙ্গে ছাড়া কারও সঙ্গে কথা বলব না। প্লিজ় একজনের মাধ্যমেই কথা বলুন।"

জয় বলল, "ওকে, আমি একই প্রশ্ন করছি, কী চাও তুমি?"

"কেন, ভুলে গেলেন? আই এন এস চক্র টু-র নিউক্লিয়ার মিসাইলের লঞ্চ কোড। জানি, ব্যাপারটা কঠিন। তাই আপনাদের আলোচনার জন্য আমি রাত দশটা অবধি টাইম দিয়েছি। আর সময় দেওয়ার মূল্য হিসেবে প্রতি দু'ঘণ্টা অন্তর ওয়ান মিলিয়ান ডলার। যেটা প্রথমবারে আপনারা দেননি।"

"বি সেনসিবল", জয় ঠান্ডা গলায় বলল, "অত টাকা কি দেওয়া যায় হঠাৎ করে?"

"সেটা আপনাদের প্রবলেম। তবে পরেরবার না দিলে, মানে দুপুর

দুটোয় আগের এক প্লাস এখনকার এক না দিলে পরের সাংবাদিক সম্মেলনটায় কিন্তু অন্য কিছু বলতে হবে,” প্রিমো হাসল, “বাই দ্য ওয়ে, ম্যাডাম খুব ভাল কথা বলেন। এটাও খুব ভাল সামলেছেন। তবে পরেরটা কিন্তু শর্ট সার্কিট বলে আর পার পাওয়া যাবে না। শুনুন আপনারা, পরের এক্সপ্লোশন উইল বি বিগ। প্লিজ় কিছু পেটি ডলারের জন্য মানুষকে কিন্তু মারবেন না। আই উইল ওয়েট টু হিয়ার দ্য ডলার রিং।”

সবার চোখের সামনে আবার আগের মতোই টুপ করে বন্ধ হয়ে গেল স্ক্রিনের মোবাইল লোকেশন। প্রিমো আবার ডুবে গেল কলকাতার মানুষের সমুদ্রে!

১০

ফোনটা কেটে প্রিমো অন্য মোবাইল বের করল। তারপর দ্রুত হাতে ডায়াল করল একটা নম্বর। আর এশিয়া মহাদেশ ছাড়িয়ে ইয়োরোপে ছড়িয়ে পড়ল সেই ডাক। অস্ট্রিয়ার শান্ত এক পাহাড়ের কোলে, এক গির্জায় বেজে উঠল মোবাইল। নিজের বড় ঘরে বসে থাকা ফাদার তাকালেন টেবিলের উপর রাখা মোবাইলটার দিকে। দেখলেন চেনা নামটা। তারপর চোখ রাখলেন উলটোদিকে বসা সুট পরা শক্তপোক্ত লোকটার চোখে। লোকটার নাম ব্রুনো। চোখে চোখ পড়ায় ব্রুনো হাসল। তারপর জার্মান উচ্চারণে ভাঙা ইংরেজিতে বলল, “ফোনটা ধরুন।”

ফাদার কানের হিয়ারিং-এডটা ঠিক করে ফোনটা ধরলেন, “আমি আর আমরা ঠিক আছি। আপাতত।”

ব্রুনো ওর নীল চোখ দুটো দিয়ে তাকাল ফাদারের দিকে। তারপর নরম গলায় বলল, “এবার রেখে দিন ফোনটা।”

সি এম ফোনটা রেখে তাকালেন ঘরে বসা সকলের দিকে। তারপর টেবিল থেকে গ্লাস তুলে জল খেলেন একটু। বললেন,"টাকার বন্দোবস্ত হয়ে গিয়েছে। পি এম নিজে পুরো ব্যাপারটা শুনলেন। তারপর চিদাম্বরমজির সঙ্গে কথা বলে টাকার বন্দোবস্ত করতে বলেছেন। উই কান্ট টেক এনি রিস্ক।"

সারা ঘরে অদ্ভুত এক নিস্তব্ধতা। কে আগে কী বলবেন, সেটাই যেন বুঝে উঠতে পারছেন না কেউ। একটু পরে চিফ সেক্রেটারি সমরবাবুই প্রথম কথা বললেন,"আই ফিল পাওয়ারলেস ম্যাডাম। একটা পেটি ক্রিমিনালের সামনে আমাদের এইভাবে নুয়ে পড়তে হচ্ছে! আনফরচুনেট বলাটা কম বলা হবে। এত বড় একটা শহর, পুজোর এমন ভিড়, তার মধ্যে কোথায় খুঁজব আমরা লোকটাকে! যত সময় যাচ্ছে, পুজোর ভিড় বাড়ছে! এই ভিড়ে কোথায় পাব তাকে। আর তাকে তো আইডেন্টিফাইও করা যাচ্ছে না! সে কার সঙ্গে যুক্ত, কী তার পাস্ট রেকর্ড, কিছুই জানা যাচ্ছে না! লোকটা যেন ফেসলেস ডেভিল! এখন না হয় ডলার দিয়ে মেটানো হল, কিন্তু তারপর লঞ্চ কোডের ব্যাপারটা? সেটা কি দেওয়া সম্ভব কখনও? দেশের সিকিয়োরিটি উইল বি অ্যাট স্টেক! আবার না দিলেও কত লোককে যে বোমা মেরে উড়িয়ে দেবে, তার ঠিক নেই!"

জয় বলল, "স্যার, লোকটা আবার দুটোর সময় ফোন করবে, তখন আমি চেষ্টা করব অন্যভাবে ট্যাকল করতে," তারপর আদিলের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, "তোমার কোনও প্ল্যান আছে?"

আদিল মাথা নাড়ল "আছে।"

সঙ্গে সঙ্গে সারা ঘরের চোখ ঘুরে গেল আদিলের দিকে। শশীকান্তজি জিজ্ঞেস করলেন, "আছে তো বলছ না কেন? কী প্ল্যান তোমার?"

“একটা চপার বা হেলিকপ্টার লাগবে স্যার,” আদিল বলল ছোট্ট করে।

“হেলিকপ্টার?” হৃদয়েশ জিজ্ঞেস করলেন, “তার জন্য তো পারমিশন লাগবে।”

“হয়ে যাবে”, সি এম কথাটা বলেই তাকালেন আদিলের দিকে, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, “তোমার প্ল্যানটা কী? হেলিকপ্টার দিয়ে কী হবে?”

আদিল বলল, “ম্যাডাম, খুব সিম্পল একটা মেথড। জিপিএস ট্র্যাকার নিয়ে আমি আকাশে উড়ব। প্রিমো যখন ফোন করবে, তখন ও কোন লোকেশনে আছে সেটা আপনাদের সঙ্গে আমিও দেখতে পারব। আর সেটা পেলেই চপার থেকে রাস্তায় নেমে আমি ট্র্যাক করতে করতে দেখব ওকে পাই কি না!”

“কিন্তু,” জয় বলল, “ও তো অফ করে দিচ্ছে ফোন।”

“স্যার, সেটা আপনাকে দেখতে হবে। দেখতে হবে, যাতে ও বেশি সময় লাইনে থাকে। মেক হিম টক। যা খুশি বলে ওকে যতটা সময় পারা যায়, আটকে রাখতে হবে লাইনে। আমায় সময় দেবেন, যাতে ওকে ট্যাপ করতে পারি।”

সি এম ঘড়ি দেখলেন। তারপর ডিফেন্স সেক্রেটারিকে বললেন, “শশীকান্তজি আপনি একটু আর্মিতে কথা বলুন, যাতে এখনই হেলিকপ্টার পাওয়া যায়। দেখবেন, প্রোটোকলে যেন না আটকায় কোথাও। ইটস অ্যান এমারজেন্সি!”

শশীকান্তজি নিজেই ফোনটা টেনে ডায়াল করতে লাগলেন।

সি এম জিজ্ঞেস করলেন, “আদিল তুমি প্যারাশুটে করে আকাশ থেকে নামবে?”

“দেখি ম্যাডাম। রোপেও নামতে পারি, ফ্রি ফলও হতে পারে।”

জয় বলল, “ম্যাডাম, এই মার্কোসরা এক-একজন এক-একটা জেমস বন্ড। দে আর দ্য বেস্ট কমান্ডোস।”

সি এম চিন্তিত মুখে বললেন, "যা সিচুয়েশন মনে হচ্ছে, উই নিড সামথিং মোর দ্যান জাস্ট বেস্ট। উই নিড এক্সট্রা-অর্ডিনারি।"

আদিল বলল, "আপনি ভরসা করতে পারেন ম্যাডাম। ক্রিমিনাল যতই লুনাটিক বা বুদ্ধিমান হোক না কেন, সে একটা চান্স দেবেই।"

শশীকান্তজি ফোনটা রেখে বললেন, "আমি কথা বলে নিয়েছি। চপার আসছে। এখন আমাদের চান্সটা তৈরি করে নিতে হবে। ইডেন গার্ডেনসে-এর সামনের মাঠে চপারটা থাকবে। ইউ জাস্ট মেক ইট ফাস্ট বয়। আমরা তোমার উপর নির্ভর করে আছি, এটা মনে রেখো।"

১২

পকেট থেকে অন্য ফোনটা বের করল প্রিমো। এটা অন করাই থাকে। তবে এটা ট্র্যাক করা যাবে না। সেভাবেই প্রোগ্রাম করা।

ফোনটা সাইলেন্ট থাকলেও ভাইব্রেট করায় বুঝল যে, কল এসেছে একটা। ও জানে এটা কার কল। না, সামনাসামনি চেনে না তাকে। যা কথা ফোনেই হয়েছে। তবে জানে, কলটা আসছে লাইন অফ কন্ট্রোলের ওপার থেকে।

প্রিমো ফোনটা কানে লাগিয়ে বলল, "হ্যাঁ, বলো।"

"কলকাতার পুজো কেমন লাগছে?" ওপাশের গলাটা হালকাভাবে হাসল।

"ফাদারের যেন কিছু না হয়," প্রিমো গম্ভীর গলায় বলল।

"তুমি তো কল করে কথা বললে। লঞ্চ কোডটা এনে দাও, ফাদার ঠিক থাকবে।"

"আমি চেষ্টা করছি," প্রিমো চোয়াল শক্ত করল, "তবে এটা টাফ। কেউ নিজের নিউক্লিয়ার ওয়েপন অন্য কাউকে দিয়ে দেয় কি?"

"দ্যাট ইজ় নট আওয়ার কনসার্ন। তুমি তোমার কাজ করো। না হলে কিন্তু ফাদারের অবস্থা খারাপ হবে। আমাদের মাত্র একটা লোক ওর সামনে বসে আছে বটে, কিন্তু জেনো, একটা বুড়ো আর অরফ্যানেজের বাচ্চাগুলোকে মারতে ওই যথেষ্ট।"

"কিন্তু..." প্রিমো কথাটা শেষ করতে পারল না। তার আগেই কট করে কেটে গেল লাইনটা। চোয়াল শক্ত করে মুখে এসে যাওয়া খারাপ কথাটা আটকাল প্রিমো। তারপর চারদিকে দেখল। সামনেই পরীক্ষিৎ ব্যায়াম সমিতির পুজো প্যান্ডেল। খুব নাম করা পুজো। দুপুর দুটো বাজে এখন। ডলার নিশ্চয়ই চলে এসেছে। ও জানে, মরিশাস থেকে টনি ওকে যে-কোনও মুহূর্তে ফোন করে টাকা ট্রান্সফারের রিপোর্ট জানিয়ে দেবে।

চারদিকের ভিড়ের দিকে তাকিয়ে ভাল করে দেখল প্রিমো। কত নিশ্চিন্ত মানুষ! তারা জানেও না কী বিপদ ঘুরছে ওদের মাথায়। এতগুলো প্রাণ! আর ওইদিকে ফাদার আর বাচ্চারা! জীবন আর কতবার ওকে ফেলবে এমন অবস্থায়?

না, নিজেকে সামলাতে হবে। হাতের কাজটা শেষ করতে হবে। মনে রাখতে হবে ও প্রফেশনাল।

ক্লিং করে ফোনটা বেজে উঠল আবার। মেসেজ। প্রিমো দেখল টনি পাঠিয়েছে। টু মিলিয়ন রিসিভড অ্যান্ড সেফলি ডেসপ্যাচড।

মনে মনে হাসল প্রিমো। অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকে গিয়েছে। তবে ওর টাকা নয়। অন্যের টাকা। কেন অন্যের টাকার জন্য এত খাটছে ও? ফাদার আর বাচ্চারা ছাড়া আর কী পাবে ও?

প্রিমো সুইচ্‌ড অফ হয়ে থাকা মোবাইল অন করল। তারপর সেখানে সেভ করা একটা মাত্র নম্বরই ডায়েল করে কানে লাগানো ব্লু-টুথ হেডসেটটা হাত দিয়ে অ্যাডজাস্ট করে নিল।

রিং হচ্ছে। প্রিমো নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়ে সামনে দিয়ে আসা এক ঢল মানুষের ভিড়ে গুঁজে দিল নিজেকে।

সামনের স্ক্রিনে মোবাইলের টাওয়ার লোকেশন ফুটে উঠল। জয় সকলের দিকে তাকিয়ে বলল, "এটা কোথায়?" তারপর স্ক্রিনে রাস্তার নামটা পড়ে বলল, "বিবেকানন্দ রোড! ও এখনও উত্তর কলকাতায় আছে!"

"পরীক্ষিৎ ব্যায়াম সমিতি", সমরবাবু চাপা গলায় বললেন, "ওই পুজো প্যান্ডেলের কাছাকাছি আছে লোকটা।"

জয় স্বাভাবিক গলায় বলল, "হ্যালো প্রিমো। তোমার টাকা চলে গিয়েছে।"

"জানি তো", প্রিমো হাসল, "তা আমার পরের বায়নাটা?"

জয় চোখ দিয়ে ইঙ্গিত করল কমিশনার পচনন্দাজিকে। উনি পাশে দাঁড়ানো একজন অফিসারকে মাথা নেড়ে নির্দেশ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অফিসারটি কম্পিউটারে কয়েকটা কম্যান্ড টাইপ করল আর সামনের স্ক্রিনের মোবাইল টাওয়ার লোকেশনের ফিডটা ট্র্যান্সমিট হয়ে গেল হেলিকপ্টারে বসে থাকা আদিলের কাছে।

জয় বলল, "তুমি তো বিস্কিট বা লজেন্সের জন্য বায়না করছ না। জানোই তো, যেটা চাইছ, সেটা কোনও দেশই দেবে না। তার চেয়ে অন্য কিছু ভাবো।"

সি এম ঘড়ি দেখলেন। আকাশপথে ইডেন গার্ডেন্সের সামনের মাঠ থেকে বিবেকানন্দ রোড চার কিলোমিটার মতো। যেতে কয়েক সেকেন্ড লাগবে মাত্র। তবে কোথায় আর কীভাবে ল্যান্ড করবে আদিল, সেটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। রাস্তার লোকজনও খুব অবাক হবে হঠাৎ হেলিকপ্টার দেখে!

এতক্ষণে নিশ্চয়ই আদিলের হেলিকপ্টার পৌঁছে গিয়েছে বিবেকানন্দ রোডের মাথায়। ও কি খুঁজে পাবে কোথায় আছে শয়তানটা?

"আমি আর কী ভাবব? আমার তো ভাবাভাবি শেষ হয়ে গিয়েছে। শুনুন না", প্রিমো বন্ধুত্বপূর্ণ গলায় বলল, "বাবুঘাটের কাছে একটা বড় লঞ্চে সি-৪ মানে আর ডি এক্স-এর একটা ছোট্ট প্যাকেট রাখা আছে। তবে সেটা কিন্তু আগের মতো নির্বিষ নয়। বরং তাতে ডিটোনেটর গোঁজা আছে। আমি যদি রিমোট দিয়ে অন করি, তবে মিনিট দশেকের মধ্যে ফাটবে সেটা। আর ফাটলে আশপাশের আরও চার-পাঁচটা লঞ্চও উড়ে যাবে। আপনারা যখন বলছেন আমার বায়না মেটাবেন না, তখন আমি না হয় এটা ওটা ভাঙতে শুরু করি, বাচ্চারা যেমন করে আর কী! মনে রাখবেন, এরপর কিন্তু ভাঙব হাওড়া ব্রিজ। এই নিন অন করলাম বোমাটা। পারলে বাঁচান নিজেদের। আমি আবার পরে ফোন করব, কেমন?"

"প্রিমো, প্লিজ় প্রিমো, ডোন্ট ডু ইট। প্লিজ়," জয় স্পিকারের উপর ঝুঁকে পড়ল।

"অন করে দিয়েছি তো। এটা ইররিভার্সিবল। ওখানে গিয়ে ডি-অ্যাক্টিভেট করতে পারলে করুন। না হলে ঠিক করুন আবার প্রেসকে শর্ট সার্কিট বলবেন কিনা! তবে, একটা হিন্ট দিই। ব্রাইড অফ দ্য সি-র হার্ট। দেখুন পারেন কিনা ধাঁধাটা বুঝতে।"

আর কেউ কিছু বলার আগেই ফোনটা কেটে গেল।

১৪

পরীক্ষিৎ ব্যায়াম সমিতির প্যান্ডেলের মাথার অনেকটা উপরে হেলিকপ্টারে বসে স্থির হয়ে গেল আদিল। ও প্যারাশুট দিয়ে ঝাঁপ দেবে বলে তৈরি হয়েছিল, কিন্তু শেষ কথাটাতেই কেমন যেন আটকে গেল। আর-একটা বোমা! সর্বনাশ। আসলে আগেই হয়তো ঝাঁপ দিত

ও, কিন্তু চারিদিকে এত বাঁশের স্ট্রাকচার, এতরকম প্যান্ডেলের লাইটিং পোস্ট আর ওভারহেড তার, যে প্যারাশুট নিয়ে নামা খুব একটা সহজ নয়।

আদিল দেখল, ওর সামনের স্ক্রিনে মোবাইলের লোকেশন নিভে গেল। মানে আবার হারিয়ে গেল প্রিমো!

"হ্যালো", সঙ্গে সঙ্গে হেলিকপ্টারের স্পিকারে জয়ের গলা পেল আদিল, "মিস্টার পচনন্দা কিছু বলবেন তোমায়।"

পচনন্দাজি বললেন,"শুনলে তো। বাবুঘাট অঞ্চলে পুলিশ প্যাট্রোল আছে বটে, কিন্তু বম্ব ডিঅ্যাক্টিভেট করার মতো বম্ব স্কোয়াডের লোকেদের লালবাজার থেকে ভিড় ঠেলে ওখানে পৌঁছোতে অনেক সময় লাগবে। ইউ জাস্ট হ্যাভ দ্য এয়ার অ্যাডভান্টেজ।"

"ও কে, আমি যাচ্ছি", আদিল পাশে বসা পাইলটকে ইঙ্গিত করল বাবুঘাটের দিকে যেতে। তারপর বলল,"কিন্তু ওখানে তো অনেক লঞ্চ থাকে, কোনটায় বোমা আছে কী করে বুঝব?"

জয় উত্তরে বলল, "জানি না। ইউ জাস্ট ট্রাই। ও তো বলল ব্রাইড অফ দ্য সি। জানি না, এর কী মানে। যাই করো, জাস্ট ওই লুনাটিকটাকে আটকাও।"

১৫

গঙ্গার উপর অনেকটা নেমে এসে হেলিকপ্টারটা জল থেকে পঞ্চাশ মিটারের মতো উচ্চতায় হোভার করতে লাগল। দরজা দিয়ে ঝুঁকে আদিল দেখল, সার সার লঞ্চ দাঁড় করানো আছে। এর মধ্যেই কি কোনও একটাতে লুকোনো আছে বোমা?

বোমা নিয়ে মার্কোসদের পড়াশোনা করতে হয়। এই সম্বন্ধে ডিটেল

জানতেই হয় ওদের। তাই সি-৪ মানে আর ডি এক্স নিয়ে জ্ঞান আছে আদিলের।

এই সাবানের মতো জিনিসটা অদ্ভুত! যেমন খুশি আকার দেওয়া যায়। ছুড়ে মারলে বা আগুন লাগলে ফাটে না। কিন্তু কোনও ডিটোনেটর দিয়ে বিস্ফোরণ ঘটালে প্রচণ্ড শব্দে ফেটে পড়ে। এই কারণে এটাই এখন সন্ত্রাসবাদীদের সবচেয়ে পছন্দের অস্ত্র। লাইট, অ্যাডাপ্টেবল অ্যান্ড ডেডলি!

প্রায় দশটা লঞ্চ গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে পাশাপাশি। আদিল হিসাব করে দেখল যে, সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে, যদি মাঝখানের লঞ্চগুলোর একটায় আর ডি এক্স থাকে।

গঙ্গার পাশে এরই মধ্যে বেশ কিছু পুলিশ এসে জমা হয়েছে। আদিল বুঝল খবর দেওয়া হয়েছে। পুলিশ লোকজনদের যতটা সম্ভব দূরে সরিয়ে রাখছে। কাছেই ফোর্ট উইলিয়াম। তবে সৈন্যবাহিনীকে এখনও ইনভলভ করা হয়নি।

ঘড়ি দেখল আদিল। প্রায় আড়াই মিনিট হয়ে গিয়েছে। প্রিমো যদি সত্যি কোনও বোমা লুকিয়ে রাখে, তবে আর মাত্র সাড়ে সাত মিনিট বাকি। দশটা লঞ্চ আছে এখানে। কিছুটা দূরে আরও খানছয়েক লঞ্চ রাখা আছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। ওগুলোতে বোমা না থাকার চান্সই বেশি।

আদিল হেলিকপ্টার থেকে দড়ি ঝুলিয়ে তরতর করে নেমে এল মাঝের লঞ্চে।

পুরনো একটা লঞ্চ। খয়েরি রঙের। নাম পেয়ারি। এটা তো মিলছে না। ব্রাইড অফ দ্য সি তো নাম নয়! তবে?

আদিল দ্রুত একলাফে পাশের লঞ্চে গেল। এটার নাম বাহাদুর। নাহ্! এটাও তো মিলছে না। তবে? ব্রাইড অফ দ্য সি কি অন্য কিছু?

ঘেমে উঠল আদিল। তবে মাথা ঠান্ডা রাখল। ফোকাস ঠিক রাখাটাই মার্কোসদের ট্রেনিং-এর আসল কথা। মিনিট তিনেকের মধ্যে ও দশটা

লঞ্চ ঘুরে দেখল। কোনওটার নামই ব্রাইড অফ দ্য সি নয়। তবে কি প্রিমো মিথ্যে কথা বলল? কিন্তু এমন ক্রিমিনালরা তো মিথ্যে বলে না। বরং এমন নানা হিন্ট দিয়ে লেজে খেলায় এরা। নিজেদের বুদ্ধি নিয়ে অদ্ভুত একটা অহংকার কাজ করে এদের।

আচমকা কোমরের কাছের ফোনটা বেজে উঠল। জয় কুমার।

"ইয়েস স্যর," আদিল ফোনটা ধরে ঠোঁট কামড়াল। সময় নষ্ট হচ্ছে। জয় কি বুঝতে পারছে না?

"কিছু পেলে?" জয়ের গলায় টেনশন।

"স্যর, আয়্যাম লুকিং ফর ইট। টাইম ইজ রানিং আউট। আমি পরে রিপোর্ট করছি। রাখছি।"

জয়কে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ফোনটা কেটে পকেটে রাখল আদিল। তারপর বাঁদিকের কোমরে ঝোলানো দূরবিনটা নিয়ে চোখে লাগিয়ে দূরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লঞ্চগুলো দেখল। সায়রা, জলি, ভেনিস, চণ্ডীমাতা, রূপসি আর জলপরি। নামগুলো দেখে হতাশ হল আদিল। ব্রাইড অফ দ্য সি তো নেই! তবে?

সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। হাতের ঘড়িতে মাইক্রো সেকেন্ড আর সেকেন্ডের ডিজিটাল কাউন্টডাউন যেন খুব দ্রুত হয়ে চলেছে।

আদিল চোখ বন্ধ করল। কী মানে হতে পারে এটার? কী মানে হতে পারে? আচমকা চোখের সামনে একটা দৃশ্য ভেসে ওঠায় যেন ছ্যাঁকা খেল ও। বছর দুয়েক আগে ইতালীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে একটা জয়েন্ট এক্সারসাইজ হয়েছিল ওদের। সেটার শেষে আদিলরা একটু ঘুরে দেখেছিল দেশটা।

রবের্তো বলে একজন ইতালীয় কম্যান্ডোর সঙ্গে ভাল বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল ওর। ঘুরে বেড়ানোর সময় একটা শহরে ঢোকার আগে বড় সাইনবোর্ডে লেখা ছিল, 'Benvenuto alla sposa del mare'। আদিল সেটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, "এটার মানে কী রবের্তো?"

রবের্তো হেসে ভাঙা ইংরিজিতে বলেছিল, "এটার মানে Welcome

to the bride of the sea। আমাদের সবচেয়ে প্রিয় শহর এটা। আদিল তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছি ভেনিসে।"

ভেনিস! ব্রাইড অফ দ্য সি!

ওয়াকিটকিতে হেলিকপ্টারের পাইলটকে আদিল ছোট্ট করে বলল যে, দূরে দাঁড়ানো সবুজ রঙের লঞ্চের দিকে যেন নিয়ে যায় ওকে। তারপর হেলিকপ্টার থেকে ঝোলানো দড়িটা হাতে আর পায়ে পেঁচিয়ে ঝুলে রইল আদিল। নিমেষের মধ্যে ভেনিস নামের লঞ্চে পৌঁছে গেল ও।

এবার হার্ট! সেটা কী? আদিল ঘড়ি দেখল। আর তিন মিনিট বাকি। হার্ট খুঁজে বের করতে হবে ওকে। কিন্তু কী হতে পারে হার্ট? একটা যানের হৃৎপিণ্ড কী হতে পারে? ইঞ্জিন! নিশ্চয়ই ইঞ্জিন।

আদিল জানে, এমন লঞ্চের ইঞ্জিন কোথায় থাকতে পারে। ও পড়িমরি করে দৌড়োল। ইঞ্জিনরুমে পৌঁছে এদিক-ওদিক তাকাল আদিল। আর মিনিট দু'য়েক বাকি। কোথায় বোমা?

লঞ্চটা কেমন যেন পরিত্যক্ত ধরনের! বাইরের দরজা দিয়ে বিকেলের চা-রঙের আলো ঢুকে আসছে। বাকিটা কেমন যেন সিপিয়া টোনের ছবির মতো!

আদিল ইঞ্জিনের আশপাশে খুঁজতে লাগল দ্রুত। সময় কমে আসছে। আর দেড় মিনিট। আদিল পাগলের মতো এদিক-ওদিক দেখতে লাগল। সোয়া এক মিনিট। এক মিনিট। কোথায় বোমা? ইঞ্জিনের কাছে তো কিছু নেই! তবে?

আদিল বুঝল একটা ঘামের বুদবুদ দ্রুত নেমে আসছে কানের পিছন দিয়ে। আর পঞ্চাশ সেকেন্ড। তবে কি ইচ্ছে করে ছুটিয়ে মারল ওকে? আর তিরিশ সেকেন্ড। কোমরে হাত দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল আদিল। আর সঙ্গে সঙ্গে মাথায় ঝুলন্ত কী একটা জিনিসে যেন ধাক্কা খেল! আধো অন্ধকারে ঠিক বুঝতে পারেনি আগে। কী এটা?

আদিল মোবাইলের স্ক্রিনের আলোয় দেখল জিনিসটা। সুতো দিয়ে

একটা হার্ট শেপের কী যেন ঝুলছে! একটানে সেটা খুলে নিল আদিল। হাতে নিয়ে বুঝল, এটাই আর ডি এক্স। হৃৎপিণ্ডের মতো দেখতে ড্যাঙ্গলার বানানো হয়েছে। আর কুড়ি সেকেন্ড বাকি।

আদিল হাতের চাপে নরম জিনিসটাকে ভেঙে ফেলল। দেখল, ওর ভিতরে একটা ছোট্ট ডিজিটাল ঘড়িতে দ্রুত কমে আসছে সময়। ঘড়ির সঙ্গে দুটো ছোট ডিটোনেটর স্টিক গোঁজা। আর ছ'সেকেন্ড বাকি। আদিল দ্রুত কোমরের পাউচ থেকে একটা কাটার বের করে ডিটোনেটরের সবুজ আর হলুদ তার দুটো খুব সাবধানে কুচ করে কেটে দিল। দেখল, ঠিক দু'সেকেন্ড আগে থেমে গেল ঘড়িটা।

ঢোঁক গিলল আদিল। হাত দিয়ে ঘাম মুছল কপালের। আর ডি এক্স দিয়ে যে এমন একটা হার্ট আকারের জিনিস বানিয়ে রাখবে লোকটা, বুঝতেই পারেনি। তবে এমন একটা আইসোলেটেড লঞ্চে কেন যে বোমাটা রাখল প্রিমো, সেটা বুঝতে পারছে না আদিল। এখানে বোমা ফাটলে তো লঞ্চ ছাড়া আর বিশেষ কিছুর ক্ষতিই হত না। তবে কি এটাও জাস্ট ওয়ার্নিং ছিল? আসল চালটা কি ও শেষের জন্য জমিয়ে রেখেছে?

ইঞ্জিন রুমের বাইরে এসে দাঁড়াল আদিল। দূরে সূর্য ক্রমশ গড়াচ্ছে পশ্চিম আকাশের দিকে। সামনের শহর আরও মেতে উঠছে উৎসবে। আরও বাড়িয়ে তুলছে তার রোশনাই। কিন্তু তারা বুঝতেই পারছে না, সর্বনাশের কত বড় একটা মেঘ এসে ঘিরে ধরেছে তাদের।

১৬

ব্রুনোর মুখটা যেন ঠিক বড়সড় একটা টার্কির মতো। লোকটা কথা বলে খুব কম। শুধু ফাদার যেখানেই যাচ্ছেন, সেখানে ঘুরছে পিছন পিছন। এক মুহূর্ত চোখের আড়াল করছে না।

ফাদার চার্চের লম্বা বারান্দা দিয়ে হেঁটে সামনের বড় বাগানটায় নামলেন, সেখানেও সঙ্গে চলে এল ব্রুনো।

ফাদার হাসলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা আমাদের নিয়ে কী করতে চাও?"

ব্রুনো কিছু না বলে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

ফাদার বললেন, "ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে তোমার? তার কাছে কী বলবে মৃত্যুর পরে?"

ব্রুনো কিছু না বলে তাকিয়ে রইল।

ফাদার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর ব্রুনোর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে তাকালেন দূরের মা মেরির মূর্তির দিকে। নরম একটা লেবু-হলুদ রোদ ছড়িয়ে আছে চারদিকে। সেই আলোয় মা মেরির ছায়াটা কেমন যেন নীলচে লাগছে।

ফাদার ঘুরে তাকালেন ব্রুনোর দিকে। লম্বা রোবের পকেটের ভিতরে হাতের মুঠিটা শক্ত হয়ে উঠল আচমকা। ফাদার নিজেকে সামলালেন। ভিয়েতনাম যুদ্ধের স্মৃতি ফিরে আসছে। ভিয়েতনামি গ্রামে চারজন ভিয়েত কং-কে একা খালি হাতে মেরে ফেলাটা এত বছর পরেও মনে পড়ে যাচ্ছে আবার! হে ঈশ্বর! ফাদার চোখ বন্ধ করে প্রভু যিশুর কথা মনে করলেন। বললেন, "হে প্রভু, রক্তক্ষয় বন্ধ করো। আমায় শান্ত করো। মানুষের রক্ত বড় সাংঘাতিক। সহজে তা মোছে না। All the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand।"

ফাদার দূরের পাহাড়ের দিকে তাকালেন। ভাবলেন, কিন্তু যদি প্রয়োজন হয়? তবে কি আবার ফাদারের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসবে ভিয়েতনাম যুদ্ধের সেই কুড়ি বছরের দামাল ছেলেটা?

সন্ধে ছ'টায় আর-এক কিস্তির টাকা পাঠানোর পরে শশীকান্তজি মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। বললেন, "পি এম আমায় ফোন করেছিলেন। এখনও টাকা পাঠাতে হচ্ছে দেখে খুব দুশ্চিন্তা করছিলেন। আমরা কিছুই করতে পারছি না? মার্কোসকে যে আমি ডাকলাম, তাতে কী লাভ হল তবে?"

জয় বলল, "স্যার, আদিল না থাকলে কিন্তু খুব বড় একটা বিস্ফোরণ হতে পারত। ও কিন্তু ঠেকিয়ে দিয়েছে। আপনি স্যার ওঁকে ডেকে ঠিক করেছেন।"

"কিন্তু প্রিমো বলে ওই লোকটাকে কি ধরতে পেরেছে?" শশীকান্তজি সামান্য অধৈর্য হলেন, "আর মাত্র চার ঘণ্টা বাকি। যদি একটা কিছু হয়ে যায়, কত বড় সর্বনাশ হবে, সেটা কি কেউ বুঝতে পারছে না?"

সি এম নিজের চেয়ার থেকে উঠে শশীকান্তজির কাছে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, "আপনি উত্তেজিত হবেন না। আদিল ঠিক কিছু একটা বন্দোবস্ত করবেই।"

"কিন্তু কী করবে ম্যাডাম?" শশীকান্তজি সামান্য হতাশ গলায় বললেন, "একটা লোক এভাবে আমাদের নাচাচ্ছে!"

জয় বলল, "আর-একবার ফোন করলেই হবে। আওয়ার প্ল্যান ওয়াজ রাইট। শুধু লাস্ট মোমেন্টে যদি বম্ব ডিঅ্যাক্টিভেট করার ব্যাপারটা না থাকত, তবে এতক্ষণে বাছাধন ধরা পড়ে যেত।"

"কিন্তু অতটা সময় পাওয়ার পরেও কেন লাফাল না আদিল?" শশীকান্তজি জিজ্ঞেস করলেন।

জয় বলল, "স্যার, প্যারাশুট নিয়ে অমন কনজেস্টেড জায়গায় লাফানো খুব কঠিন।"

"কিন্তু আমরা কেন তৈরি করেছি মার্কোস? যা তুমি আমি পারব না, তা তো ওরাই করবে! তবে?"

জয় উত্তর না দিয়ে বলল, "কিন্তু লোকটা তো আর ফোন করছে না! কেন করছে না? আদিল তো হেলিকপ্টার নিয়ে অপেক্ষা করছে! তবে?"

সমরবাবু, সি এম-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, "ডিফেন্স মিনিস্টার যে-কোনও সময় চলে আসবেন। তবে খবরটা মিডিয়া থেকে দূরেই রেখেছি আমরা। জানি না নিউক্লিয়ার কম্যান্ড অথরিটি কী ঠিক করবেন লঞ্চ কোডের ব্যাপারে! এমনিতেই হেলিকপ্টার নিয়ে গঙ্গার বুকে কেন লোক নামানো হয়েছে, সেই নিয়ে বেশ কিছু ফোন আসছে।"

"সমরবাবু এসব নিয়ে আমি ভাবছি না। আমি ভাবছি যে, মাত্র চার ঘণ্টা পরে কী হবে? আমি তো ডিফেন্স মিনিস্টারের সঙ্গে কথা বললাম লঞ্চ কোড নিয়ে। উনি বললেন যে, এন সি এ হেড হিসেবে এই ব্যাপারে পি এম-ই ডিসিশন নেবেন।"

সি এম চিন্তিতমুখে পচনন্দাজিকে বললেন, "আপনি কতটা প্রিকশন নিলেন?"

পচনন্দাজি বললেন, "যতটা সম্ভব পুলিশ আমি ডিপ্লয় করে দিয়েছি। এ ছাড়া সি আর পি এফ আর র‍্যাফও বলেছি। কিন্তু আচমকা ফোর্স এসক্যালেশন করলে প্যানিক তৈরি হবে। আর ম্যাডাম, জেনারেল হিস্টিরিয়া হলে তো বুঝতেই পারছেন কী হতে পারে!"

সি এম কিছু বলতে যাবেন, ঠিক সেই সময়ে আবার ফোনটা বেজে উঠল সামনে। জয় হামলে পড়ে ফোনের স্পিকারটা অন করল।

"গুড ইভনিং, আপনারা খুব সুন্দরভাবে বোমাটা ডিফিউজ করেছেন। ব্রাভো! আর এইবারের ডলারটাও পেয়ে গিয়েছি। তবে লঞ্চ কোডটার কী হবে বলতে পারেন কি?"

জয় বলল, "বি সেনসিবল। কোনও দেশ কি নিজের পারমাণবিক অস্ত্র অন্যের হাতে তুলে দেয়? এটা সম্ভব? তার চেয়ে, আমরা আরও কিছু টাকা দিচ্ছি তোমায়, আর এই দেশ থেকে বেরোনোর জন্য সেফ প্যাসেজ দিচ্ছি। এই গোটা ঘটনাটা এখানেই শেষ হোক।"

"টাকাটা তো আপনাদের যে সময় দিলাম আলোচনার জন্য, সেই সময় দেওয়া বাবদ নিলাম। আপনারা এটা ভাববেন না যে, ওটা আমার লক্ষ্য। আসলে আমার চাই আই এন এস চক্র-টু-র নিউক্লিয়ার মিসাইলের কোড।"

"টাকাটা তা হলে লক্ষ্য ছিল না? টাকাটা নিলে কেন তবে?"

"কারণ তো বললাম। আর মনে রাখবেন, যে কাজটা আপনি ভাল পারেন, তা কখনও বিনি পয়সায় করতে নেই, বুঝেছেন?" প্রিমো হাসল, "সাড়ে ছ'টা বাজে। আর সাড়ে তিন ঘণ্টা সময় আছে।"

জয় বলল, "এক সেকেন্ড, প্লিজ এক সেকেন্ড, ফোনটা কেটো না। তুমি কার জন্য করছ এটা? কে করাচ্ছে? এখনও তো কেউ দায় স্বীকার করে ফোন করল না!"

প্রিমো সময় নিল একটু, তারপর বলল, "আপনাদের কি শত্রুর অভাব আছে?"

জয় তাকাল পচনন্দাজির দিকে। চোখ দিয়ে ইঙ্গিত করল একটা। পচনন্দাজি মাথা নেড়ে বোঝালেন যে, আদিল পজিশন নিয়ে নিয়েছে।

জয় হাসল। তারপর কথা চালাতে বলল, "গত হাজার বছরের ইতিহাস বলে যে, ভারত কোনওদিন কাউকে নিজের থেকে আক্রমণ করেনি। তা হলে কেন আমাদের আক্রমণ করা হচ্ছে বারবার?"

প্রিমো হাসল, বলল, "আপনি কারও ক্ষতি করেননি বলে কেউ আপনার ক্ষতি করবে না? আপনি তো অদ্ভুত কথা বললেন! শুনুন, সময় কিন্তু আর নেই। অথরিটিকে বলুন যদি কয়েক হাজার মানুষ না মারতে চান, তবে কোডটা যেন দিয়ে দেন। কেমন?"

১৮

কলেজস্ট্রিটের বেশ কিছুটা উপরে হেলিকপ্টারের দরজায় ঝুলে শেষবারের মতো এল ই ডি স্ক্রিনটা দেখল আদিল। খুব ভুল না করলে কলেজ স্কোয়্যারের ভিড়েই লুকিয়ে আছে প্রিমো। ওর টাওয়ার লোকেশন তাই বলছে। আর অপেক্ষা করল না আদিল। কর্ড বেয়ে দ্রুত নেমে এল নীচে। তারপর ছোট্ট একটা লাফে প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটির ছাদে নেমে পড়ল। হাতের ঘড়িটা অন করে নিল ও। হেলিকপ্টারের ট্র্যাকিং-এর ফিড ভেসে উঠল ঘড়িতে। আদিলের লোকেশন থেকে মোটামুটি সাড়ে চারশো মিটার দূরে দেখা যাচ্ছে প্রিমোর অবস্থান। আর সময় নেই। আদিল ছাদের থেকে কার্নিশ, পাইপ আর গাছের ডাল ধরে ঝুলে নিমেষে নেমে এল মাটিতে। সামনে বড় লোহার গেটটা দেখা যাচ্ছে। ও দ্রুত এগোল গেটের দিকে। এবার আর প্রিমোকে পালাতে দেওয়া চলবে না।

১৯

মুজাফ্ফরাবাদ, পাক অধিকৃত কাশ্মীর

কর্নেল শ্যাঙ ওয়েই অধৈর্য হয়ে ঘড়ি দেখলেন। তারপর সামনে বসা লতিফ শেখকে জিজ্ঞেস করলেন, “এত সময় লাগছে কেন? আদৌ কি কোনও কাজ এগোচ্ছে?”

লতিফ হাসল, সামনে রাখা প্লেট থেকে কাবাবের একটা টুকরো তুলে নিয়ে বলল, “আপনি বড্ড তাড়াহুড়ো করছেন। কাজ ঠিক এগোচ্ছে। আমাদের লোক ঠিক নজর রাখছে সব কিছুর উপর। আপনি শুধু একটা ব্যাপার মাথায় রাখুন। ওই বাইশটা সুড়ঙ্গের অ্যাকসেস। আমাদের আজাদ

কাশ্মীরে আপনারা সুড়ঙ্গ বানাবেন আর আমাদের তার অ্যাকসেস থাকবে না, তা কি হয়?"

ওয়েই হাসলেন ছোট করে। তারপর মাথা নেড়ে বললেন, "আগে কাজটা হোক। দেখা যাক, আপনার লোক কতটা এফিশিয়েন্ট। আর মনে রাখবেন, কোনও প্রমাণ কিন্তু রাখবেন না এবার। ২৬/১১-র ভুল কিন্তু করবেন না। ইন্ডিয়া এবার সহজে ছেড়ে দেবে না। ওরা কিন্তু আপ্রাণ চেষ্টা করবে ডিফেন্ড করার।"

"কিন্তু ওরা পারবে না," লতিফ আর-একটা কাবাবের টুকরো তুলল, "আমাদের প্ল্যান ফুল প্রুফ। জিনিসটা নিয়ে নদীপথে পালাবে আমাদের লোক। সুন্দরবনের খাঁড়িতে জলদস্যুরা অপেক্ষা করবে। ওরা ঠিক বাংলাদেশের সুন্দরবনের একটা ছোট্ট ব-দ্বীপে এনে রাখবে আমাদের লোকটিকে। সেখান থেকে আপনারা আমাদের ডিম্যান্ড মতো জিনিস দিয়ে নিয়ে নেবেন লঞ্চ কোড। আর হিন্দুস্থান লঞ্চকোড না দিলে, ওদের ওই উৎসব শোকে পরিণত হবে। ওরা জানবে, আমাদের কেপেবিলিটি কতটা। মুম্বইয়ে আমরা যা করেছি, কলকাতায় তার দশগুণ হবে। টুইন টাওয়ারের মতো এটাও মনে রাখবে সারা দুনিয়া।"

কর্নেল বললেন, "কোডটা পেয়ে আপনাদের আবার মত পালটে যাবে না তো?"

লতিফ হাসল, "আই এস আই-কে বোকা ভাবার কারণ আছে কি? কেন আমরা শুধু শুধু চিনের সঙ্গে ঝামেলা করব? আমাদের ওসব দরকার নেই। হিন্দুস্থানের থেকে আমাদের যা দরকার, তা আমরা এমনিই নিয়ে নেব।"

এর মিনিটদশেক পরে কর্নেল ওয়েই অফিস থেকে বেরিয়ে বাথরুমের দিকে এগোলেন। তারপর এদিক-ওদিক দেখে পকেট থেকে ফোনটা বের করে বেজিং-এর নম্বর ডায়াল করলেন, ছোট্ট করে বললেন, "ওয়র্ক ইন প্রগ্রেস।" তারপর ফোনটা বন্ধ করে হাসলেন নিজের মনে। ভাবলেন,

পৃথিবীর ইতিহাসে এত ছোট্ট টিম নিয়ে এমন গুরুত্বপূর্ণ অপারেশন আর কোথাও হয়নি কোনওদিন।

২০

ফিস, অস্ট্রিয়া

বাচ্চারা দুপুরের খাবার খেয়ে নিজেদের ঘরে ঘুমোচ্ছে এখন। ফাদার ঘড়ি দেখলেন। বিকেল সোয়া তিনটে বাজে প্রায়। মানে ভারতে এখন সন্ধে পৌনে সাতটা।

এখানে রোদের তেজ তেমন নেই। সবসময়ে কেমন যেন টুরিস্ট গোছের একটা আমুদে হলুদ আভা লেগে থাকে আল্পসের ঠান্ডা হাওয়ায়।

ফাদার দেখলেন, ব্রুনো চুপ করে বসে রয়েছে সামনে। লোকটা কেমন যেন রোবটের মতো। খুনি বলেই কি এমন? যাতে কোনও অ্যাটাচমেন্ট তৈরি না হয়, সেই জন্যই কি এমন চুপ করে দূরে সরিয়ে রাখছে নিজেকে?

ফাদার জানেন, ব্রুনোর কাছে এই বড় ওভারকোটের নীচে একটা ইউ জি সাব মেশিনগান ঝুলছে। তা ছাড়া গোটা চার্চটার বিভিন্ন জায়গায় ব্রুনো আর ডি এক্স লাগিয়ে তার ডিটোনেটরের রিমোট নিজের হাতে রেখেছে। ব্রুনো একা হলেও কতটা ভয়ংকর, সেটা ফাদার ভালই জানেন। জানেন, যারা ওকে পাঠিয়েছে, তারা জেনেই পাঠিয়েছে যে, ব্রুনো একাই একশো।

ফাদার বাইরের জানালা দিয়ে তাকালেন। এত সুন্দর সবুজ ঢেউ খেলানো মাঠ দেখে কে বলবে এইখানে এমন একজন খুনি এসে ঢুকেছে! কে বুঝবে নিরালা এই চার্চে পণবন্দি হয়ে রয়েছে কিছু মানুষ!

ফাদার নিজের জন্য চিন্তা করেন না। তাঁর চিন্তা ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চাগুলোর

জন্য। আর চিন্তা বহুদূরের সেই ছেলেটার জন্যও। ফাদার কি কিছু করতে পারেন না?

ব্রুনো বসে রয়েছে চুপ করে। পাথরের তৈরি একটা মানুষ যেন! কিন্তু কী করতে পারেন ফাদার? বাইরে থেকে নিজেকে শান্ত করে রাখলেও ফাদারের ভিতরে গোটা একটা সমুদ্র উথাল-পাথাল করছে।

২১

ভিড়ের মধ্যে দিয়ে দ্রুত এগোতে লাগল আদিল। হাতঘড়ির ট্র্যাকারে ও এখনও দেখতে পাচ্ছে প্রিমোর মোবাইল টাওয়ারের লোকেশন। জয় এখনও কথা বলে যাচ্ছে! মানে প্রিমোকে এখনও 'লাইভ' করে রাখছে!

আর পঞ্চাশ মিনিট দূরে প্রিমো। ওই জি পি এস লোকেটরগুলো মোটামুটি চার মিটারের মতো অ্যাকিউরেট। অর্থাৎ, যে লোকেশনটা দেখায় তার চার মিটারের মধ্যে লোকটি থাকে।

চারদিকে প্রচণ্ড ভিড়। মানুষ লাইন করে এগোচ্ছে প্যান্ডেলের দিকে। মিড্‌ল স্কোয়্যারের জলের মাঝে করা হয়েছে প্যান্ডেল। সেখানে পাটাতন ফেলে ব্রিজের মতো করে রাখা হয়েছে, যাতে মানুষে সেটা পেরিয়ে ঠাকুর দেখতে পারে। এত লোকের মধ্যে কি আদিল খুঁজে পাবে লোকটাকে?

ঘড়ির লোকেশন দেখে খুব দ্রুত এগোতে লাগল আদিল। মার্কোসের ট্রেনিং-এ পেরিফেরাল ভিউ কী করে তৈরি করতে হয়, তার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে ওদের। তাই চোখ না ঘুরিয়েও আশপাশটা যতটা সম্ভব মেপে নেওয়া আদিলের কাছে কোনও ব্যাপারই নয়।

তাই এই ভিড়েও ও দেখে নিল, আশপাশের মধ্যে পাঁচজন মোবাইলে কথা বলছে। তার মধ্যে দু'জন মেয়ে আর বাকি তিনজনের একজন বৃদ্ধ

আর দু'জন অল্পবয়সি ছেলে। তবে এরা কেউই নয়। কারণ, লোকেটরটা এখনও ওর থেকে পনেরো মিটার দূরে।

আচমকা একটা কথা ধাক্কা খেল আদিলের মনে। আচ্ছা, ও তো এগোচ্ছে, কিন্তু গত তিরিশ সেকেন্ড ধরে প্রিমোর লোকেশন তো বদলাচ্ছে না! কেন?

ভিড়ের ভিতরে যতটা দ্রুত এগোনো যায়, আদিল এগোল। মানুষকে বাঁচিয়ে তাদের ফাঁক দিয়ে ও দ্রুত চলে এল জি পি এস-এ দেখানো জায়গায়।

আশ্চর্য! কেউ তো নেই! এখানে কেউ তো মোবাইলে কথা বলছে না! আদিল দ্রুত ঘুরে নিল এক চক্কর। আরে! লোকেশন দেখাচ্ছে যে, এখানেই আছে প্রিমো, কিন্তু তা হলে কোথায়?

আদিল আর-এক চক্কর ঘুরতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল। দু'হাত দূরে একটা ভিখিরি দাঁড়িয়ে রয়েছে। রাস্তার মানুষের ঢলের পাশের যে বাঁশের ব্যারিকেড দেওয়া থাকে, তার গায়ে হেলান দিয়ে লাঠিতে ভর দেওয়া একজন খোঁড়া ভিখিরি ফ্যালফ্যাল করে নিজের ভিক্ষের বাটির দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

আদিল দ্রুত গিয়ে ঝুঁকে দেখল বাটিতে। একটা মোবাইল ফোন পড়ে আছে বাটির ভিতরে। তার মাথায় ছোট্ট একটা লাল আলো জ্বলছে। অর্থাৎ, মোবাইলটা অন আছে!

আদিল ভিখিরিটাকে দু'হাতে ধরে ঝাঁকিয়ে বলল, "কে দিল এটা? কে দিল? বল?"

ভিখিরিটা ভয় পেয়ে ভিড়ের মধ্যে দেখাল, "ওই দিকে গেল ছেলেটা। কালো জামা পরে আছে।"

"কোনদিকে?" আদিল এদিক-ওদিক তাকাল।

ভিখিরিটা বলল, "ওই দিকে। ওই যে ভিড়ের ভিতর দেখা যাচ্ছে! ওই তো!"

আদিল দেখল কিছুটা দূরে একটা ছেলে এগিয়ে যাচ্ছে। অন্যদের চেয়ে দ্রুতই এগোচ্ছে যেন। ও ভিখিরিটাকে ছেড়ে ভিড়ের ভিতর দৌড় লাগাল।

মানুষকে ঠেলে কিছুটা এগিয়ে গেল আদিল। সামনের ছেলেটাকে ভিড়ের ভিতর হারিয়ে ফেললে চলবে না! আর ঠিক তখনই পিছন থেকে একটা হইচই শুনল।

থমকে দাঁড়িয়ে আদিল পিছন ঘুরল। কী হল ব্যাপারটা? ও দেখল ভিখিরিটা দাঁড়িয়ে নেই আর। বরং রাস্তায় পড়ে রয়েছে মোবাইল, বাটি আর লাঠিটা। দ্রুত এদিক-ওদিক তাকাল আদিল। ওই তো! খোঁড়া ভিখিরিটা দক্ষতার সঙ্গে ভিড় কাটিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে!

আদিল আর সময় নষ্ট না করে ধাওয়া করল ভিখিরির ছদ্মবেশে থাকা প্রিমোকে। ছেলেটা খেলছে! ওদের সঙ্গে এমন করে কানামাছি খেলছে! কেন? দৌড়ের ভিতরেই প্রশ্নটা মাথায় এল আদিলের।

প্রিমো ভিড় কাটিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে কলেজ স্ট্রিট মোড়ের দিকে। আদিল গতি বাড়াল। সামনে দাঁড়ানো চারজন ছেলেকে অবহেলায় ছিটকে দিয়ে ও অনায়াসে টপকে গেল বাঁশের ব্যারিকেড। প্রিমোও ব্যারিকেডের তলা দিয়ে গলে গিয়ে রাস্তায় চলে এল। সার দিয়ে দাঁড়ানো ট্যাক্সি, অটো আর বাসের ভিতর দিয়ে দৌড়োতে লাগল এঁকেবেঁকে। চারপাশের লোকজন দেখছে। সামনে দাঁড়ানো দু'জন পুলিশ ভিড়ের ভিতর এগিয়ে গিয়ে ধরতে গেল প্রিমোকে। প্রিমো শরীরটাকে আচমকা নিচু করে নিয়ে হাতটা ঘোরাল। দু'জন পুলিশ ছিটকে গিয়ে পড়ল পাশে দাঁড়ানো একটা অটোর গায়ে।

আদিল দেখল এভাবে ধরা যাবে না প্রিমোকে। ও চট করে লাফিয়ে হলুদ ট্যাক্সির ডিকি বেয়ে উঠে গেল ছাদের উপর। তারপর এক গাড়ি থেকে অন্য গাড়িতে লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে লাগল। বাসের হাতল ধরে ঝুলে, অটোর সামনের চাকার উপর ভর করে ছিটকে ট্যাক্সির মাথায় উঠে প্রিমোও এগোতে লাগল দ্রুত।

কলেজ স্ট্রিট মোড়ের কাছে এসে আচমকা প্রিমো বাঁদিকের সরু গলিটায় ঢুকে গেল। পুজোর আলোর ভিতরে এই গলিটা বেশ অন্ধকার। প্রিমোকে সেখানে ঢুকতে দেখে আদিল ট্যাক্সির মাথা থেকে লাফিয়ে ফুটপাথ ঘিরে রাখা লোহার রেলিং টপকে দৌড়োল সেইদিকে। দু'জন মানুষ ছিটকে পড়ে গেল ওর ধাক্কায়। আশপাশের লোকজনও নিজেদের বাঁচাতে এ ওর গায়ে গিয়ে পড়ল। কেউ চিৎকার করে উঠল। গালাগালিও দিল কয়েকজন। আবার কেউ 'চোর চোর' বলে হল্লা করে উঠল। আদিল কান দিল না কিছুতেই।

সামনের গলিটা আবছা অন্ধকার। বড় রাস্তায় আলোর রোশনাই বেশি বলেই বোধহয় এই রাস্তাটা এমন আবছায়া লাগছে। আদিল দেখল, জমে থাকা নোংরা, স্ট্যান্ড করা ভ্যান, বন্ধ বইয়ের দোকান টপকে প্রিমো দৌড়োচ্ছে। রাস্তাটা সোজা। এটাই আদিলের সুযোগ। এখান থেকে আবার প্রিমোকে ধরা মুশকিল হয়ে যাবে।

আদিল স্প্রিন্ট টানল। দশ সেকেন্ডের কাছাকাছি সময়ে ও একশো মিটার টানতে পারে যে-কোনও অবস্থায়। এইখানেও দৌড়টা শুরু করল ও।

সামনে রাস্তাটা ইংরেজি 'টি' অক্ষরের মতো হয়ে গিয়েছে। বাঁদিকে গেলে আরও গলির ভিতর ঢুকে গিয়েছে পথ আর ডানদিকে গেলে এম জি রোড।

প্রিমো প্রায় পৌঁছে গিয়েছে রাস্তার মুখে। আদিল গতি বাড়াল। দূরত্ব কমছে খুব তাড়াতাড়ি। রাস্তার মুখের কাছে চলে এসেছে প্রিমো। আদিলও আর হাতদুয়েক দূরে। প্রিমো শেষ চেষ্টাটা করল গতি বাড়ানোর। আদিল আরও কাছে এগিয়ে গেল। এবার একটু হাত বাড়ালেই ধরে ফেলবে।

রাস্তার মোড়ের থেকে ডানদিকে বাঁক নেওয়ার চেষ্টা করল প্রিমো। আদিল সামনে হাত বাড়িয়ে প্রায় ছুঁয়ে ফেলল ওর জামা। আর ঠিক তখনই রাস্তার বাঁদিক থেকে একটা সাইকেল আচমকা বেরিয়ে এসে ধাক্কা মারল আদিলকে।

ব্যাপারটা বুঝতে ওর সময় লাগল একটু। আদিল দেখল, হঠাৎ ওর পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গিয়েছে আর ও পড়ে যাচ্ছে রাস্তায়। ওর পাশে উলটে পড়ছে সাইকেল সমেত চালক ছেলেটা।

প্রিমো পিছনে তাকাল একবার, তারপর গতি বাড়িয়ে বড় রাস্তার দিকে দৌড়ে গেল। আদিল শোওয়া অবস্থাতেই কোমরের থেকে একটা জি পি এস ডট গান বের করে নিমেষের মধ্যে সেটা চালাল দূরের থেকে দূরে চলে যাওয়া প্রিমোর দিকে লক্ষ্য করে।

প্রিমো বুঝল না, কিন্তু একটা ঘড়ির ব্যাটারির মতো জি পি এস ডট ছিটকে গিয়ে আঠার সাহায্যে আটকে গেল ওর প্যান্টের ব্যাক পকেটের গায়ে।

আদিল মাথা নাড়ল। তারপর সাইকেলের ছেলেটাকে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। সামনের রাস্তাটা ফাঁকা। প্রিমো আবার মিশে গিয়েছে কলকাতার ভিড়ে। কিন্তু এবার আর হারিয়ে যেতে পারবে না ও। ডুবে থাকতে পারবে না জনসমুদ্রে।

আদিল নিজের ঘড়িটাকে আবার অ্যাডজাস্ট করল। আর একটা বাসের ভিতর প্রিমোর ব্যাক পকেটের গায়ে আটকে থাকা ডটটা সচল হয়ে উঠল।

আদিল ওর ঘড়ির স্ক্রিনে দেখল, প্রিমো এগিয়ে যাচ্ছে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের দিকে। আদিল আর অপেক্ষা না করে মোবাইল বের করে কল করল জয়কে।

২২

আরাকাপারামবিল কুরিয়ান অ্যান্টনি তাকালেন শশীকান্তজির দিকে। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "মার্কোস কতটা রিলায়েবল?"

শশীকান্তজি ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীকে উত্তরে বললেন, "হি ইজ আওয়ার বেস্ট হোপ স্যার।"

"আমি পি এম-এর সঙ্গে কথা বলেছি। নিউক্লিয়ার কম্যান্ড অথরিটির উনিই চিফ। দেশের সব নিউক্লিয়ার ওয়েপন স্টকপাইলের ডিসিশন নেওয়ার অথরিটি উনি। পি এম বলেছেন যে, লঞ্চ কোডটা শেষমেশ যেন কিছুতেই না পৌঁছোয় শত্রুপক্ষের হাতে। আমাদের যে-কোনও মূল্যে বাঁচাতে হবে ওই কোডটা, তার সঙ্গে কলকাতাকেও। কোডটা শত্রুপক্ষের সামনে আনা মানেই কিন্তু তাকে দিয়ে দেওয়া নয়। এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে।"

শশীকান্তজি বললেন, "আমাদের সঙ্গে একটু আগে কথা হয়েছে আদিলের। ও প্রিমোকে একটুর জন্য মিস করেছে। তবে একটা জিপিএস ট্র্যাকার প্ল্যান্ট করতে পেরেছে প্রিমোর ক্লোদিং-এ।"

"স্যার," জয় বলল, "ক্যান আই সে সামথিং?"

"শিয়োর," অ্যান্টনিজি তাকালেন জয়ের দিকে, "ডু ইউ হ্যাভ এনি প্ল্যান?"

"লঞ্চ কোডটা আদিলকে দিলেও, ওর সঙ্গে যদি আমি যাই?" জয় তাকাল সকলের দিকে।

"শিয়োর," শশীকান্তজি মাথা নাড়লেন, "তবে পি এম ও থেকে বলা হয়েছে কোডটা যেন মার্কোস ছাড়া আর কারও হাতে না দেওয়া হয়।"

জয় বলল, "শিয়োর স্যার। ওর কাছেই থাক। আমি একটু দূর থেকে ট্র্যাক করব। সেটা আদিলের জানার দরকারও নেই। আর ন্যাশনাল সিকিয়োরিটি গার্ডের যে লোকজন এসেছে, তারা আমার সিগন্যাল পেলেই গোটা জায়গাটা ঘিরে ফেলবে।"

শশীকান্তজি বললেন, "যেভাবেই হোক, কোডটা অন্যের হাতে পড়ার থেকে বাঁচাতে হবে। দেশ সকলের আগে। বুঝেছ?"

জয় বলল, "পড়বে না স্যার। আদিল ফেল করার মানুষ নয়। তাও যদি ফেল করে, আমি কাউকে ছাড়ব না। কোড উইল বি সেফ।"

শশীকান্তজি মাথা নাড়লেন, তারপর বললেন, "মুশকিল কী জানো? এমন একটা বিষয় যে, বেশি ছড়িয়ে অপারেট করা যাচ্ছে না। কারণ, তা হলেই মিডিয়া ইনভলভ্ড হয়ে যাবে আর প্যানিক তৈরি হবে। সেটা আরও ভয়ংকর হয়ে দেখা দেবে। তাই বলছি, ওয়র্ক লাইক আ শ্যাডো। আর কাজ হওয়ামাত্র তুমি আমাদের জানাবে। আমরা কোডটা সঙ্গে সঙ্গে পালটে দেব।"

জয় কিছু না বলে মাথা নাড়ল শুধু।

সি এম এবার জিজ্ঞেস করলেন, "তা কোথায় আছে এখন আদিল?"

জয় বলল, "ওয়াটগঞ্জের দিকে এগোচ্ছে। হয়তো ওখানে গিয়েই ফোন করবে। কারণ, প্রায় রাত সাড়ে আটটা বাজে এখন। টাকাও সময়ে সময়ে ট্রান্সফার হয়ে যাচ্ছে। সামনে এখন শুধু লঞ্চ কোডটাই শত্রুদের লক্ষ্য।"

অ্যান্টনিজি বললেন, "জয়, ইউ মুভ নাও। আর রিস্ক নেওয়া যায় না। তুমি কি চপার নেবে?"

জয় বলল, "না স্যার। বাইক উইল বি ফাইন। চপারে প্রিমো সাবধান হয়ে যাবে। আমি পাশের ঘরে গিয়ে রেডি হয়ে নিই স্যার। আর এখানে প্রিমো কল করলে তার ফিডটা আমার মোবাইলে যাতে পাঠানো যায়, সেটাও বলে যাচ্ছি।"

অ্যান্টনিজি বললেন, "দেখো জয়, যাই হোক না কেন, নিউক্লিয়ার কোড যেন অন্যের হাতে না পড়ে। মেক শিয়োর যে, আমাদের দেশের সুরক্ষা যেন ঠিক থাকে।"

জয় মাথা নেড়ে দরজার দিকে এগোতে গেল। আর ঠিক সেই সময়ে টেবিলের উপর রাখা ফোনটা বেজে উঠল শব্দ করে।

২৩

ফোনটা কানে নিয়ে সামনের দিকে তাকাল প্রিমো। রাস্তায় প্রচণ্ড ভিড়। ভিড়ের মধ্যেই একজনের পকেট থেকে ও উঠিয়ে নিয়েছে ফোনটা।

নিজের ফোন আর ব্যবহার করতে চায় না প্রিমো। আর চায় না কোনও রিস্ক নিতে। কারণ ওর কাজের উপর অনেক বাচ্চার জীবন নির্ভর করে আছে।

"হ্যালো?" জয়ের গলাটা শুনতে পেল প্রিমো।

"হেলিকপ্টার পাঠানো হয়েছিল আমাকে ধরতে! আপনাদের সাহসে আমি মুগ্ধ। আবার ক্যালাসনেসেও অবাক!"

"শোনো প্রিমো, এই ক্যাট অ্যান্ড মাউসটা এবার বন্ধ হওয়া উচিত। তুমি বুঝতে পারছ, কী ভয়ানক পরিণতি হবে এতে?"

"শুনুন আপনারা আমায় ট্র্যাক করছেন জানি, কিন্তু আর পারবেন না। জাস্ট ওয়েট ফর মাই নেক্সট কল। আমি বলে দেব কী করে আর কোন নম্বরে লঞ্চ কোডটা আপনাদের পাঠাতে হবে। আর প্লিজ, নো মোর গেম্‌স। তবে আমি কিন্তু আর সহ্য করব না।"

ফোনটা কেটে পাশের ড্রেনে ফেলে দিল প্রিমো।

কলেজ স্ট্রিটের মাথায় হেলিকপ্টার দেখেই বুঝেছিল প্রিমো যে, ওকে লোকেট করে ফেলা হয়েছে। বুঝেছিল যে, ওকে খুঁজে পাওয়ার জন্যই ওর সঙ্গে বেশিক্ষণ ধরে কথা বলা হয়েছে। তাই দ্রুত নিজেকে লুকোনোর জন্য রাস্তার পাশের একটা ভিখিরিকে টাকা দিয়ে ওর লাঠি আর বাটিটা নিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু তবু শেষ রক্ষা আর হয়নি।

অনেকে কষ্টে নিজেকে বাঁচিয়ে নিয়ে এসেছে প্রিমো। কাজটা করতে হবে ওকে। একটা দেশ তার শত্রুদের থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য অনেক

কিছু করতে পারে, কিন্তু নিরীহ একজন বৃদ্ধ আর কতগুলো বাচ্চাকে বাঁচানোর ক্ষেত্রে ও ছাড়া তো আর কেউ নেই।

প্রিমো এগিয়ে গেল ভিড়ের দিকে। যবনিকা পড়ার সময় হয়ে এল প্রায়। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই জানা যাবে প্রিমো যে প্ল্যানে চলছে, তাতে মহাষ্টমীটা কেমন হবে কলকাতার!

২৪

ফিস, অস্ট্রিয়া

চার্চের ঘণ্টার টাইমার রিসেট করে, হাতঘড়ি দেখলেন ফাদার। বিকেল শেষ হয়ে আসছে প্রায়। সন্ধের সারমনের সময় জানাবার জন্য আর একটু পরেই বড় ঘণ্টাটা বাজবে।

ঘণ্টাটা বিশাল বড়। বিসমার্কের সময় থেকে আছে এই গির্জায়। গোটাটা ব্রোঞ্জের তৈরি। আর সঙ্গে দুটো হাতুড়ি আছে। একটা বড়, অন্যটা ছোট। ঘণ্টাটা আগে দড়ি টেনে বাজাতে হত। এখন অবশ্য টাইমার দিয়ে বাজানো হয়।

কোটের পকেটে হাত ভরে ব্রুনো ছায়ায় মতো লেগে রয়েছে পিছনে। ওর পকেটে ইউ জি, রিমোট আর মোবাইল ফোন রয়েছে। বাচ্চারা নিজেদের মতো আছে। তারা জানেও না যে, একজন আততায়ী ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের আশপাশে।

ফাদার জানেন ওইদিকের কাজে একটু গোলমাল হলেই ব্রুনো নিমেষে সাফ করে দেবে ওদের।

ফাদার লিফ্‌টের দিকে এগোলেন। এটা সোজা উঠে যায় ঘণ্টার কাছে প্রায় পাঁচ তলার উচ্চতায়।

ব্রুনো অবাক হল একটু। ও যে সময় ধরে এখানে আছে, তার মধ্যে এই প্রথম ফাদার এই লিফ্‌টের দিকে যাচ্ছেন।

ব্রুনো জিজ্ঞেস করল, "লিফ্‌টের দিকে যাচ্ছেন কেন?"

ফাদার হাসলেন। বললেন "ঘণ্টার টাইমারটা সেট করার পরেও উপরে একটা রিসেট বাটন আছে। ওটা ঠিক করতে হয়। তুমি তো আর কাউকে এই অংশে আসতে দিতে চাও না। তাই আমাকেই তো যেতে হবে, ওটা ঠিক করতে, তাই না?"

ব্রুনো মাথা নাড়ল। তারপর বলল, "ঠিক আছে, চলুন। তবে মনে রাখবেন, ফানি কিছু করতে গেলে কিন্তু আপনার সামনে সব ক'টা বাচ্চাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে মারব আমি। তারপর মারব আপনাকে।"

ফাদার হাসলেন, "জানি তো। আমার এই অশক্ত শরীর নিয়ে খালি হাতে ফানি আর কী করতে পারি আমি?"

ব্রুনো কিছু না বলে চুপচাপ ফাদারের সঙ্গে উঠে গেল লিফ্‌টে।

লোহার জাল লাগানো লিফ্‌ট। অপূর্ব সুন্দর ফিস গ্রামটাকে উপর থেকে আরও সুন্দর লাগছে।

উপরে লিফ্‌ট থামার পর ফাদার বেরিয়ে এলেন লিফ্‌টের থেকে। ব্রুনোও পিছন পিছন বেরোল।

সামনেই বিশাল বড় ঘণ্টা। প্রায় আঠারো ফুট উঁচু। দানবের মতো দেখতে। লিফ্‌ট থেকে ঘণ্টায় যাওয়ার রাস্তাটা একটু বিপজ্জনক। সরু একটা ব্রিজ পেরিয়ে যেতে হয় ঘণ্টার দিকে। ঘণ্টার মাথার উপর ক্যানোপি আর চারপাশটা ফাঁকা। খুব সাবধানে যেতে হয় সেখানে।

ফাদার ব্রিজের দিকে এগোলেন।

ব্রুনো হঠাৎ পিছন থেকে টেনে ধরল ফাদারকে, "ওইখানে যাচ্ছেন কেন?"

"রিসেট বাটনটা তো ওইদিকেই আছে," ফাদার বললেন, "তুমি কী

ভাবছ? এই বুড়ো বয়সে আমি এইখানে কী করতে পারি? তুমি এখানে দাঁড়াও, আমি বাটনটা রিসেট করে ফিরে আসছি।”

ব্রুনো ভুরু কুঁচকে বলল, “আমি আপনাকে একা ছাড়ছি না। নো ওয়ে। আপনি সামনে থাকুন, আমি পিছনেই আছি। আর তাড়াতাড়ি করুন।”

ব্রুনো পিছন থেকে আলতো ঠেলল ফাদারকে। ফাদার ধাক্কায় সামান্য টলে গেলেন। তারপর ব্রিজের রেলিংটা ধরে এগোলেন সামনে। হাতঘড়িটা দেখলেন আবার। তারপর আলতো করে খুলে নিলেন কানের হিয়ারিং-এডটা।

ঘণ্টার ক্যানোপি-র নীচে এসে দাঁড়ালেন ফাদার। চারটে পিলারের উপর ক্যানোপি। সেখান থেকে ঝুলে আছে বিশাল বড় ঘণ্টা। তার চারিদিকে ফাঁকা। কোনও দেওয়াল নেই।

ফাদার ঘুরে দেখলেন ব্রুনোও এসে দাঁড়িয়েছে ক্যানোপির তলায়। প্রচণ্ড হাওয়ায় ওর কোটটা উড়ছে। ফাদার হাসলেন। ব্রুনোর দিকে তাকিয়ে।

ব্রুনো কঠিন গলায় বলল, “তাড়াতাড়ি করুন।”

ফাদার কিছু না বলে হাসিমুখে আচমকা এগিয়ে এলেন ব্রুনোর দিকে। ব্রুনো বুঝতে পারল না, কী হচ্ছে। ও কোটের ভিতর থেকে ইউ জি-টা বের করে আনল। আর রিফ্লেক্সে পিছিয়ে গেল কয়েক পা। ফাদার আরও এগিয়ে এলেন ব্রুনোর দিকে।

“আমি কিন্তু গুলি চালাব,” ব্রুনো আরও কয়েক পা পিছিয়ে বন্দুকটা তুলল। আর ঠিক তখনই প্রচণ্ড শব্দ করে বেজে উঠল ঘণ্টাটা।

ব্রুনো হকচকিয়ে গেল প্রচণ্ড শব্দে। তারপর অসহ্য যন্ত্রণায় চেপে ধরল নিজের দুটো কান। হাত থেকে বন্দুক পড়ে গেল ওর, ফাদার দ্রুত এগিয়ে এলেন ব্রুনোর দিকে। ব্রুনো হাঁটু গেড়ে বসে দু'হাতে কান চেপে ধরে যন্ত্রণায় ছটফট করছে। ফাদার তাকালেন একবার, তারপর একটা পা দিয়ে সজোরে ধাক্কা দিলেন ব্রুনোকে। কিছু বোঝার আগেই ব্রুনো ছিটকে পড়ে গেল উপর থেকে। ফাদার পায়ে পায়ে এগিয়ে এলেন ক্যানোপির ধারে।

মুখ বাড়িয়ে দেখলেন নীচের ছড়ানো বোল্ডারের উপর রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে ব্রুনো দ্য কিলার!

২৫

ডক ছাড়িয়ে আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে থমকে দাঁড়াল আদিল। এদিকটা শুনশান। দূরে ডকের জাহাজ, আর বড় বড় ক্রেনগুলোকে দৈত্যের হাতের মতো লাগছে। পুজোর রোশনাইয়ের শহরে এই দিকটা কেমন যেন অন্ধকার আর নির্জন। ঝিঁঝির ডাকও এখানে স্পষ্ট। আদিল জানে না সামনে কী আছে। শুধু জানে, এই শহর আর দেশের জন্য ওকে এগোতে হবে সামনে। কারণ ওর ঘড়ির স্ক্রিন বলছে প্রিমো এখানেই এসেছে।

আদিল পকেটে হাত দিয়ে দেখে নিল ছোট্ট পেনড্রাইভের মতো দেখতে ইলেকট্রনিক ডেটা স্টিক ঠিক আছে কিনা। রাইটার্স ছেড়ে বেরোবার সময়ই এটা ওকে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আর কিছুক্ষণ আগে এটাতেই ছ'শো পঁচাত্তর ডিজিটের এনক্রিপটেড লঞ্চ কোড এসেছে। এটা ক্র্যাক করতে গেলে মাস্টার হ্যাকারদের কয়েকমাস লেগে যাবে। কারণ শুনেছে এগুলোয় কয়েক লেয়ারের এনক্রিপ্ট করা থাকে। তবে যারা এটা চাইছে, তাদের নিশ্চয় কোনও সুপার কম্পিউটারের অ্যাকসেস আছে, যা দিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই এই এনক্রিপশনের সিকিয়োরিটি শিল্ড ভেঙে দেওয়া যাবে।

কোডটা ওকে পাঠানোর পর দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী কড়া নির্দেশ দিয়েছেন যে, কোনও অবস্থাতেই যেন এটা শত্রুদের হাতে না পড়ে। এটা জাস্ট ওদের কথা শোনা হল, এমন ভান করার জন্য দেওয়া। আদিল জানে, ও নিজে মরে গেলেও এই যন্ত্রসমেত কোডটা শত্রুর হাতে তুলে দেবে না।

পিস্তলটা বের করে সামনের দিকে এগোল আদিল।

সামনেই গঙ্গা। পাড়ের এইদিকটা হাঁটু অবধি লম্বা ঝোপঝাড়ের জঙ্গলে ভরতি। তবে মাঝে মাঝে দু'-একটা গাছও রয়েছে। জলের খুব আবছা শব্দ আসছে। দূরে ভেসে থাকা লঞ্চও দেখা যাচ্ছে। ঘড়ির লাল বিন্দুটা বলছে পঞ্চাশ মিটারের মতো দূরে আছে প্রিমো। সামনে বেশ অন্ধকার, তবু এগোতে লাগল আদিল।

হেলিকপ্টার নিয়ে ধাওয়া করা হয়তো সুবিধের দিক দিয়ে ঠিক ছিল, কিন্তু এর মূল অসুবিধেটা হল হেলিকপ্টার খুব সহজে দেখে ফেলা যায়। যতই ও দূরে নেমে যাক না কেন, কলেজস্ট্রিটে প্রিমো যে হেলিকপ্টার দেখে ওর উপস্থিতি বুঝে ফেলেছিল, সেটা ভালই বুঝতে পারছে আদিল। তাই তো হাতের কাছে পেয়েও ফসকে গেল প্রিমো!

এবার আর ভুল করেনি আদিল। ধীরে-সুস্থে ট্র্যাফিক সার্জেন্টের কাছে নিজের পরিচয় দিয়ে একটা বাইক নিয়ে এসেছে। আদিল জানে যে, রাত দশটার আগে কিছু করবে না প্রিমো। তাই হিসেব করে এখানে এসে পৌঁছেছে ও। এখন প্রশ্ন হল, সামনের অন্ধকারে প্রিমো কোথায়?

আর পঁচিশ মিটার। কিন্তু অন্ধকার বেশ জমাট এখানে। হাতঘড়ির আলোর বৃত্তটা বুদবুদের মতো উজ্জ্বল হয়ে আছে। একটু নিচু হয়ে এবার দ্রুত এগোল আদিল।

গঙ্গার দিক থেকে ভেসে আসা হাওয়া এসে ঝাপটা মারল আদিলের মুখে। পাড়ের কাছে এসে অবাক হল আদিল। সামনে পাড় আর জলের ধার ঘেঁষে একটা বড় অশ্বত্থ গাছ রয়েছে। এতক্ষণ আড়াল ছিল বলে বুঝতে পারেনি, কিন্তু এবার আদিল দেখল গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা আছে ছোট্ট একটা মোটরবোট!

কার এটা? আদিল গুঁড়ি মেরে এগোল বোটের দিকে। তারপর সামনে গিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। বোটের ভিতরটা দেখবে বলে উঁচু করল পা।

"ফ্রিজ।"

পিছন না ফিরলেও আদিল বুঝল নিঃশব্দে প্রিমো এসে দাঁড়িয়েছে ওর পিছনে!

"ইটস ওনলি অক্টোবর মেট," আদিল গলাটা স্বাভাবিক রেখে ঘুরল প্রিমোর দিকে, "উইন্টার ইজ কাপল অফ মান্থস আওয়ে।"

প্রিমো হাসল, "সেন্স অফ হিউমার! গুড। তবে তার আগে পিস্তলটা ফেলে দাও মাটিতে।"

আদিল পিস্তলটা ফেলে তাকাল সামনে। প্রিমোকে দেখা যাচ্ছে আবছা। অন্ধকারের ভিতর ছোটখাটো রোগা চেহারার মানুষটাকে দেখলে বোঝাই যাবে না, এ এমন একজন ক্রিমিনাল।

প্রিমো ধীরে ধীরে ঘুরে জলের ধারে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর চট করে একবার বোটটা দেখে নিয়ে লাফিয়ে উঠল ওটায়। তবে পুরোটা সময় পিস্তলটা কিন্তু ঠিক তাগ করে রাখল আদিলের দিকে।

"এবার কাজের কথা," প্রিমো বলল, "কোডটা দাও।"

"আগে বোমার রিমোট," আদিল স্থির হয়ে তাকিয়ে রইল প্রিমোর দিকে।

"তুমি কি দরাদরি করার মতো অবস্থায় আছ বলে মনে করো?"

"আগে রিমোট," আদিল নিজের অবস্থান পালটাল না।

"শোনো," প্রিমো বাঁ হাত দিয়ে একটা ছোট্ট জিনিস আদিলের দিকে ছুড়ে দিয়ে বলল, "এই নাও, তোমার জি পি এস ডট। একটু আগে এটার অস্তিত্ব বুঝতে পেরেছি আমি। ভেবেছিলাম, কোডটা ইলেকট্রনিক্যালি ট্রান্সফার করতে বলব। কিন্তু সিনস ইউ আর হিয়ার, নিশ্চয়ই তুমি নিয়ে এসেছ। তাই আর সময় নষ্ট না করে ওটা দিয়ে দাও আমায়।"

আদিল চোয়াল শক্ত করল। এইভাবে নিরুপায় হয়ে ওকে কোডটা দিয়ে দিতে হবে!

প্রিমো আবার বলল, "শোনো তুমি না দিলে তোমার মাথায় গুলি করে আমি এমনিতেই তোমার পকেট থেকে কোডটা নিয়ে নেব।"

আদিল বলল, "আমার কাছে কোড নেই। তোমায় ফলো করতে করতে এখানে এসেছি। আমার কাছে ওটা থাকার কথা নয়।"

"তাই?" প্রিমোর গলার স্বরটা পালটে গেল হঠাৎ। তারপর হাতে একটা ছোট্ট মোবাইল ফোনের মতো জিনিস বের করে বলল, "তা হলে ঠিক আছে। আমি প্রথম বাজিটা ফাটাই। দেখা যাক, কত লোক রোস্ট হয়!"

"হোল্ড ইট," আদিল চিৎকার করে উঠল, "এমন কোরো না প্লিজ। কত মানুষ মারা যাবে ভাবতে পারছ? এমন কেন করবে? বি হিউম্যান। মানুষের মতো ব্যবহার করো।"

"এটা তোমার পক্ষে বলা সহজ। কারণ তোমার কিছুই ফায়ারিং লাইনে নেই। আমি সাধু নই। যখন তোমার উপর অন্য জীবন নির্ভর করে থাকবে, তখন তুমি সাধু হওয়ার চেষ্টা কোরো।"

"মানে?" অবাক হল আদিল।

"মানে এবার দাও কোডটা, না হলে..." কথাটা শেষ না করে রিমোটের একটা বোতাম টিপে রিমোটটাকে অন করল প্রিমো।

"প্লিজ, এমন কোরো না, আমি দিচ্ছি", আদিল হাত তুলে বারণ করল। তারপর পকেটে হাত ঢোকাতে গেল।

"সাবধান! বেশি ওস্তাদি করতে গেলে কিন্তু আমি সত্যি গোটা শহর তছনছ করে দেব।"

ধীরে ধীরে পকেট থেকে ছোট্ট ডেটা স্টিকটা বের করল আদিল। বলল, "এটায় আছে কোড।"

"তাই?" প্রিমো বলল, "ঠিক আছে ছুড়ে দাও ওটা আমার দিকে।"

"তুমি রিমোটটা ছুড়ে দাও। আমরা দুজনেই এক, দুই, তিন বলার সঙ্গে সঙ্গে ছুড়ব, কেমন?" আদিল তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইল প্রিমোর দিকে।

"ওকে, আমি রেডি," প্রিমো বলল, "এক, দুই, তিন।"

আদিল ছুড়ে দিল ডেটা স্টিকটা আর প্রিমোও ছুড়ল ওর হাতের রিমোট। আবছা অন্ধকারে দু'জনের দুটো জিনিস লুফে নিতে সমস্যা হল না!

আদিল দ্রুত রিমোটটা হাতে নিয়ে দেখল। এ কী!

ও বলল, "এটা কী? কী এটা?"

প্রিমো হাসল, "কেন? তুমি তো এটাই চাইলে!"

"এটা তো খেলনা একটা। আসল রিমোট কই?"

"আসল?" প্রিমো হাসল, "এটাই আসল। কারণ কোনও বোমা নেই। কোনও প্যান্ডেলে কোনও বোমা নেই।"

"মানে?"

"মানেটা খুব সোজা। প্যান্ডেলে কোনও বোমা নেই। স্টেশনের নির্জন প্রান্তে বা মাঝ-গঙ্গায় যে বোমা ছিল, কেবল সেই দুটোই আসল। আর নেই।" প্রিমো বলল, "আসল হচ্ছে তোমাদের বিশ্বাস করানো যে বোমা আছে। সেটা করাতে পেরেছি। তাই কোডটা এখন আমার হাতে। এই পৃথিবীতে বিশ্বাসই আসল, সত্যিটা নয়। বুঝলে? তবে যদি কোডটা নকল হয়, তবে আমি অন্য ব্যবস্থা করে রেখেছি। সেটা পরে বুঝবে তোমরা।"

আদিল বোকার মতো তাকিয়ে রইল, "কী ব্যবস্থা?"

প্রিমো বলল, "আগে কোডটা ভেরিফাই করি, তারপর সেটা বলব। আমি এবার যাব। তুমি মাথার পিছনে হাত দিয়ে নিল ডাউন হও।"

আদিল চোয়াল শক্ত করে নিল ডাউন হতে গেল, আর ঠিক সেই সময়ে আচমকা ওর কানের পাশ দিয়ে গুলি চলল একটা। আদিল রিফ্লেক্স অ্যাকশনে পড়ে গেল মাটিতে। শুনল আরও গুলি চলল পিছন থেকে।

আর ওর চোখের সামনে বোটের উপর পড়ে গেল প্রিমো। নিমেষের মধ্যে কী হল বুঝতে পারল না আদিল। মাথা ঘুরিয়ে দেখল, পিছন থেকে বন্দুক তুলে এগিয়ে আসছে একজন। আবছা অন্ধকারে প্রথমটায় বুঝতে না পারলেও কাছে আসতেই মানুষটাকে চিনতে পারল আদিল। মানুষটা আর কেউ নয়, জয় কুমার।

আদিল উঠে দাঁড়াল।

জয় কাছে এসে বলল, "ইউ স্টে হিয়ার।"

তারপর বন্দুক তুলে এগিয়ে গেল সামনের দিকে। আদিল দেখল মোটর বোটের এক কোণে পড়ে আছে প্রিমো। জয় সেইখানে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর ছোট্ট লাফে বোটে গিয়ে উঠল। পা দিয়ে দু'বার নাড়িয়ে দেখল প্রিমোকে। তারপর ঝুঁকে পড়ে ওর হাত থেকে নিয়ে নিল ডেটা স্টিকটা।

"গুড জব," আদিল বলে উঠল, "এন এস জি-কে একবার ডাকুন স্যর।"

জয় মাথা নাড়ল ধীরে। তারপর হঠাৎ বন্দুকটা তুলে আদিলের দিকে তাগ করে বলল, "কেউ তো নেই, কাকে ডাকব? সকলকে তো বলেছি বাবুঘাটের কাছে জমা হতে। এখানে কে আসবে? তার বদলে তোকে মেরে আমি বেরিয়ে যাব।"

"স্যার?" আদিল অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল জয়ের দিকে।

"কী হল, বোকা বনে গেলি তো আদিল?" জয় হাসল, "আমি জয় কুমার। গোটা প্ল্যানটা আমারই হ্যাচ করা, বুঝেছিস?"

"এটা কী করেছেন স্যার?"

"কী করছি মানে? দেশের হয়ে এত বছর খেটে কী পেলাম আমি? না টাকা, না সম্মান। সব সময় মন্ত্রীদের আর আমলাদের সামনে জো হুজুরি করতে করতে কী পেয়েছি আমি? কিন্তু কোন দিক থেকে আমি কম? গোটা দেশকে কেমন নাচিয়ে ছাড়লাম বল? আই এস আই-এর সঙ্গে খুব ক্লোজ কানেকশনে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়, আর মাঝে মাঝে ওদের সঙ্গে আমাদের দোস্তিও হয়ে যায়। আই এস আই-এর মুজাফফরাবাদের কমান্ডার লতিফ শেখ আমার বন্ধু। ওর থেকেই অ্যাসাইনমেন্ট পেয়েছি আমি। লতিফরা ওকে কাজে লাগিয়েছে। তবে জানায়নি আমার কথা। ওকে দিয়েই বলিয়েছে যে, আমায় ছাড়া আর কারও সঙ্গে ও নেগোশিয়েট করবে না। যাতে আমি সবসময় ঘটনাকে কন্ট্রোল করতে পারি। কারণ কাজটা শেষ করার পর প্রিমোকে যে আমায় সরিয়ে দিতেই হত। কোনও

ক্লু যে পিছনে রেখে যেতে নেই! আমাদের তো এটাই শেখানো হয়, তাই না? আর তাই সব শেষ করতে আমিই সকলের সম্মতি নিয়ে এসেছি এখানে। আমায় বলা হয়েছে, যে-কোনও উপায়েই যেন আমি কোডটা উদ্ধার করি," হাসল জয়, "দ্যাখ, ঠিক উদ্ধার করলাম। তবে তোদের দেশের জন্য নয়। অন্যদের জন্য। এবার দ্যাখ, চায়না আর পাকিস্তান তোদের কী অবস্থাটা করে।"

"স্যার, আপনি এমন করবেন না। এখনও ফিরে চলুন। আমি কাউকে কিছু বলব না। কোডটা ফেরত দিয়ে দেবেন। ব্যস সব ঠিক হয়ে যাবে।"

"কিচ্ছু ঠিক হবে না। যা হওয়ার হয়েছে। অনেকদিন তোদের দাসবৃত্তি করেছি, আর না। এই লঞ্চটা নিয়ে আমি বেরিয়ে যাব নদীর মোহনা অবধি, সেখান থেকে বাংলাদেশি জলদস্যুরা আমায় পিক আপ করে নেবে আর তারপর সেখান থেকে সোজা বাংলাদেশের সুন্দরবনের কোনও দ্বীপে গিয়ে উঠব," জয় পিস্তলটা শক্ত করে ধরে বলল, "তোদের সকলের নাকের ডগা দিয়ে বেরিয়ে যাব আমি। ডলার সব ট্রান্সফার হয়ে গিয়েছে আমার অ্যাকাউন্টে। এখন এটা বেচেও আমি যা টাকা পাব..."

"ডলার ট্রান্সফার হয়ে গিয়েছে?" আচমকা পাশের থেকে বলে উঠল প্রিমো।

আদিল তো চমকে গেলই, তার সঙ্গে দেখল জয়ও চমকে গিয়েছে খুব।

প্রিমো কোনওমতে উঠে বোটের গায়ে হেলান দিয়ে বসল, "আপনি শিয়োর যে টাকা ট্রান্সফার হয়ে গিয়েছে?"

জয় থতমত খেয়ে বলল বোটের একটা ধারে পিছিয়ে গেল। বলল, "তুই...বেঁচে?"

প্রিমো হাসল, "হ্যাঁ, আমি কেভলার পরে আছি। বুলেট রেজিস্ট্যান্ট সুট। তা ডলার পেয়েছেন শিয়োর?"

জয় বলল, "আমরাই তো ট্রান্সফার করলাম। আমার সামনে ট্রান্সফার হয়েছে ওই অ্যাকাউন্টে।"

"হ্যাঁ, ঠিক, আপনাদের দেওয়া অ্যাকাউন্টেই তো আমি ট্রান্সফার করতে বলেছি, কিন্তু..." প্রিমো হাসল, "দেখুন তো ট্রান্সফার হয়েছে কিনা!"

কার দিকে পিস্তল তাগ করবে বুঝতে পারল না জয়, বলল, "জানোয়ার, তুই...তুই..."

"টাকাটা আপনার অ্যাকাউন্টে ওয়্যার করার আগেই ওটা আমার লোক সরিয়ে নিয়েছে অন্য জায়গায়," প্রিমো হাসল।

"বিশ্বাসঘাতক," জয় পিস্তলটা তুলল প্রিমোর দিকে, "ভুলে গিয়েছিস অস্ট্রিয়ার ফিস গ্রামে তোর প্রিয় ফাদার আর বাচ্চারা আমাদের লোকের কবলে..."

"ফাদারের চিন্তা আপনি করবেন না। উনি ভিয়েতনাম ভেট। আপনার লোকটি আর নেই। এখানে আসার পরই ফাদার খবর দিয়েছেন আমায়। আর বিশ্বাসঘাতক! কে কাকে বলছে? টাকাটা নেওয়াই আমার লক্ষ্য ছিল। কী ভেবেছেন উৎসবের শহরে আমি সত্যি বোমা রাখব? বোমা নেই। আর আপনার টাকাও নেই।"

"কিন্তু লঞ্চ কোড আছে," হিসহিসে গলায় বলে উঠল জয়, "এটাই আমার আসল পাসপোর্ট। তবে তার আগে তোদের দুটোকে..."

জয় কথা শেষ না করেই পিস্তলটা তুলল আদিলের দিকে। আর সঙ্গে সঙ্গে ওই বসা অবস্থা থেকে প্রিমো লাথি চালাল জয়ের হাঁটুর পাশটা লক্ষ্য করে। মুখ দিয়ে শব্দ করে জয় পড়ে গেলেও পিস্তলটা ফেলল না। বরং ঘুরে গিয়ে পিস্তলটা তুলল প্রিমোর দিকে। আর এই সুযোগটুকু খুঁজছিল আদিল। ও দ্রুত ডিগবাজি খেয়ে মাটি থেকে তুলে নিল ওর নিজের পিস্তলটা।

দুটো পরপর গুলির শব্দ হল।

আদিল দেখল বোটের থেকে জয়ের গুলি খেয়ে ছিটকে পড়ে গেল

প্রিমো। আর বোটের উপরে কয়েক সেকেন্ড থমকে দাঁড়িয়ে রইল জয়। তারপর কেমন যেন নেতিয়ে পড়ে গেল বোটের ভিতরে।

আদিল পিস্তল তাগ করেই দৌড়ে গেল বোটের দিকে। জলের কাছে এসে দ্রুত এদিক-ওদিক দেখল। ও, নাহ্! জলে প্রিমোর কোনও চিহ্ন নেই। আদিল বোটের কিনারায় উঠল এবার। বোটের মেঝেতে পড়ে রয়েছে জয় কুমার। ওর নিথর দেহে আদিলের ছোড়া বুলেটের ক্ষত আর বাঁ হাতে ধরা নিউক্লিয়ার মিসাইলের লঞ্চ কোড সমেত ডেটা স্টিক!

২৬

মুজাফফরাবাদ, পাক অধিকৃত কাশ্মীর

লতিফ শেখ মাথা নামিয়ে নিল এবার।

কর্নেল শ্যাঙ ওয়েই দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, "অপদার্থ। দিলেন তো সব ছড়িয়ে! কোথায় এল কোড? হুঁ ছড়াবে না! নিউজ বলছে টেররিস্ট অ্যাটাক ঠেকিয়ে দিয়েছে ওরা। ইডিয়ট।"

লতিফ জানে, ওর বলার কিছু নেই।

কর্নেল রাগে গরগর করতে করতে ফোন করলেন বেজিং-এ, বললেন, "উই হ্যাভ ফেল্ড। আমাদের পরে আবার ট্রাই করতে হবে। এখন চুপ করে থাকাই ভাল কিছুদিন।"

সামনে পড়ে থাকা কাবাবটা কেমন মাটির মতো খেতে লাগল লতিফের। ও দেখল মাটিতে থুতু ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন কর্নেল শ্যাঙ ওয়েই।

২৭

মহাষ্টমী, কলকাতা

এয়ারপোর্টের বাইরে গাড়ি থেকে নেমে আকাশের দিকে তাকাল আদিল। সকাল ন'টা বাজে। ন'টা পঞ্চাশের কলকাতা থেকে দিল্লির প্লেন ধরবে ও। গতকালের সাফল্যের পর আদিলকে পি এম ও থেকে বিশেষভাবে ডেকে পাঠানো হয়েছে।

অনেক কঠিন মিশনে বেরিয়েছে আদিল, কিন্তু এমন একটা মিশন যে ওকে কলকাতায় এগজিকিউট করতে হবে, কোনওদিন ভাবেনি। ভাবেইনি ওর স্কুল জীবনের শহরটায় ওকে ফিরে আসতে হবে এমন একটা ভয়ংকর পরিস্থিতিতে।

তবে শেষটা যে ভালভাবে হয়েছে, এটাই আসল কথা।

বোটে জয়ের মৃতদেহ সামনে রেখেই রাইটার্সের কন্ট্রোলরুমে ফোন করেছিল আদিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই এন এস জি থেকে শুরু করে পুলিশ সকলে এসে ঘিরে ফেলে জায়গাটাকে। দ্রুত সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বোট আর জয়ের মৃতদেহ। প্রিমোর মৃতদেহ খোঁজার জন্য ডাইভারদের সঙ্গে সঙ্গে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল গঙ্গায়।

আদিলকে ওখানে আর না রেখে সঙ্গে সঙ্গেই গাড়ি করে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয়েছিল রাইটার্সে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জিজ্ঞেস করেছিলেন, "জয়? জয়ের কী হল?"

আদিল চুপ করে থেকে শুধু বলেছিল, "সরি স্যর, হি ইজ় আ ট্রেটর। হি হ্যাজ বিট্রেড আওয়ার কান্ট্রি।"

সি এম অবাক হয়ে ভুরু কুঁচকে বলেছিলেন "মানে? কী হয়েছে?"

আদিল মাথা নামিয়ে নিয়েছিল। তারপর ধীরে ধীরে বলেছিল সব কথা।

কথা শেষ হওয়ার পর সকলেই চুপ করে ছিলেন কিছুক্ষণ। তারপর প্রথম কথা বলেছিলেন অ্যান্টনিজি। বলেছিলেন, "যা হয়েছে, এতে এবার মিডিয়াতে খবর বেরোবেই বেরোবে। এই মর্মে যে টেররিস্ট অ্যাটাক আমরা ঠেকিয়ে দিয়েছি। আমাদের দেশের সিকিয়োরিটি টপ ক্লাস। তবে জয়ের কথাটা কিন্তু আমাদের মধ্যেই থাকবে। এটা কিছুতেই আমরা বাইরে বেরোতে দেব না। লোকে জানবে যে, RAW এখনও অভেদ্য। মানুষের মনে এই বিশ্বাসটা আমাদের বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। আমাদের মধ্যে যে ডাবল এজেন্ট আছে, সেটা কাউকে জানতে দেওয়া যাবে না।"

সি এম বলেছিলেন, "ঠিক বলেছেন। সিকিয়োরিটি আসলে একটা সেন্স অফ ফিলিং। আমরা নিজেদের যতটা সিকিয়োর্ড ভাবি, আমরা ততটাই সুরক্ষিত।"

অ্যান্টনিজি বলেছিলেন "আমরা তদন্ত করে খুঁজে বের করব আর কোনও এমন রোগ এজেন্ট আছে কিনা। তবে বাইরের দুনিয়াতে জয়কে আমরা ম্যালাইন করতে পারি না। কারণ, তা হলে আমাদের সিস্টেম ম্যালাইনড হবে। আর একটা বাজে লোকের জন্য অনেক সৎ, নিষ্ঠাবান মানুষের ক্রেডিবিলিটি নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। আমরা বলব জয় ডাইড অন দ্য লাইন অফ ডিউটি। সত্যিটা জানার দরকার নেই কারও। 'র'-এর উপর থেকে বিশ্বাস যেন না ভাঙে মানুষের।"

অ্যান্টনিজি আর শশীকান্তজি কাল রাতেই চলে গিয়েছেন দিল্লি। যাওয়ার আগে আদিলের প্রশংসা করেছেন। আর আজ আসার আগে সি এম নিজের আঁকা একটা ছবি ফ্রেম করে উপহার দিয়েছেন আদিলকে।

আদিল হাতের ব্যাগটা নিয়ে এগিয়ে গেল এয়ারপোর্টের গেটের দিকে। সামনে খুব ভিড়। ইন্ডিয়ান ক্রিকেট টিম আসছে কলকাতায়। কী একটা ম্যাচ আছে একাদশীর দিন। তাই গেটের কাছে মানুষের সমুদ্র।

আদিল ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেল। সামনের দু'-তিন জনের সঙ্গে বেশ ধাক্কা লাগল ওর। একজন বয়স্ক মানুষ তো পড়েই যাচ্ছিলেন। আদিল

কোনওমতে তাঁকে সামলে দাঁড় করিয়ে ভিড়টা ভেঙে ঢুকে গেল এয়ারপোর্টে।

বোর্ডিং পাস নিয়ে ও এগিয়ে গেল ক্যাফেটেরিয়ার দিকে। সামান্য সময় আছে। একটা কফি খাওয়া দরকার।

ক্যাফেটেরিয়ার সামনে গিয়ে ব্ল্যাক কফি অর্ডার দিল আদিল। তারপর কোটের বাঁদিকের পকেটে বোর্ডিং কার্ডটা রাখার জন্য হাত ঢোকাল।

আরে! এটা কী? হাতে শক্তমতো কী একটা ঠেকল আদিলের। ও বের করে আনল জিনিসটা। একটা মোবাইল ফোন! এটা কার? আদিল দ্রুত এদিক-ওদিক তাকাল। কোত্থেকে এল এটা?

ও দ্রুত মোবাইলের টাচ স্ক্রিনে হাত বোলাল। স্ক্রিনে ফুটে উঠল, 'কানেক্ট মি টু নেট।'

নেট কানেক্ট করে আর কিছু করতে হল না আদিলকে। ফোনটা নিজেই নানা রকম সাইটে ঢুকে বেরিয়ে শেষে একটা স্ক্রিন ডিসপ্লে করল। আদিল দেখল, তাতে একটা লিস্ট দেওয়া রয়েছে। বলা হয়েছে র‍্যানসাম বাবদ মোট জমা পড়েছে আট মিলিয়ন ইউ এস ডলার। আর সেই অর্থ এক মিলিয়ন ডলার হিসেবে ভাগ করে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের আটটা অরফ্যানেজে জমা করা হয়েছে।

আদিল অবাক হয়ে তাকাল স্ক্রিনের দিকে। এটা কে ঢোকাল ওর পকেটে? কে? প্রিমো! তবে কি বেঁচে আছে ও? তবে কি গুলি লেগেও মরেনি? কেভলার-সুট কি এবারও বাঁচিয়ে দিয়েছে ওকে?

আর টাকাটা তবে ও নিজে নেয়নি! অনাথ শিশুদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছে! কেমন ক্রিমিনাল এই প্রিমো!

আদিল দেখল মোবাইলের স্ক্রিন আবার কালো হয়ে গিয়েছে। তারপর আচমকা সেখানে ফুটে উঠল, "আবার আমাদের দেখা হবে। আবার আমরা কাজ করব একসঙ্গে। কখনও, কোথাও।

আদিল হাসল নিজের মনে। তারপর ফোনটাকে অফ করে রেখে দিল

পকেটে। বাইরের দিকে তাকাল। প্রচুর মানুষ অপেক্ষা করে আছে তাদের নায়কদের দেখার জন্য।

নায়ক! আদিল জানে সব নায়ককে সবসময় চোখে দেখা যায় না।

২৮

এয়ারপোর্ট চত্বরের গাছপালায় ঘেরা বাথরুম থেকে বেরিয়ে এদিক-ওদিক দেখে নিল প্রিমো। তারপর পাশের ডাস্টবিনে কাগজে মোড়ানো নকল চুল আর দাড়িটা ফেলে দিল। এখন কেউ দেখলে বুঝবেই না, একটু আগে একটা বুড়ো লোক ঢুকেছিল বাথরুমে।

মনে মনে হাসল প্রিমো। আদিল বুঝতে পারেনি যে, ভিড়ের মধ্যে ধাক্কা খেয়ে পড়ে যাওয়া বুড়োটা আসলে কে? কেন সে পা জড়িয়ে পড়ে গিয়েছিল। আর পড়ে যেতে যেতে কখন সে কোটের পকেটে ঢুকিয়ে দিয়েছিল ওই প্রোগ্রামড মোবাইলটা।

পাশ দিয়ে একটা ট্যাক্সি যাচ্ছিল। প্রিমো হাত তুলে থামাল সেটাকে। তারপর বলল, "বারাসাত।"

ড্রাইভার বলল, "কুড়ি টাকা বেশি দেবেন দাদা। পুজোর সময়..."

হাসল প্রিমো, আট মিলিয়ন ডলার ভাগ করে যে দেয়, তার থেকে মাত্র কুড়ি টাকা বেশি চাইল! ও বলল, "চলো।"

হু হু করে ট্যাক্সি ছুটছে যশোর রোড দিয়ে। কোথায় যাচ্ছে ও? নিজেও ঠিক জানে না। শুধু জানে, ওকে ক'দিন গা-ঢাকা দিতে হবে। অত টাকা এমনি এমনি ছেড়ে দেবে না ভারত সরকার। অমন ইঞ্জিন ওড়ানো আর ভয় দেখানো লোককে ছেড়ে দেবে না। তাই ওকে কিছুদিনের জন্য অদৃশ্য হতে হবে। তারপর সুযোগ বুঝে নেপাল বর্ডার দিয়ে বেরিয়ে যাবে ভারতের বাইরে।

অদৃশ্য হতে ওর মতো আর কে পারে! কাল গঙ্গার ধারে পৌঁছোবার পরেই ও ফাদারের ফোন পেয়েছিল। বুঝেছিল যে, ভিয়েতনাম যুদ্ধের পোড় খাওয়া মানুষটা বুড়ো বয়সেও ভেলকি দেখিয়েছে। বুঝেছিল, ওর প্রিয়জনেরা সুরক্ষিত।

আসলে প্রথম থেকেই প্রিমোর মনে হয়েছিল, ওর উপর নজর রাখছে কেউ একজন। তাই নিজেকে বাঁচাতে ও বেরিয়ে এসেছিল আদিলের সামনে। জানত ও আদিলের সামনে কিছু ফাঁস করার আগেই শয়তানটা আসবে ওকে শেষ করতে। এইভাবে শয়তানটার মুখোশ খুলে দিতে চেয়েছিল ও। পেরেছে প্রিমো। আর প্ল্যানমতো টাকাটাও বের করে এনেছে মরিশাসে বসে থাকা ওর হ্যাকার বন্ধুটির মাধ্যমে।

তবে দু'-দু'বার যে গুলি করা হবে ওকে, সেটা ঠিক বুঝতে পারেনি। কিন্তু কেভলার-সুট থাকতে চিন্তা কী! জলে পড়ে যাওয়ার পরে দ্রুত ডুব সাঁতারে অদৃশ্য হয়ে যায় ও। তারপর দূরে ভেসে থাকা একটা বয়ার আড়াল থেকে দেখেছিল ডাইভাররা জলে নেমে খুঁজছে ওকে।

কলকাতার পুজোর এমন সুন্দর আকাশ ওকে আল্পসের গ্রীষ্মকালের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। মনে পড়ে যাচ্ছে ওর বেড়ে ওঠা সেই চার্চের কথা।

শহর শেষ হয়ে এই জায়গাটা বেশ মফস্সলের মতো। একটু দূরে দূরে পুজো হচ্ছে। ছোট রঙিন প্যান্ডেল। মাইকে কী বলছে? অষ্টমীর অঞ্জলি দেওয়া হবে?

"ভাই গাড়িটা একটু রাখুন তো!"

প্রিমো নেমে এগিয়ে গেল ছোট প্যান্ডেলটার দিকে। রঙিন কাপড় দিয়ে সাজানো সুন্দর প্যান্ডেল। সামনে নানা বয়সি মানুষজন দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রিমো তার ভিতর থেকে এগিয়ে গেল সামনে। পুরোহিতের সামনে হাত বাড়িয়ে বলল, "আমায় ফুল দিন।"

পুরোহিত বললেন, "দেরি আছে অঞ্জলির।"

"তাড়া আছে, আমায় অনেকদূর যেতে হবে। কুড়ি বছর পর পুজোয় এসেছি, অঞ্জলি দিতে পারব না?"

উনি অবাক হয়ে তাকালেন। তারপর প্রিমোর হাতে ফুল দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কী নাম?"

"প্রিমো উওমো।"

"অ্যাঁ, বাঙালির এমন নাম হয় নাকি? মানে কী এর?"

প্রিমো বলল, "এটা ইতালিয়ান। মানে প্রথম মানব।"

"আরে বাবা, নামটা কী তোমার?" পুরুতমশাই অধৈর্য হলেন একটু।

প্রিমো হাসল। তারপর সহজ গলায় বলল, "প্রথম মানব কে জানেন না? সে অ্যাডাম। অবশ্য ওটা ডাকনাম। আসলে আমার নাম সেন, অদম্য সেন।"

(সমস্ত ঘটনাই কাল্পনিক ও গল্পের জন্য লেখা)

আমাদের প্রকাশিত
এই লেখকের অন্যান্য বই

আমাদের সেই শহরে
উনিশ কুড়ির প্রেম
এটুকু বৃষ্টি
ক্রিস-ক্রস
পাখিদের শহরে যেমন
পাতাঝরার মরশুমে
পালটা হাওয়া
ফিঙে
বুদ্বুদ
বৃত্ত


9 789350 402771